বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

মিশরের ইতিহাস

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ • দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিরামিড, মমি আর স্ফিংসের বাইরেও মিশর সভ্যতার একটা নিজস্ব গল্প আছে। সে গল্প রহস্যাবৃত। সেই গল্পটাই আসিমভ বলেছেন মিশরের ইতিহাস-এ। প্রাগৈতিহাসিক মিশর থেকে শুরু করে শেষ করেছেন মুসলিম শাসনের যুগে গিয়ে। যে মিশরে প্রাচীন আর মধ্যযুগে জন্ম নিয়েছিল গণিত, জ্যামিতি আর ভূবিদ্যা শাস্ত্র। প্রণয়ন হয়েছিল সন গণনার নতুন বর্ষপঞ্জি।

ISBN 978 984 8088 92 0
9 789848 088920

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে মিশর এক রহস্যমোড়া, কুয়াশাঢাকা অধ্যায়। ইতিহাসবিদরা যখন তাকান এই সভ্যতার দিকে, তাদের চোখে থাকে রোমাঞ্চ। কিন্তু পিরামিড, মমি আর স্ফিংসের বাইরেও মিশর সভ্যতার তো একটা নিজস্ব গল্প আছে। আর সেই গল্পটা আসিমভের চেয়ে ভালো করে কে আর বলতে পারবে!

সায়েন্স ফিকশন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্টোরিটেলার বসেছেন মিশরীয় সভ্যতার কাহিনী শোনাতে। প্রাগৈতিহাসিক মিশর থেকে শুরু; শেষ করেছেন মুসলিমদের যুগে গিয়ে। এখানেই প্রাচীন আর মধ্যযুগে জন্ম নিয়েছিল গণিত, জ্যামিতি আর ভূবিদ্যা শাস্ত্র। প্রণয়ন হয়েছিল সন গণনার নতুন বর্ষপঞ্জি।

বইটির পাতায় পাতায় আসিমভের গল্প বলার সহজাত প্রতিভার ছাপ ছড়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

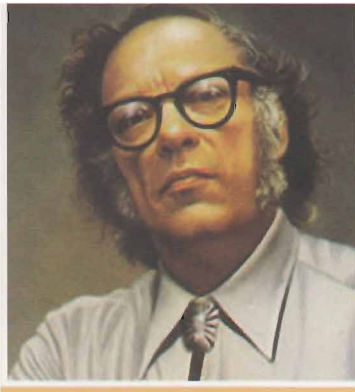

আইজাক আসিমভের জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯২০ সালে রাশিয়ায়। তিন বছর বয়সে তিনি পিতামাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানেই পড়ালেখা করেন। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির গুণে বয়স ষোল পেরোবার আগেই হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করেন। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

আসিমভ তার **ফাউণ্ডেশন সিরিজ** লেখা শুরু করেন একুশ বছর বয়সে, ধারণা করেননি যে তার এই সৃষ্টি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তিনি পাঁচশতাধিক বই লিখেছেন– বিজ্ঞান, শেক্সপিয়ার, ইতিহাস, কোনোটাই বাদ দেননি। যদিও তিনি তার বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জন্যই বেশি জনপ্রিয়– যার মধ্যে রয়েছে **রোবট সিরিজ**, **এম্পায়ার সিরিজ** এবং **ফাউণ্ডেশন সিরিজ**। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে সব বয়সের পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কল্পকাহিনী লেখক তাকে আখ্যা দিয়েছেন **গ্রাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন**। ৬ এপ্রিল ১৯৯২ সালে এই অসামান্য লেখক বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

অনুবাদক **দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন** : জন্ম ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার শিমুলতলীতে। পিতা বিশ্বনাথ বর্মন। ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাস করার পর ডোমার ও সৈয়দপুর কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে অবসর নিয়ে নীলফামারী জেলার ডোমারে বাস করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Egyptians

Isaac Asimov

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

মিশরের ইতিহাস

মূল : আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ISBN-978-984-8088-92-0

মিশরের ইতিহাস

মূল : আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

The Egyptians by Isaac Asimov
First published : 1967
Copyright © 1967 by the estate of Isaac Asimov
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৬

প্রথম প্রকাশ : ২০১৬

কোড : ১২২৭

প্রচ্ছদ : শারমিন নওরিন

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩০০.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পরলোকগত পিতা
বিশ্বনাথ বর্মন-এর
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন অনূদিত অন্যান্য বই:

মহারথীদের দুঃস্বপ্ন / বার্ট্রাণ্ড রাসেল
অনাগত শিশুর জন্য শোকগাথা / ইমরে কারতেশ্জ
তাস রহস্য / ইয়স্তেন গার্ডার
থ্রু আ গ্লাস ডার্কলী / ইয়স্তেন গার্ডার
কমলা সুন্দরী / ইয়স্তেন গার্ডার
ব্যাঙ বাহাদুরের দুর্গে / ইয়স্তেন গার্ডার
শুনছ, কোথাও আছো কি কেউ? / ইয়স্তেন গার্ডার
ক্রিসমাস মিস্ট্রি / ইয়স্তেন গার্ডার
গ্রহযুদ্ধ / এইচ. জি. ওয়েলস্
বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / এইচ. জি. ওয়েলস্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

১. প্রাগৈতিহাসিক মিশর ◆ ১১-২২

নীল নদ ◆ ১১

নব্য প্রস্তর যুগ ◆ ১৩

সেচ ◆ ১৬

নিরাপত্তা ◆ ১৯

দুই মিশর ◆ ২১

২. প্রাচীন মিশর ◆ ২৩-৩৪

ইতিহাস ◆ ২৩

একত্রিকরণ ◆ ২৬

পারলৌকিক জীবন ◆ ২৯

৩. প্রাচীন রাজ্য ◆ ৩৫-৪৭

ইমহোটেপ ◆ ৩৫

পিরামিড ◆ ৩৮

বিশাল পিরামিড ◆ ৪১

অবক্ষয় ◆ ৪৪

৪. মধ্যকালীন রাজ্য ◆ ৪৮-৬০

থিবিস ◆ ৪৮

নুবিয়া ◆ ৫০

গোলকধাঁধা ◆ ৫৩

হিক্সস ◆ ৫৬

৫. সাম্রাজ্যের উত্থান ◆ ৬১-৭৩

পুনরায় থিবিস ◆ ৬১

সম্প্রসারণ ◆ ৬৪

মহান রানি ◆ ৬৮

শীর্ষদেশ ◆ ৭০

৬. সাম্রাজ্যের পতন ◆ ৭৪-৮৮

ধর্ম সংস্কারক ◆ ৭৪

সংস্কার বিফল ◆ ৭৮

মহান আত্মম্ভর ◆ ৮১

গৌরবের সমাপ্তি ◆ ৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. বৈদেশিক আধিপত্য ◆ ৮৯-৯৫
লিবীয়গণ ◆ ৮৯
নুবীয়গণ ◆ ৯২
এসিরীয়গণ ◆ ৯৩
৮. সাইটিয় মিশর ◆ ৯৬-১০৬
গ্রিকগণ ◆ ৯৬
ক্যালদীয়গণ ◆ ৯৮
ইহুদিগণ ◆ ১০২
৯. পারসিক মিশর ◆ ১০৭-১১৯
পারসিকগণ ◆ ১০৭
এথেনীয়গণ ◆ ১১০
সর্বশেষ স্বদেশীয়গণ ◆ ১১৩
মেসিডোনীয়গণ ◆ ১১৫
১০. টলেমীয় মিশর ◆ ১২০-১৩৮
প্রথম টলেমী ◆ ১২০
আলেক্সান্দ্রিয়া ◆ ১২৪
ক্ষমতার শীর্ষে টলেমীয়গণ ◆ ১২৭
অবক্ষয়ে টলেমীয়গণ ◆ ১৩০
১১. ক্লিওপেট্রা ◆ ১৩৯-১৫০
জুলিয়াস সিজার ◆ ১৩৯
মার্ক এন্টনি ◆ ১৪৪
সর্বশেষ টলেমীয় ◆ ১৪৮
১২. রোমান মিশর ◆ ১৫১-১৬৪
রোমানগণ ◆ ১৫১
ইহুদিগণ ◆ ১৫৩
খ্রিস্টানগণ ◆ ১৫৬
রোমের অধোগতি ◆ ১৬০
১৩. খ্রিস্টীয় মিশর ◆ ১৬৫-১৭৭
উৎপীড়ন ◆ ১৬৫
এরিয়ানগণ ◆ ১৬৭
কনস্টান্টিনোপল ◆ ১৭০
মনোফাইসাইটগণ ◆ ১৭৪
১৪. অন্তিম দৃশ্য ◆ ১৭৮-১৯০
পারসিকগণ ◆ ১৭৮
আরবীয়গণ ◆ ১৮০
মুসলিম মিশর ◆ ১৮৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ প্রকাশিত **আইজাক আসিমভ**-এর বই:

সায়েন্স ফিকশন ফাউণ্ডেশন সিরিজ:

ফাউণ্ডেশন
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার
সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন
ফাউণ্ডেশন্স এজ
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ
প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন
ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন

সায়েন্স ফিকশন রোবট সিরিজ:

I, রোবট
দ্য কেভ্‌স অব স্টিল
দ্য নেকেড সান
রোবট সাম্রাজ্য

সায়েন্স ফিকশন:

পৃথিবীটা অনেক বড়
চিরন্তনের অন্ত
নাইটফল
নক্ষত্রের ধূলিকণা
নেমেসিস

ফেন্টাসি কাহিনী:

আজাজেল্

আত্মজীবনী:

আমি আসিমভ

ইতিহাস:

অন্ধকার যুগ
রোমান সাম্রাজ্য
মিশরের ইতিহাস
পুরাণের কথা
সূচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

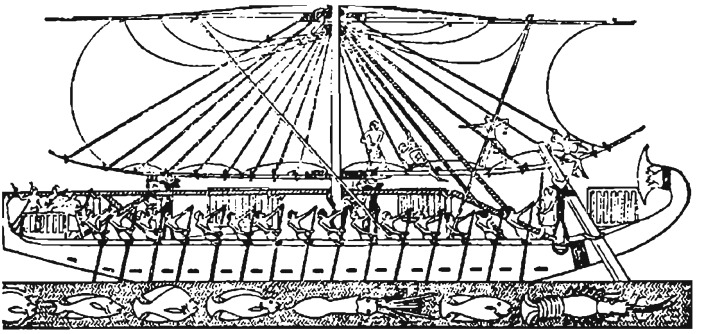

১. প্রাগৈতিহাসিক মিশর

নীল নদ

উত্তর আফ্রিকায় প্রবাহিত এক অস্বাভাবিক নদ। ৪১৫৭ মাইল দীর্ঘ– পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী– যার নাম নীল নদ। নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ নীলোস থেকে। গ্রিকরা কোথা থেকে পেল শব্দটা তা অজানা, কারণ এর তীরে যারা বাস করত তারা এটাকে শুধু "নদী" বলেই জানত।

নীল নদের সবচেয়ে উত্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন দুটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, আর প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে এর উভয় কূল বরাবর গ্রামগুলিতে জটিল সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

এ সময়টাতে কেউই জানত না এই নদের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে। এর জলধারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত। তবে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোনো মানুষই সর্ব দক্ষিণে এর উৎসস্থল আবিষ্কার করতে পারেনি। প্রাচীন জাতিসমূহের কাছে নীলের উৎস সন্ধান ছিল চাঁদের অপরপৃষ্ঠ আবিষ্কারের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক আর দুঃসাধ্য– যতদিন না উপগ্রহের মাধ্যমে চাঁদের উল্টোপিঠের ছবি আমাদের দৃষ্টিসীমায় আসে, ততদিন চাঁদের উল্টোপিঠের চেহারা ছিল সবার অজানা।

শুধু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ইউরোপীয় আর আমেরিকান অভিযাত্রীরা নীল নদের গতিপথ অনুসরণ করে তার উৎসমূলে পৌঁছতে সমর্থ হয়। ১৮৫৭ সালে জন হেনিং নামে এক ইংরেজ এক বিশাল হ্রদ ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছে ব্রিটেনের তৎকালীন রানির নামানুসারে তার নাম রাখে ভিক্টোরিয়া। এটা ঠিক নিরক্ষরেখার উপর আর এখান থেকেই নীল নদের উৎপত্তি। মধ্য-পূর্ব আফ্রিকার ছোট বড় অনেক নদীই এসে মিশেছে নীল নদের সাথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরমুখী গতিপথে একে অনেক সংকীর্ণ আর খাড়া উপত্যকা পেরিয়ে যেতে হয়েছে। উন্মত্ত জলধারা প্রস্তরখণ্ডের উপর ছিটকে পড়ছে আর নিম্নমুখী গতিপথে সৃষ্টি করেছে অনেক জলপ্রপাত। উত্তাল জলধারা আর জলপ্রপাত পার হয়ে জাহাজ চলাচল সম্ভব নয়, আর তাই নদীটা বিভক্ত রয়েছে কয়েক খণ্ডে।

প্রপাতগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রথম প্রপাতটা অবস্থিত মোহনা থেকে প্রায় ছয়'শ মাইল দক্ষিণে। বর্তমানে প্রপাতটা আসোয়ান শহরের সামান্য দক্ষিণে, তবে প্রাচীনকালে গ্রিকদের কাছে শহরটা পরিচিত ছিল "সাইয়িনি" নামে।

মোহনা থেকে প্রথম প্রপাত পর্যন্ত নীল নদের প্রথমাংশ এই গ্রন্থের মূল দৃশ্যপট। নদীর এই অংশ অতি সাধারণ নৌযানের জন্যও সহজনাব্য, যার ফলে এখানেই গড়ে উঠেছে এক লক্ষণীয় সভ্যতা।

সাহারা মরুভূমির পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে নীল নদ প্রবাহিত। সাহারা (আরবী ভাষায় যার অর্থ মরুভূমি) উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা জুড়েই অবস্থিত আর এর আয়তন প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমান। প্রকৃতপক্ষে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। এই গোটা এলাকাতেই কোনো বৃষ্টিপাত নাই। যেটুকু পানি আছে তা মাটির অত্যন্ত গভীরে, শুধু মাঝে মাঝে মরুদ্যানে তা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি উঠে এসেছে।

তবে সাহারা চিরকাল মরু অঞ্চল ছিল না। বিশ হাজার বৎসর পূর্বে ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা হিমবাহে আবৃত ছিল, আর শীতল বায়ুপ্রবাহ সেখান থেকে আর্দ্রতা বয়ে নিয়ে আসত উত্তর আফ্রিকায়। আজ যেখানে মরুভূমি সেকালে সেখানে ছিল নদী, হ্রদ, অরণ্য আর তৃণভূমিশোভিত মনোরম এক ভূখণ্ড। প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা সেখানে ঘুরে বেড়াত আর তারাই রেখে গেছে পাথরের অমসৃণ অস্ত্রশস্ত্র।

ধীরে ধীরে অপসৃত হলো হিমবাহ আর জলবায়ু হতে থাকে উষ্ণতর আর শুষ্কতর। অধিক সংখ্যায় মানুষ নীল নদের আশেপাশে ভিড় জমাতে থাকে। শুরু হলো অনাবৃষ্টি আর ধীরে ধীরে তা তীব্রতর হয়ে উঠল। গাছপালা মরে গেল আর জীবজন্তু আর্দ্রতর অঞ্চলের দিকে সরে যেতে থাকে যেখানে তারা পর্যাপ্ত খাদ্য আর উপযুক্ত আবাসস্থল পাবে। মানুষও সরে যেতে থাকে কিছু দক্ষিণে বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে আর কিছু উত্তরে সমুদ্র উপকূলের দিকে। সবচেয়ে বেশি জড়ো হতে থাকে নীল নদের উপত্যকায়, সেই সুদূর অতীতে যা ছিল আরও প্রশস্ততর আর ধীরগতিতে প্রবহমান ছিল বৃহৎ জলাভূমির মধ্য দিয়ে। বাস্তবিকপক্ষে নীল নদের উপত্যকা মানববসতির জন্য মোটেই সুখকর ছিল না যতদিন না এর জলধারা কিছুটা হ্রাস পায়।

এমনটা ঘটার পরে নীলের উপত্যকা হয়ে উঠল ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে। আবহাওয়া যতই শুষ্ক হোক না কেন নীল নদ হয়ে রইল মাটি ও মানুষের জন্য নিরন্তর পানির উৎস, যাতে করে জীবন যে শুধু সম্ভব তাই নয় আরামদায়কও হয়ে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমগ্র শীতকালব্যাপী মধ্য-পূর্ব আফ্রিকার পর্বত শীর্ষে স্তূপীকৃত হতে থাকে বরফ। বসন্তের আগমনে বৃষ্টি নামে আর জমাট বরফ গলতে শুরু করে। বিপুল জলধারা পর্বতের গা বেয়ে প্রবল বেগে নেমে আসে আর তা নদীর স্রোতে আর বড় বড় হ্রদের জলে মিশে যায়। অবশেষে এই জলধারা এসে পড়ে নীল নদে আর তা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

নীল নদে প্রবাহিত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে জুলাই মাস থেকে আর তা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে সেপ্টেম্বরে। পানির উচ্চতা স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসে অক্টোবরে। ক্ষিতকায় পানির প্রবাহ কূল ছাপিয়ে দু পাশের তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করে আর উত্তরের পাহাড় থেকে বয়ে নিয়ে আসে উর্বর পলিমাটি। কাজেই নদী উপত্যকার মাটির অবিরাম রূপান্তর ঘটছে আর উর্বরতা বজায় রাখছে।

মানুষ যখন প্রথম নীল উপত্যকায় প্রবেশ করে, তখন বন্যা ছিল প্রবল আর বিস্তৃত ছিল জলাভূমি আর নদীর উভয় তীরে ছিল অসংখ্য জলহস্তি, বল্গাহরিণ, সারস, আরও নানা রকমের শিকার্য পশু। ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা বন্যা কমিয়ে আনল আর শেষ পর্যন্ত শুধু নদীর দুই তীরেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, আর বহু সহস্র বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বহমান নদীর দুই ধারে শুধু বার মাইল পর্যন্তই নীল নদের সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকারূপে টিকে রইল।

তারচেয়েও বড় কথা উর্বর চাষযোগ্য ভূমির সীমানা এমন স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে কোনো ব্যক্তি এক পা উর্বর ভূমিতে আর অন্য পা মরুভূমিতে রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

AMARBOI.COM

নব্যপ্রস্তরযুগ

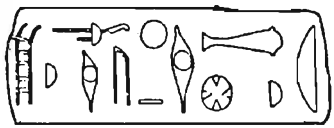

সময়ের সাথে সাথে যেহেতু নীল উপত্যকায় জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে আর সেই সাথে শিকার্য পশু কমতে থাকে, তাই কিছু একটা উপায় বের করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। যে কোনো ভাবেই হোক খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে হবে। সৌভাগ্যবশত ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে– যখন উত্তরের হিমবাহ তার শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছেছিল– তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। নীল নদের হাজার মাইল পূর্বে ইরান ও ইরাকে– যেখানকার উঁচু ভূমিতে পানির প্রাচুর্য– সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ বীজ থেকে ফসল উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছিল।

এটাকেই বলা যায় *নিওলিথিক এজ* বা নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষরা তখন পর্যন্ত ধাতুর ব্যবহার শেখেনি আর তাই পাথরের উপচারের উপরই নির্ভর করতে হতো। এসব পাথরের যন্ত্রপাতি আদি ও মধ্য প্রস্তর যুগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোতা অমসৃণ যন্ত্রপাতির চাইতে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও কার্যকর ছিল। নব্য প্রস্তর যুগের আর সব অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাটির পাত্র তৈরি, পশুপালন ও পশুচারণ, আর বলা উচিত, বীজ বপন ও ফসল কর্তন। আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব না কীভাবে এই কৃষি যুগের উত্থান ঘটে, তবে এর ফল সহজবোধ্য, কারণ এর ফলে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছিল।

নব্য প্রস্তরযুগীয় জীবনধারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় পৌছানোর আগে সেখানকার মানুষের জীবিকা নির্ভর করত পশু শিকার, ও ফলমূল সংগ্রহের উপর। তবে শিকার ও ফলমূলের সরবরাহ অঢেল ছিল না, আর কোনো কোনো দুর্বৎসরে খাদ্য সরবরাহের জন্য মানুষকে দূর দূরান্তে ভ্রমণ করতে হতো। কোনো সীমাবদ্ধ এলাকায় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না।

পশুপালন ও ফসল ফলানো আয়ত্ত করার পর প্রাকৃতিকভাবে আহরণের চাইতে খাদ্য সরবরাহ মানুষের জন্য অনেক বেশি নিশ্চিত করা সম্ভব হলো। কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় পশুপালন ও ফসল ফলানো নিশ্চিত করার পর পশুপালক ও কৃষকদের ব্যবস্থা নিতে হলো যাতে বন্য পশু বা অন্য গোত্রের লোকজন সেগুলি নষ্ট না করে বা দখল করে না নেয়। খাদ্য সরবরাহ যেমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেল তেমনি সুরক্ষিতও রইল, আর এটা কৃষির জন্য অধিকতর প্রযোজ্য হলো, কারণ পশুপালনের চাইতে ফসল ফলানো অধিকতর সহজ এবং নিরাপদ। এক একর কৃষি জমি এক একর বনভূমির চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের খাদ্য নিশ্চয়তা দিতে পারে। আর এ কারণেই যেখানেই নব্য প্রস্তর যুগের অনুপ্রবেশ সেখানেই এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও কারণ হয়ে দাঁড়াল।

অধিকন্তু, যেখানেই মানুষ শিকারের উপর নির্ভরশীল (অথবা কিয়ৎ পরিমাণে পশুপালন বা পশুচারণ) তারা কখনোই এক জায়গায় স্থিতিশীল ছিল না। অপরপক্ষে যারা যেখানে ফসল ফলাত, সেখানেই তাদের বসবাস করতে হতো। তাদের বাস করতে হতো একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে, কারণ শিকারি বা পশুপালক গোষ্ঠীর হাত থেকে নিজেদের সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল (এসব উটকো লোক নিজেরা ফসল না ফলালেও অন্যের ফসল ছিনিয়ে নিতে আপত্তি ছিল না)। আর এভাবেই গড়ে ওঠে আদিম বসতি– গ্রাম ও নগর।

যেহেতু গ্রামের বাসিন্দাদের একে অন্যের সাথে বাধ্য হয়ে মানিয়ে চলতে হতো, তাই শিকারি যুগের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটল। আর তাই ঘরবাড়ি নির্মাণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য গ্রামবাসীদের ঐক্য গড়ে উঠল। আর এভাবেই ঘটল সভ্যতার গোড়া পত্তন।

ইরানের উচ্চভূমিতে গোড়াপত্তনের পরবর্তী সহস্রাব্দে কৃষিকাজ চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হতে থাকে। অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরাও কৃষিকে আপন করে নেয় আর বিশেষ করে দুটি এলাকায় এর ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এর মধ্যে একটা দুই নদী– ইউফ্রেতিস ও টাইগ্রিসের মধ্যভাগের উপত্যকায়, আর অন্যটি এর হাজার মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমে নীল নদের উপত্যকায়। ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকা নিকটবর্তী হওয়ায় ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল বেশ আগেই, আর সভ্যতার উন্নয়নও ঘটেছিল আগেভাগেই– তবে নীল উপত্যকাও তেমন পিছিয়ে ছিল না।

মিশরে নব্য প্রস্তরযুগীয় জীবনধারার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। এ সময় নীল উপত্যকা ছিল সুস্থির, তবে কর্দমাক্ত আর অরণ্যসংকুল থাকায় কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযুক্ত ছিল না, কিন্তু নীলের পশ্চিম তীরে আর ভূমধ্যসাগরের প্রায় ৪৫০ মাইল দক্ষিণে ছিল একটা হ্রদ, যার আশেপাশের এলাকা ছিল কৃষিকাজের জন্য আদর্শ।

পরবর্তীকালে এই জলাধারটির পরিচিতি হয়েছিল *মিয়েরিস হ্রদ* নামে, কারণ প্রায় ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক পর্যটক হেরোডোটাস এখানে বেড়াতে এসে হ্রদটা দেখে ভেবেছিলেন এক পৌরাণিক রাজা *মিয়েরিস* কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বানানো হয়েছিল এটি।

তবে এটা মোটেই কৃত্রিম কোনো জলাশয় নয়, আর *মিয়েরিস* একটি মিশরীয় শব্দ, যার অর্থ হ্রদ। হেরোডোটাসের অনেক আগেই উত্তর আফ্রিকার এই অঞ্চল অনেক বেশি জলাভূমিতে আকীর্ণ ছিল আর এটা তারই অবশেষ। এই হ্রদের পানিতে জলহস্তিসহ আরও অনেক শিকার্য জলজন্তু ছিল যার কারণে ৪৫০০ থেকে ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এর তীর ঘেঁষে অনেক নব্য প্রস্তরযুগীয় বসতি গড়ে ওঠে।

তবে এই ভূভাগের অবিরাম শুষ্কভবনের কারণে এর জলাধারও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। পানির উচ্চতা কমার সাথে সাথে জলজ প্রাণীর সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। যার ফলে উপকূলবর্তী গ্রামগুলিও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় চলে যায়, আর অন্যদিকে নীল উপত্যকায় সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে, যেখানে জীবনযাপন সহজলভ্য, কারণ এখানকার পানির প্রবাহ সুদূর দক্ষিণের পর্বতমালা থেকে উৎসারিত।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ নাগাদ *মিয়েরিস হ্রদকে* একটা শোভনীয় আকারে রাখা সম্ভব হয়েছিল। একে নীল নদের সাথে সংযুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল আর নদী উপকূলবর্তী জনগণকে এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হতো। এটা করার সংগ্রাম এখন থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর এখন হ্রদটা প্রায় নিঃশেষিত। এর জায়গায় এখন যা রয়েছে তা হলো একটা শুকনো নিচু ভূখণ্ড যার মাঝ বরাবর রয়েছে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ আর পাঁচ মাইল চওড়া ছোট একটা হ্রদ। এই জলাধারটি এখানকার আরবী ভাষাভাষী লোকের কাছে পরিচিত *বিরকেত কারুন* নামে। এটাই সেই প্রাচীন *মিয়েরিস হ্রদের* অবশেষ। এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের তীরেই রয়েছে আধুনিক শহর এল ফাইয়ুম।

নীল নদের তীরে যে নিওলিথিক বসতি গড়ে উঠেছিল (যা ঘটেছিল মিয়েরিস তীরের বসতির পরবর্তী ঘটনা) পরবর্তীকালে তা-ও উৎখাত হয়ে যায়। পরবর্তী গ্রামগুলির অবশেষ দেখা যায় পূর্ববর্তী গ্রামের উপরিভাগে। পুরাতত্ত্ববিদরা প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন গ্রামের নাম দিয়েছেন সেখানকার আধুনিক গ্রামের নামানুসারে যেখানে খনন করে উল্লেখযোগ্য অবশেষ পাওয়া গেছে।

তাই বলা হয়ে থাকে *তাসিয়ান, বাদারিয়ান, অম্রাশিয়ান* ইত্যাদি কালচার। তাসিয়ান জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই কৃষিকাজ শুরু করে দিয়েছিল। বাদারিয়ানরা উন্নত মানের মাটির পাত্র তৈরি করতে পারত। আম্রাশিয়ানরা গরু, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি পশুপালন করত আর নলখাগড়া দিয়ে নৌকা বানিয়ে নীল নদে পাড়ি জমাত।

সেচ

পশ্চিম এশিয়ার আদি কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠী কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল শুধু সেসব এলাকায় যেখানে প্রয়োজনীয় বৃষ্টির পানি সহজলভ্য ছিল। ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলকায়, বিশেষ করে নীল উপত্যকায়, কৃষিকাজে পানি সরবরাহের জন্য বৃষ্টির উপর একান্ত নির্ভরতা সম্ভব ছিল না। তার পরিবর্তে নদীর পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

প্রথম দিকে নীল অববাহিকার অধিবাসীদের বন্যার পানি অপসৃত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই যথেষ্ট ছিল, তারপর কর্দমাক্ত মাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেওয়া। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পদ্ধতিতে ফসল ফলানো যথেষ্ট ছিল না। তার পরিবর্তে নদীর উভয় পার্শ্বে খাল কেটে দূরবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ জরুরি হয়ে পড়েছিল। একটি ক্যানাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নীল এবং ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকায় সেচ দিয়ে শুষ্ক মওসুমে যখন বন্যার পানি সহজলভ্য ছিল না তখনও ভূমিতে আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হতো।

এটা একদিক দিয়ে অবস্থা আরও কঠিন করে তুলেছিল। প্রথমত খাল কাটা কাজটা তেমন সহজ ছিল না আর সেটা ব্যবহার উপযোগী রাখাও ছিল তেমনি কঠিন। কঠোর পরিশ্রম করতে হতো, বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করার চাইতে অনেক বেশি কঠিন। কাজটা করতে হতো অনেকে একসাথে মিলেজুলে– সাধারণ কৃষিকাজের চাইতে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধভাবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই অতিরিক্ত ঐক্যের প্রয়োজনে, এবং সেচ ব্যবস্থায় উন্নত কৌশল উদ্ভাবন উচ্চভূমিতে সাধারণ কৃষির চাইতে সেচ এলাকায় সমৃদ্ধ কৃষি, সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশেষ উদ্দীপনা প্রদান করে।

নদী তীরবর্তী শহরগুলিকে সুসংগঠিত করতে হয়েছিল। যেসব কুশলী জনগণ ক্যানেল তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ পারদর্শী ছিল তারাই শহরগুলিতে প্রাধান্য লাভ করত। কোনো স্থানীয় দেবতার নামে তারা নিজেদের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

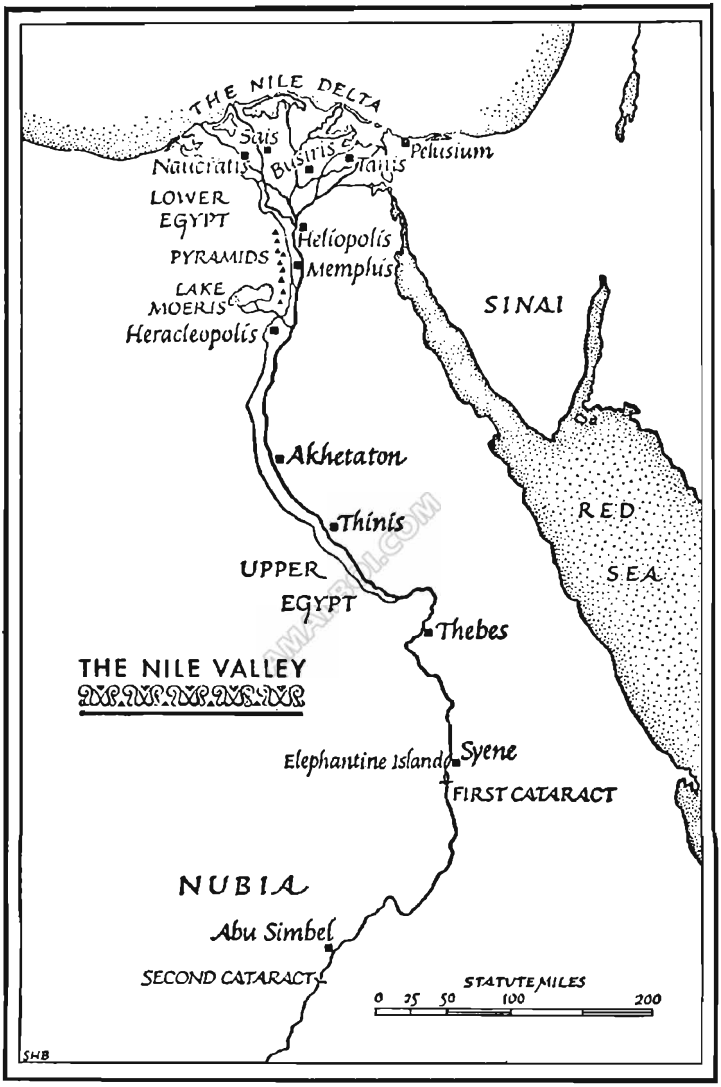

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি যুগের মানুষেরা সব সময় বিশ্বাস করে এসেছে যে কোনো না কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বীজ থেকে চারা উৎপাদন এবং বৃক্ষ ফলবান করা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আর শহরের নিয়ন্ত্রককেই নির্দিষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য উপযুক্ত যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণ জনগণের দায়িত্ব পুরোহিতরা যেন সঠিকভাবে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করত যাদের উপর এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের দায়িত্ব, তাদের জ্ঞান ও সচেতনতার উপরই শহরের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এভাবেই নীল উপত্যকায় একটি পুরোহিত-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যা হাজার হাজার বছর ধরে টিকেছিল।

সেচ কাজে যেটুকু কষ্টভোগ করতে হয়েছিল এর সুফলের তুলনায় সেটা অতি তুচ্ছ। মানুষ যত বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখেছিল তত বেশি সুবিধা ভোগ করতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ মানুষকে জানতে হয়েছিল ঠিক কখন নীল নদে বন্যা আসবে, যদি এর থেকে সর্বাধিক ফল লাভ করতে হয়। যেসব পুরোহিতের ওপর বন্যা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তারা দিনের পর দিন নদীর পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করত, আর তাতে করে তারা নির্ণয় করতে পেরেছিল গড়ে প্রায় ৩৬৫ দিন পর পর বন্যা আসে।

কাজেই নীল উপত্যকার মানুষরাই সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন ভিত্তিক একটা পঞ্জিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিটি বছরের মধ্যে ছিল বারোটি মাস, কারণ প্রতিটি বছরের সামান্য কম সময়ের মধ্যে চন্দ্রের বারোটি সুস্পষ্ট আবর্ত লক্ষ করা যেত। আর নীল নদের বাসিন্দারা (অন্য অনেকের মতো) চন্দ্রভিত্তিক একটা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে শিখেছিল। প্রতিটি মাসের দৈর্ঘ্য ৩০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল, আর বছরের শেষ প্রান্তে অতিরিক্ত পাঁচ দিন যোগ করা হতো।

প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত সকল ক্যালেন্ডারের মধ্যে এটাই সবচাইতে সরল ও ব্যবহার উপযোগী ছিল। ঐতিহাসিকরা এর আরম্ভকাল নির্ণয় করতে পারেননি, তবে ২৮০০ খ্রিস্টপূর্ব গ্রহণযোগ্য অনুমান মনে হয়। পরবর্তী তিন হাজার বছর ধরে এর চাইতে ভালো কোনো উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। আর পরবর্তিকালে যে ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করা হয়েছিল সেটার ভিত্তিও ছিল সামান্য সংশোধনসাপেক্ষে মিশরীয় ক্যালেন্ডার। সত্যি বলতে কি আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডার মিশরীয় ক্যালেন্ডারেরই অনুসারী।

তারপরেও নীলের বন্যা, মানুষের অধিকৃতি মুছে ফেলত। সেই সীমানা পুনর্নির্ধারণের একটা উপায় বের করা আবশ্যক ছিল। হিসাবনিকাশের একটা পদ্ধতি ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত হয়েছিল যাকে বলা হয় *জিওমেট্রি* (ভূ মাপন)। গণিতের অন্যান্য শাখারও উন্নতি হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমির সীমানা ও উৎপাদিত ফসলের রেকর্ড সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীক উদ্ভাবন আবশ্যক ছিল যা বিভিন্ন জাতি, আলাদা ফসল ও ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও বিবরণ নির্ণয় করারও সহায়ক ছিল।

তাইগ্রিস ইউফ্রেতিস এলাকার লোকজন ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই এক ধরনের চিত্রলিপি আবিষ্কার করতে পেরেছিল যা বস্তুর প্রতিবিম্বরূপে চিত্রিত হতো। প্রথম দিকে এসব প্রতীকী চিহ্ন ছিল বেশ সরল, তবে ধীরে ধীরে তা জটিল রূপ ধারণ করে আর শেষ পর্যন্ত মানুষের যে কোনো ভাবনাকে রূপ দিতে সক্ষম হয়।

নীল উপত্যকার মানুষেরা লিখনশৈলীর ধারণা লাভ করেছিল সম্ভবত ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকা থেকে, উভয় অঞ্চলে যাতায়াতকারী বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। নীল উপত্যকার অধিবাসীরা শীঘ্রই প্রাপ্ত লিখনশৈলীকে তাদের ব্যবহার উপযোগী পরিবর্তন করে নেয়। তারা নিজেদের মতো করে প্রতীক চিহ্ন আবিষ্কার করে যা ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অল্প পরেই নীল উপত্যকার লিখন পদ্ধতি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

এই লিখনপদ্ধতি মূলত পুরোহিতদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ জনগণ এসব জটিল প্রতীক চিহ্ন রপ্ত করতে পারেনি যেমনটা এযুগের সাধারণ মানুষ উচ্চতর গণিত আয়ত্ত করতে পারেনা। আরও কয়েক শতাব্দী পরে যখন এখানে গ্রিক পর্যটক ও সৈন্যদের ঢল নেমেছিল, তারা এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি, তবে যেহেতু তারা এগুলি উৎকীর্ণ দেখেছিল শুধু মন্দিরের গায়ে, তাই তারা ধরে নিয়েছিল এগুলির নিশ্চয়ই ধর্মীয় তাৎপর্য আছে, আর তাই এর নাম দিয়েছিল *হিয়ারোগ্লিফিক্স* (পবিত্র খোদাই)।

নি রা প ত্তা

সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে নীল উপত্যকায় উচ্চতর সভ্যতা গড়ে ওঠে আর দুটি ক্ষেত্রে ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার সাথে তার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাইগ্রিস ইউফ্রেতিস এলাকার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত ছিল অরণ্যবেষ্টিত বর্বর জাতি অধ্যুষিত। অবিরাম আক্রমণ ও লুটপাটের ভয়ে নদীতীরবর্তী এলাকার গ্রামবাসীরা নিজেদেরকে প্রাচীরবেষ্টিত করে রেখেছিল। তাদের যেমন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলেরও উন্নতি ঘটাচ্ছিল।

এই উপায়ে ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার জনগণ অধিকাংশ সময়েই বর্বরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। উপজাতীয় প্রশান্তির সময়ে সশস্ত্র গ্রামবাসীরা তাদের অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে কী করেছিল? অলস হয়ে বসে থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে যে শহর তাদের নিয়োগ দিয়েছে, সেখানেই অশান্তি সৃষ্টি করতে পারত। সেক্ষেত্রে শহরগুলি স্বভাবতই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারত।

এ ধরনের লড়াই একক শাসনাধীন (সাম্রাজ্য) এলাকার বিরাট অংশে হরহামেশাই ঘটেছে। অপরপক্ষে, এসব লড়াই কৃষি ও কৃষিকাজে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি যেমন নষ্ট করত, তেমনি ঐক্যও ক্ষতিগ্রস্ত করত, যে ঐক্যের উপর কৃষির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল, যার কারণে সূচনা হয়েছিল এক অন্ধকার যুগের যেখানে লক্ষণীয় সভ্যতার অধোগতি আর সমৃদ্ধির অবক্ষয়। ফলে পার্শ্ববর্তী বর্বরদের পক্ষে সাময়িক দখলদারির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

নীল এলাকার অধিবাসীরা এসবের হাত থেকে বহু শতাব্দীব্যাপী মুক্ত থাকতে পেরেছিল। তাদের শান্তিময় এলাকার পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল মরুভূমি, শত্রুবাহিনী যা সহজে অতিক্রম করতে পারত না। উত্তরে ছিল ভূমধ্যসাগর, আর প্রথম দিকে সৈন্য ও রসদ পরিবহণের মতো যথেষ্ট বড় জাহাজ ছিলনা, যাতে করে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসতে পারে। দক্ষিণে ছিল প্রথম জলপ্রপাত, যা নীলের পথে পাড়ি দিয়ে নেমে আসা সম্ভব ছিল না।

তাই দীর্ঘদিন যাবৎ নীলের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার মধ্যে বাস করেছিল। তাদের গ্রামগুলি রয়ে গিয়েছিল নিরস্ত্র অনাক্রান্ত। কোনো কোনো গ্রাম ছিল বিশাল আয়তনের যাতে নীল উপত্যকাকে বর্ণনা করা যায় এক দীর্ঘ শহরতলীর শৃঙ্খলরূপে।

এর ফলে আরাম-আয়েস লাভ করা যায় ঠিকই তবে জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন আসে না। যেখানে অন্যান্য নদী অববাহিকার লোকেদের নিত্যই নূতন নূতন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হতো, যেখানে শত্রুরা নিত্যনূতন পদ্ধতি নিয়ে আসত, অথবা অধিবাসীদের নিজেকেও প্রতিরক্ষার নূতন কৌশল খুঁজে বের করতে হতো, সেখানে নীল অববাহিকার লোকদের এসব কিছুই করতে হতো না। পুরুষানুক্রমে পুরনো জীবনধারাই তারা যথেষ্ট মনে করত।

ইতিমধ্যে বহিরাগতরা নীল উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং জোর করে স্থানীয়দের উপর তাদের শাসন কয়েম করে। স্থানীয়রা তাদের পুরনো রীতিনীতিকে এমন কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে ইতিহাসে তারাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে রক্ষণশীল জাতি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল (চীনারা ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে)।

তাদের লিখনপদ্ধতি জটিলই রয়ে গিয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ, অসংখ্য প্রতীক, যার অনেকগুলিই নির্দিষ্ট শব্দ বোঝাত, আবার কতকগুলি শব্দাংশ। প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের কোনো এলাকায় প্রতীকগুলিকে মাত্র ডজনদুয়েকের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছিল, যার প্রত্যেকটি কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতীক ছিল। সেই কটি বর্ণের সাহায্যে হাজার হাজার শব্দ লেখা সম্ভব ছিল, যাতে করে পুরো লিখনপদ্ধতি সহজবোধ্য হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল অববাহিকার অধিবাসীরা যেহেতু তাদের সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে অহংকার করত, আর সেই প্রাচীন জীবনধারার মধ্যে নিজেদের শক্ত করে বেঁধে রাখার চেষ্টা করত, তাই পরবর্তী দুই সহস্রাব্দ পর্যন্ত তারা সেই বর্ণমালা গ্রহণ করেনি। একগুঁয়েমীভাবে তারা সেই দুর্বোধ্য কষ্টকর পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরেছিল। প্রথম দিকে অভিনব ও কার্যকর হলেও এটা পরবর্তীকালে দুর্বহ বোঝায় পরিগণিত হয়। এরূপ রক্ষণশীলতা শুধু অন্য প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীর কাজে লেগেছিল যারা এগুলি ব্যবহার করে নীল অধিবাসীদের পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল (বর্তমানে চীনারা তাদের প্রতীকী লিখনপদ্ধতি পরিত্যাগ করেনি, যা মিশরীয়দের মতোই জটিল)।

আর একটা রক্ষণশীলতা লক্ষ করা যায় ক্যালেন্ডার সংক্রান্ত ব্যাপারে। নীল অববাহিকার পুরোহিতরা ৩৬৫+ দিনের বৎসর উদ্ভাবন করেছিল। প্রতি চতুর্থ বৎসর হবে ৩৬৬ দিনের। এটা নির্ধারণ করা হয়েছিল নীলের বন্যার সাথে সম্পর্ক রেখে। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নীলের বন্যা একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করত। তবে ক্যালেন্ডারের এসব সংশোধনী সাধারণ লোকদের গ্রহণ করানো সম্ভব হয় নাই। লোকেরা অতীতের সব রীতি প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত, যদিও এতে করে আগামি বন্যার সময় নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিত।

AMARBOI.COM

দুইমিশর

নীল অববাহিকার অধিবাসীরা তাদের দেশের নাম দিয়েছিল *"খেম"*। তাদের স্থানীয় ভাষায় এর আপাত অর্থ *"কালো"*। সম্ভবত নীলের বন্যায় রেখে যাওয়া কালো মাটি বোঝাতেই এই নামটা দেওয়া হয়েছিল। নীলের উভয় পার্শ্বে মরুভূমির লালচে বেলে মাটির সাথে যার পার্থক্য ছিল বেশ স্পষ্ট।

পরবর্তীকালে গ্রিকরা দেশটির নাম দিয়েছিল *এইজিপ্টস*। হয়তো তারা এই নামটা বিকৃতভাবে আহরণ করেছিল পরবর্তী এক বিখ্যাত মিশরীয় শহরের নামানুসারে যার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা এই নামেই দেশটার সাথে পরিচিত।

সভ্যতার আদিপর্বে মিশর দেশটি ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট শহর বা *নোমস* (nomes) নিয়ে যার প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দেবতা, আলাদা মন্দির, পুরোহিত এবং প্রশাসক ছিল, যারা নদী এলাকার কৃষিভূমি নিয়ন্ত্রণ করত। এক শহর থেকে আর এক শহরের পরিবহণ বলতে ছিল একমাত্র জলপথ, আর তা ছিল বেশ সহজসাধ্য, কারণ জলপ্রবাহ ছিল এক দিকে আর বায়ুপ্রবাহ ছিল তার বিপরীত দিকে। পাল ছাড়া চলত একদিকে আর পাল তুলে তার বিপরীত দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি শহরের লোক একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করত, ব্যাপারটাকে আরও সহজ করে তুলেছিল, কারণ শহরগুলিও একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করত। তাদের মধ্যে মৈত্রী (League) স্থাপন করেছিল যার মাধ্যমে তারা প্রতিবেশী শহরগুলির মাধ্যমে সাধারণ সমস্যা দূর করার চেষ্টা করত। ঘটনাক্রমে কোনো কোনো শাসক নদীর বিশেষ এলাকায় দখল পোক্ত করার প্রয়াস পেত।

সাধারণভাবে অববাহিকাটি দুটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত ছিল একদিকে ছিল নদীর সরু উপত্যকা, যার বিস্তার ছিল প্রথম জলপ্রপাত থেকে *লেক মিয়েরিস* পর্যন্ত সমুদ্র থেকে মোটামুটি একশ মাইল। এটা ছিল এক সংকীর্ণ ভূভাগ যাকে বলা যায় *আপার ঈজিপ্ট। আপার ঈজিপ্টের* উত্তরে নীল নদ বেশ কয়েকটি জলধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে যা ১২৫ মাইল প্রশস্ত এক ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ড। অনেকগুলি ধারায় বিভক্ত হয়ে নীল নদ সাগরে প্রবেশ করেছে, আর এসব জলধারার মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি ভূখণ্ড উর্বর কৃষিভূমি। এই উর্বর কৃষিভূমি দীর্ঘদিনব্যাপী দক্ষিণের পাহাড় থেকে নীলের বয়ে আনা পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট।

আধুনিক ভূগোলবিদরা ম্যাপের মধ্যে লোয়ার ঈজিপ্টকে আপার ঈজিপ্ট দেখিয়ে মিশরের ম্যাপ এঁকেছেন তা সত্যিই কিম্ভূত। তবে নদীই ছিল এর প্রতিভূ। কেউ যদি নদীর স্রোতকে অবলম্বন করে মোহনার দিকে অগ্রসর হয়, আমরা বলি "ভাটির" দিকে যাওয়া হচ্ছে, আর তার উল্টো দিকে গেলে বলি "উজান" দিকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো।

গ্রিক বর্ণমালার একটি অক্ষর "ডেল্টা" এর অর্থ সমবাহু ত্রিভুজ। তাই গ্রিকরা নিম্ন মিশরকে এর ত্রিভুজাকৃতির কারণে বলত নীলের ডেল্টা। আজকাল যে কোনো নদীর মোহনাকে বলা হয় "ডেল্টা" তার আকৃতি যেমনটাই হোক না কেন। যেমন আমরা বলে থাকি মিসিসিপি ডেল্টা, যদিও তার গঠন অনিয়মিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. প্রাচীন মিশর

ইতিহাস

সাধারণভাবে, মানব ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তিনটি উৎস থেকে উৎসারিত। প্রথমত কিছু উপকরণ যেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসের উৎসরূপে পেছনে ফেলে রাখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আদি মানবের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মৃৎপাত্র, যে সবের অবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর অতীতের উপর অস্পষ্ট আলোকপাত করে।

অবশ্য এসব অবশেষ অখণ্ড কাহিনীর ধারক হয়ে ওঠেনা। বরং এগুলি হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের আলোয় বই পড়ার চেষ্টার মতো। অবশ্য সম্পূর্ণ নেতিবাচকতার চাইতে বরং এটাও অনেক ভালো।

দ্বিতীয়ত পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসা কাহিনী। তবে বার বার বলতে বলতে এর অধিকাংশই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে পুরাণ আর কল্পকথা যাকে কখনোই আক্ষরিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না, যদিও এর অনেকগুলির মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে আছে।

এভাবেই গ্রিক পুরাণে কথিত ট্রয়ের যুদ্ধ পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে এসেছে। গ্রিকরা এগুলিকে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছে। আসল সত্য লুকিয়ে আছে এদুয়ের মাঝখানে। গত শতাব্দীর পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে তথ্য মিলেছে যে হোমারে বর্ণিত অনেক কাহিনীই প্রকৃত ঘটনার কাছকাছি (হোমারে বর্ণিত দেবতাদের কাহিনী নিছক রূপকথা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবশেষে রয়েছে লিখিত রেকর্ড, পৌরাণিক কাহিনীও যার অন্তর্গত। যখন এসব লিখিত বিষয় লেখকের সমসাময়িক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেটা ঐতিহাসিক যে কোনো বিবরণের চাইতে অনেক বেশি সন্তোষজনক। এটাকে অবশ্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ লেখকেরা মিথ্যাও বলতে পারে বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে অথবা ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে। তাছাড়া তারা সঠিক লিখলেও পরবর্তিকালে কপি করার সময় অসাবধানতাবশত বিকৃত হয়ে থাকতে পারে। এক ঐতিহাসিকের সাথে আর এক ঐতিহাসিকের তুলনা করলে, বা সকল ঐতিহাসিক বিবরণের সাথে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের তুলনা করলেই ভুল বা বিকৃতিটা ধরা পড়বে।

তবু লিখিত বিবরণের চাইতে বিস্তারিত অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায় না। মোটের উপর আমরা যখন মানুষের ইতিহাসের কথা বলি, তখন মূলত কোনো না কোনো লিখিত বিবরণের কথাই বোঝাতে চাই। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে কোনো বিশেষ অঞ্চলে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা ইতিহাসপূর্ব হলেও সভ্যতাপূর্ব নয়।

এভাবেই ৫০০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব মিশরীয় সভ্যতার বিবরণ আমাদের জ্ঞানের সীমায় এসেছে, তবে সভ্যতার এই পর্বটাকে অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক বলা যায়, কারণ তখনও লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। একটি জাতির প্রাচীন ইতিহাস অবশ্যই অস্পষ্ট, ঝাপসা, আর ইতিহাসবিদরা দুঃখের সাথে এটা মেনে নিয়েছে। লিখন আবিষ্কারের পরও যখন সেটার পাঠোদ্ধার করা যায় না, তখন ঐতিহাসিকদের কাছে এটা কতটা হতাশাব্যঞ্জক তা সহজেই অনুমেয়। সামনে রয়েছে ইতিহাস তবে সেটা তালাবদ্ধ।

৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটাই ছিল মিশরের ইতিহাস, আর সত্যি বলতে কি অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যেসব প্রাচীন ভাষা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল সেগুলি হলো ল্যাটিন, গ্রিক আর হিব্রু। তাই গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রাচীন ইতিহাস লেখা হয়েছিল তা এসব ভাষাতেই, যে ইতিহাস পূর্ণ বা আংশিকভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে এসেছে। সে কারণেই, রোমান, গ্রিক এবং ইহুদি ইতিহাস আমরা ভালোভাবে জানতে পারি। এর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাগৈতিহাসিক পুরাণকথা আমাদের কাছে চলে এসেছে।

মিশর অথবা ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার অধিবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস তিনটি পরিচিত ভাষার কল্পকথার মাধ্যম ব্যতিত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অজানাই রয়ে যায়। তাদের সময়ে গ্রিকরা আমাদের সময়ের মতোই মিশরীয় ব্যাপারে তফাতই রয়ে যায়। তারাও হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি, আর তাই কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিশরীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞই রয়ে যায়। তাদের সময়ে মিশরীয় সভ্যতা জীবন্তই ছিল আর বিকাশ লাভ করছিল। সেখানে ছিল মিশরীয় পুরোহিতরা, যারা বোধগম্যভাবে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতূহলী গ্রিক, যারা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর দল বেঁধে মিশরে ঢুকে পড়েছিল আর প্রাচীন মিশরের প্রকাণ্ড সব স্মৃতিচিহ্ন দেখে যাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত, আর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা খোঁজ খবর নিত, তবে মিশরীয় পুরোহিতরা ছিল সন্দেহপ্রবণ আর বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। সেজন্য তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকত।

গ্রিক ঐতিহাসিক *হেরোডোটাস* মিশর ভ্রমণে এসে পুরোহিতদের নিবিড়ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছিল আর এভাবে প্রাপ্ত তথ্য তার ইতিহাসের বইতে সন্নিবেশ করেছিলেন। তবে তার অধিকাংশ তথ্যই অবিশ্বাস্য মনে হয়। ধারণা করা যায় পুরোহিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে অনভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের লেগ পুল করেছিল যিনি পুরোহিতদের যে কোনো তথ্য চিন্তাভাবনা না করেই গোগ্রাসে গিলেছিলেন।

অবশেষে ২৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন গ্রিকরা মিশরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে, তখন একজন মিশরীয় পুরোহিত রক্ষণশীলতার খোলস থেকে বেরিয়ে নূতন শাসকের সুবিধার্থে নিজ হাতে গ্রিক ভাষায় মিশরের ইতিহাস লিখেছিলেন। অবশ্য সন্দেহ নাই, এতে তিনি পৌরোহিত্যের উৎসকেই ব্যবহার করেছিলেন। তার নাম ছিল *মানেথো*।

৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পরে কিছুদিনের জন্য মিশর সত্যিকারের "ঐতিহাসিক মিশর" হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমনকি যদিও *মানেথো* আবশ্যিকভাবেই ছিলেন অসম্পূর্ণ এবং তার কাহিনী তিনি সাজিয়েছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট মিশরীয় পুরোহিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত *মানেথোর* ইতিহাস বা তার উৎস কোনোটাই টিকে থাকেনি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর "ঐতিহাসিক মিশর" মানুষের অজ্ঞতার তিমিরে হারিয়ে যায়, আর পরবর্তী চৌদ্দশ বছর ধরে সেভাবেই রয়ে যায়। এমনটা নয় যে অজ্ঞতাটা ছিল চূড়ান্ত। *মানেথোর* লেখা থেকে অনেক লেখকই টুকরো টুকরোভাবে উদ্ধৃত করেছেন, যাদের লেখা এখন পর্যন্ত টিকে আছে। বিশেষ করে মিশরীয় শাসকদের একটা দীর্ঘ তালিকা, যা *মানেথোর* ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় *মানেথোর* ছয় শতাব্দী পরে জীবিত সিজারিয়ার একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক *ইউসেবিয়াসের* নাম। তবে এর মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ, যাকে মেটেই যথেষ্ট বলা চলে না। রাজার তালিকা শুধু ঐতিহাসিকদের তৃষ্ণাই বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তাতে করে পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকেই আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

অবশ্য এখনও মিশরের অনেক জায়গাতেই হায়ারোগ্লিফিক লিপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে সেগুলি এখন কেউই আর পড়তে পারে না। সবকিছু হতাশাজনকভাবে রহস্যময়ই রয়ে গেছে।

এরপর ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। বোশার্দ নামে এক ফরাসি জেনারেলএকটা দুর্গ মেরামত করতে গিয়ে একটা কৃষ্ণপ্রস্তর দেখতে পান। দুর্গটা ছিল নীলের এক পশ্চিম শাখানদের মোহনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থিত রশিদ শহরের নিকটবর্তী। ইউরোপীয়রা জেনারেলের নামানুসারে পাথরটার নাম দিয়েছিল "রোজেট্টা" পাথর।

রোজেট্টা পাথরে গ্রিক ভাষায় কিছু উৎকীর্ণ ছিল, যেখানে তারিখ দেওয়া ছিল ১৯৭ খ্রিস্টপূর্ব। লেখাটা নিজে থেকে তেমন কৌতূহলোদ্দীপক ছিল না, তবে যে বিষয়টা রোজেট্টা পাথরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল তা হলো, সেখানে পাশাপাশি দুধরনের হায়ারোগ্লিফিকও ছিল। যেমনটা মনে হয়েছিল তিনটি আলাদা লিপিতে একই কথা লিখিত ছিল, তাহলে ধরে নেয়া যায় অন্য দুটি লিপি হায়ারোগ্লিফিকেরই অনুবাদ।

রোজেট্টা পাথরের পাঠোদ্ধার করেছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক টমাস ইয়ং এবং ফরাসি পুরাতত্ত্ববিদ জঁ ফ্রাসোঁয়া শাপোলিয়োঁ। শাপোলিয়োঁ বিশেষ করে আর একটা ভাষা *কপ্টিক ল্যাংগুয়েজ* ব্যবহার করেছিলেন, যা তখন পর্যন্ত মিশরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। বর্তমানে মিশরে প্রচলিত ভাষা আরবি, তেরোশ বছর আগে আরবদের মিশর বিজয়কে ধন্যবাদ। শাপোলিয়োঁ এই মত পোষণ করতেন যে *কপ্টিক ভাষা* আমাদেরকে আরব বিজয়ের পূর্বের প্রাচীন ভাষার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ১৮৩২ সালে মৃত্যুর পূর্বে শাপোলিয়োঁ প্রাচীন মিশরীয় ভাষার একটি অভিধান ও একটি ব্যাকরণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে শাপোলিয়োঁকে সঠিক বলেই মনে হয়, কারণ ১৮৬০ এর দশকে তিনি হায়ারোগ্লিফিকের রহস্য উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন, আর ধীরে ধীরে সকল প্রাচীন লিপিরই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

উৎকীর্ণ লিপিগুলিকে অবশ্য ভালো ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যায় না (কল্পনা করুন আপনি বিভিন্ন সরকারি বাসভবন আর সমাধি লিখন থেকে আমেরিকার ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করছেন)। এমনকি যেসব লিপি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলিও কোনো না কোনো শাসকের গুণগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলিকে বলা যায় সরকারি প্রপাগান্ডা আর তা অকাট্যরূপে সত্য নয়।

তথাপি এসব লিপি এবং অন্যান্য উৎস থেকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মানেথোর রাজাদের তালিকা, ঐতিহাসিকরা যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তার থেকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস যে পরিমাণে উন্মোচিত হয়, রোজেট্টা পাথর আবিষ্কারের পূর্বে তা কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

এ ক ত্রি ক র ণ

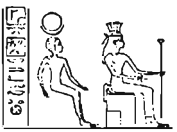

মানেথো রাজাদের তালিকা শুরু করেন যিনি উভয় মিশর, আপার ও লোয়ার একত্র করে তার সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন। ঐতিহ্যবাহী এই রাজার নাম ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনেস, যা মিশরীয় শব্দ *মেনার* গ্রিক রূপান্তর। একত্রিকরণের পূর্বে স্পষ্টতই আপার ঈজিপ্টে রাজত্ব করতেন।

একসময় ধারণা করা হতো মেনেস ছিলেন একজন কল্পকথার রাজা, বাস্তবে এমন রাজার অস্তিত্বই ছিল না। যাহোক, একজন শক্তিশালী রাজার তো অবশ্যই থাকার কথা যিনি সমগ্র মিশরকে এক করবেন, আর তিনি যদি মেনেস নাও হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই অন্য কেউ।

প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিগুলি নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তবে প্রায়শই দেখা যায়, রাজারা সিংহাসনে আরোহণের সময় অন্য নাম গ্রহণ করতেন, তাদের প্রকৃত নামের থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের নাম পরিবর্তন হতো। ১৮৯৮ সালে একটা প্রাচীন সমাধি খনন করে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে দেখা গেছে একজন রাজার নাম *নার্মার*, প্রথমে যাকে দেখা গিয়েছিল রাজমুকুট মাথায় আপার ঈজিপ্টের শাসক, তারপর তাকেই দেখা গেল লোয়ার ঈজিপ্টের মুকুট মাথায়। প্রাসঙ্গিকভাবে তাকেই মিশর একত্রীকরণের নায়ক হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, আর সম্ভবত *নার্মার* আর মেনেস একই ব্যক্তির দুই বিকল্প নাম।

যেভাবেই হোক, মেনেস গোটা মিশরের রাজা হন ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ঠিক যখন মিশরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটছিল। বিস্মিত না হয়ে উপায় নাই কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল। মেনেস কি একজন মস্ত যোদ্ধা ছিলেন, নাকি একজন সুচতুর কূটনীতিক? এটা কি দৈবাৎ, নাকি সুপরিকল্পিত? এর সাথে কি কোনো "গোপন অস্ত্র" জড়িত ছিল ?

কারণ একটা বিষয় লক্ষণীয়, মেনেসের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই মিশরে এশীয় অভিবাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত নিরাপত্তাহীন দেশের চাইতে সবুজ শ্যামল উর্বর শান্তিপূর্ণ নীল অববাহিকাকে অধিক বাসযোগ্য মনে করেছিল (আর এটা চলেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যখন এই উপত্যকায় হাতির দেখা মিলত, এত উর্বর, এত প্রশস্ত, এত কম জন অধ্যুষিত)।

এযুগে সূক্ষ্ম এশীয় প্রভাব লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু স্থাপত্য ও শৈল্পিক কৌশল যার আবির্ভাবকাল ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে নির্ণয় করা গেছে, তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তৎকালীন এশীয় কৌশল লক্ষণীয়। এশীয় অভিবাসীরা নিশ্চয়ই তাদের সাথে ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস অঞ্চলে প্রচলিত লিপিও সাথে করে নিয়ে এসেছিল।

এসময়ে এই প্রভাব লোয়ার ঈজিপ্টের চাইতে আপার ঈজিপ্টে বেশি লক্ষ করা যায়, কাজেই সভ্যতার যে অগ্রগতি তার সূচনা আপার ঈজিপ্টেই ঘটেছিল।

অপরপক্ষে এটা আপাত দৃশ্যমান যে একটা পুরাতাত্ত্বিক দুর্ঘটনার ফলেই এটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। লোয়ার ঈজিপ্ট শতাব্দীর পর শতাব্দী নীলবাহিত পলির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কাজেই সেই অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁড়ে বের করা ছিল বেশ কঠিন। তুলনামূলকভাবে আপার ঈজিপ্ট ও লেক মিয়েরিসের মতো স্বল্প বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে এটা ছিল অনেক সহজ। এই কারণেই হয়তো লোয়ার ঈজিপ্টকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তবু যখন দুই মিশরকে এক জাতিতে একত্র করা হয়, বিজেতার অভ্যুত্থান হয়েছিল আপার ঈজিপ্ট থেকেই।

এশীয় অভিবাসীরা শিল্পরীতি এবং লিখনশৈলী ছাড়া আরও কিছু কি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, যেমন যুদ্ধ এবং দেশ জয়ের কৌশল, আদিযুগে যেটা শান্তিপূর্ণ মিশরীয় জনগণের মধ্যে কখনোই গড়ে ওঠেনি। মেনেস নিজেও কি এশীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন, যাদের ঐতিহ্য ছিল যুদ্ধ এবং বিজয়, যাদের সৈন্যরা তাদের প্রতিবেশীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত? তিনিও কি তার পূর্বজদের মতো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন ?

মেনেসের সময়ের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বেই উত্তর-পূর্ব মিশরের সিনাই উপদ্বীপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাপ্ত আকরিক গলিয়ে তামা সংগ্রহ করতে শিখেছিল। নিশ্চিত করে বলা যায়, সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতু মাটির অভ্যন্তরে পিণ্ডাকারে অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলি গলানোর প্রয়োজন হতো না (বাদারিয়ানের ধ্বংসাবশেষ থেকে তামার তৈরি কিছু উপচার পাওয়া গিয়েছে যার সময় নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ৪০০০ খ্রীস্টপূর্ব)। এমনকি লৌহ ধাতুরও সন্ধান মিলেছে যা আকাশের উল্কাপাতের মাধ্যমে সৃষ্ট। অবশ্য অবিমিশ্র ধাতু পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুর্লভ এবং এসব ধাতু খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া যেত, যা শুধু অলংকার রূপেই ব্যবহার করা হতো।

ধাতু গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চয়ের উৎস থেকে তামা সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর মতো নানা উপকরণ তৈরি শুরু হয়। তামা নিজে থেকে অস্ত্রশস্ত্রে ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট শক্ত নয়, তবে টিনের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে তা দিয়ে ব্রোঞ্জ বানালে তা যথেষ্ট শক্ত হয়। যে যুগে সৈন্যবাহিনীকে ব্রোঞ্জের উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হয়, তাকে অভিহিত করা হয় *ব্রোঞ্জ যুগ* রূপে।

মেনেসের রাজত্বকাল শেষ হওয়ার কয়েক শতাব্দী পার হওয়ার পূর্বে ব্রোঞ্জ যুগ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, তবে তার বিশেষ বাহিনীকে সজ্জিত করার মতো কি যথেষ্ট ব্রোঞ্জ সহজলভ্য ছিল? এসব অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যেই কি তিনি মিশরের উপর শাসন চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? হয়তো এটা কোনো দিনই নিশ্চিতরূপে জানা যাবে না।

মানেথোর বিবরণ অনুসারে মেনেসের জন্ম শহর ছিল *থিনিস*, যার অবস্থান ছিল আপার ঈজিপ্ট, মোটামুটিভাবে প্রথম জলপ্রপাত ও বদ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে। মেনেস এবং তার উত্তরাধিকারীরা এখান থেকেই রাজ্য শাসন করতেন।

মেনেস হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন লোয়ার ঈজিপ্টের উপর তাকে যদি অধিকার কায়েম রাখতে হয় তাহলে তাকে যথাসম্ভব স্বদেশীরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, দূরত্বও কমিয়ে ফেলতে হবে, আবার *আপার ঈজিপ্টের* লোকের কাছেও নিজের পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এর সমাধান হলো দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় তার রাজধানী স্থাপন করতে হবে– যেটা দুই রাজ্যের বলেই প্রতিভাত হবে– আর এটাকে অন্তত খণ্ডকালীন রাজধানী বানাতে হবে (যুক্তরাষ্ট্রেও এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা হয়েছিল যখন এর বিভিন্ন অঞ্চল একীভূত করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের পর দেখা গিয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরস্পরের প্রতি সহনশীল নয়, তাই দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি একটি জায়গা ওয়াশিংটনে রাজধানী স্থাপন করা হয়েছিল)।

মেনেসের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বদ্বীপের অগ্রভাগ থেকে পনেরো মাইল দক্ষিণে। মিশরীয়রা হয়তো এর নাম দিয়েছিল *খিকুপ্টা* (প্টার বাড়ি), হয়তো মিশরীয়রা এখান থেকেই "এজিপ্টস" নামটা পেয়েছিল আর আমাদের কাছে যেটা হয়ে দাঁড়ায় ঈজিপ্ট। পরবর্তীকালে শহরটার মিশরীয় নাম দাঁড়িয়েছিল *মেনফে* গ্রিকদের কাছে যে নামটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল *মেম্ফিস*, আর ইতিহাসে এটা এই নামেই পরিচিত।

৩৫০০ বছর ধরে মিশরের ইতিহাসে মেম্ফিস ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ শহর, আর অধিকাংশ সময় ধরে এটা ছিল রাজধানী ও রাজকীয় সংস্থাপনের ধারক বাহক।

পারলৌকিক জীবন

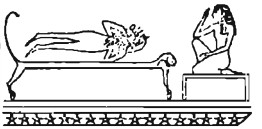

মানেথো মিশরীয় শাসকদের বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বংশ একটি নির্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্গত যারা পুরুষানুক্রমে মিশরের উপর কর্তৃত্ব করেছে, শাসন করেছে। মানেথো তিন সহস্র বর্ষব্যাপী ত্রিশটি রাজবংশের তালিকা প্রদান করেছেন।

তালিকার মধ্যে সেইসব রাজন্যবর্গকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা শুধু একত্রীকরণের পরই শাসক ছিলেন, কাজেই প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন *মেনেস*। মেনেসের আগের শাসনকালকে বলা হয়েছে "প্রাক-বংশীয় মিশর," যা প্রায় "প্রাগৈতিহাসিক" মিশরের সমার্থক।

প্রথম দুই বংশ, যাদের প্রত্যেকেই ছিল থিনিসের জাতক, তাদেরকে বলা হয়েছে *থিনিসীয় বংশ*। তাদের শাসনকালকে বলা হয়েছে মিশরের প্রাচীন যুগ, আর স্থায়ীত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ থেকে ২৬৮০ পর্যন্ত চার শতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত।

মেম্ফিসের গুরুত্ব, এমনকি প্রাচীন মিশরের পরিপ্রেক্ষিতেও নির্ণয় করা যায় সে সময়ের সমাধিগুলি দেখে। আর ইতিহাসে কবরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় এর ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে, বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম।

প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের উদ্ভবকে যুক্ত করা যায় প্রাগৈতিহাসিক শিকার-নির্ভর জীবনযাত্রার সাথে, যখন জীবিকানির্ভর করত শিকারপ্রাপ্তির উপর, আর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকারপ্রাপ্তিকে মনে করা হতো দৈবনির্ভর। তাই সে যুগে এক ধরনের প্রাণী-দেবতার উদ্ভব ঘটে, কারণ বিশেষ দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে সেই দেবতার নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রাণী শিকার সহজ হবে। যদি প্রাণীটি বিপজ্জনক হয় তবে আংশিকভাবে সেই প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে প্রাণীটি শিকার কম ক্ষতিকর হবে। মনে হয় সেই কারণেই, এমনকি পরবর্তী কালেও দেখা গেছে মিশরীয় দেবতাদের মাথা রূপ নিয়েছে বাজ, শেয়াল, ইবিস, নয়তো জলহস্তির।

তবে যখন কৃষি জীবনধারণের প্রধান উপায়রূপে আবির্ভূত হলো তখন নতুন দেবতা এবং নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রাচীন ধারার সাথে যুক্ত হলো। প্রাকৃতিক উপাসনার পর্যায়ে উঠে এল সূর্যদেবতা। নির্মেঘ মিশরীয় আকাশে সূর্য ছিল শক্তিশালী অনুষঙ্গ, আর তা ছিল আলো ও উত্তাপ বিতরণের প্রধান উৎস। তদুপরি মিশরে বন্যার আগমন ঘটত কেবল তারকাদের সাথে সূর্যের একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের সময়েই। কাজেই সূর্যকে দেখা হতো নদীর প্রাণদায়ী শক্তি হিসাবে এবং সকল প্রাণের উৎসরূপে। হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয়রা সূর্যকে পূজা করেছে বিভিন্ন নামে। *রে* বা *রা* নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

সম্ভবত জীবনচক্র; জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্মের ধারণা থেকেই সূর্যপূজার উদ্ভব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়, আবার ভোরবেলায় উদিত হয়। মিশরীয়রা প্রভাতে সূর্যোদয়কে কল্পনা করেছিল এক শিশুর জন্ম, যে দ্রুত বেড়ে উঠে মধ্যাহ্নে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জরাজীর্ণ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু তারপরেও পাতালপুরীর অন্ধকার গুহাপথ পেরিয়ে পরদিন প্রভাতে আবার শিশুরূপে তার পুনর্জন্ম ঘটে।

কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষির ক্ষেত্রেও অনুরূপ জীবনচক্র সহজ লক্ষণীয়। ফসল পাকে, সেটা কাটা হয়, যা মৃত্যুর সমতুল্য, তবে পরবর্তী মওশুমে বীজ থেকে আবার ফসলের জন্ম।

ঘটনাক্রমে এমনি এক জীবনচক্র মিশরীয় ধর্মেও প্রতিফলিত। এটা গড়ে উঠেছে ফসলের দেবতা *ওসিরিসকে* কেন্দ্র করে যাকে পুরোপুরি মানবিক চরিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরাণকথা অনুসারে তিনিই মিশরীয়দের শিল্প ও কলা বিদ্যা শিখিয়েছেন, যার মধ্যে কৃষিও অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সভ্যতার রূপকার।

কল্পকথা প্রচলিত আছে যে *অসিরিস* তার ছোট ভাই *সেট* এর দ্বারা নিহত হয় (*সেট* সম্ভবত শুষ্ক মরুভূমির রূপকল্প, কারণ যদি কোনো কারণে নীলের বন্যা ব্যাহত হয়, তাহলে ফসলহানি অনিবার্য)। *অসিরিসের* সুন্দরী ও একান্ত অনুগত স্ত্রী *আইসিসেরও* সম্পূর্ণ মানবিক রূপ লক্ষণীয়, বার বার তার শরীর পুনরুদ্ধার করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়, কিন্তু *সেট* বার বার তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, আর পূনর্নির্মানের সময় একটা টুকরা হারিয়ে যায়। অসম্পূর্ণ অসিরিস কখনো মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, আর তাই সে পাতালপুরিতে চলে যায়, যেখানে সে অধঃপতিত মানব আত্মার উপর কর্তৃত্ব করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসিরিস ও আইসিসের পুত্র *হোরাস* (বাজপাখির মাথাবিশিষ্ট দেবতা, যে ছিল প্রাচীন পৌরাণিক শস্য-দেবতার নূতন রূপ) *সেটকে* হত্যা করে তার প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত করে)।

এই গল্পটিও সূর্যচক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *অসিরিসকে* অস্তায়মান সূর্যের প্রতিরূপ কল্পনা করা যেতে পারে, যে নিহত হয় রাত্রির দ্বারা। মৃতপ্রায় সূর্য পাতালপুরিতে অবতরণ করে, যেমন করে *অসিরিস*।

স্বাভাবিকভাবেই এমনি একটি জীবনচক্র মানুষের উপরও আরোপিত করা যায়। খুব কম লোকই মৃত্যুকে স্বাগত জানায় আর প্রায় সবাই আশা করে মৃত্যুর পরেও কোনোভাবে যেন জীবন দীর্ঘায়িত হয়, অথবা পুনর্জীবন লাভ করা যায়, যেমনটা ঘটে থাকে শস্য এবং *অসিরিসের* ক্ষেত্রে।

মানুষের পুনর্জন্মের নিশ্চয়তা প্রদানে দেবতারা, (বিশেষ করে *অসিরিস)*, এসব ব্যাপারে যার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ, তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপাসনা করতে হবে।

মিশরীয়রা সাবধানতার সাথে প্রার্থনার আনুষ্ঠানিকতা, মন্ত্র এবং প্রার্থনা-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করে রাখত, সেগুলি যেন সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় এবং গীত হয়, যাতে মৃত্যুর পরে আত্মার অবিনাশিতা নিশ্চিত হয়। এসব মন্ত্র আনুষ্ঠানিকতা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হতে থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে এগুলির সময়কাল প্রাচীন যুগে প্রসারিত, এমনকি মিশরে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও পূর্বে।

এসব ফর্মুলার তালিকাভুক্ত একটা দলিল– যা একটা হায়ারোগ্লিফিক সংগ্রহ, আর যার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বাইবেলের একটা প্রার্থনা সঙ্গীতের সাথে– যেটা ১৮৪২ সালে কার্ল রিচার্ড লেপসিনস নামে এক জার্মান মিশরতত্ত্ববিদ প্রকাশ করেন। এটা তার কাছে বিক্রি করে এক লুটেরা, একটা প্রাচীন সমাধি লুট করার সময় সে এটা পেয়েছিল।

দলিলটার নামকরণ হয় "দ্য বুক অব দ্য ডেড," যদিও এই নামটা মিশরীয়দের দেওয়া নাম নয়। বইটাতে দেওয়া আছে সেইসব মন্ত্র ও ফর্মুলা যাতে মৃতরা নিরাপদে বিচারগৃহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতে পারে। আর যদি পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় (পাপ পুণ্য সম্বন্ধে মিশরীয়দের ধারণা আধুনিক কালের একজন সৎ মানুষের মতোই), তাহলে সে অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করবে আর দেবতা অসিরিসের সাথে অনন্তকাল বাস করবে।

পরকালের অনন্ত সুখ উপভোগ করতে হলে সশরীর উপস্থিতি প্রয়োজন। হয়তো এই ধারণাটার উদ্ভব ঘটেছে মিশরের শুষ্ক ভূমির কারণে, যেখানে মৃতের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হতো অত্যন্ত ধীর গতিতে, যেখানে দীর্ঘদিন শরীরের স্বাভাবিকত্ব বজায় থাকত। এ থেকেই মিশরীয়রা শরীরের প্রলম্বিত ধারণা লাভ করে, যে ধারণাটা ছিল তাদের কাছে যেমন স্বাভাবিক তেমনি কাঙ্ক্ষিত, আর তারা এটাকে দীর্ঘায়িত করার উপায় উদ্ভাবন করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই বুক অব ডেড-এ মৃতের শরীর সংরক্ষণের উপায় নিয়ে নির্দেশনা ছিল। অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যাতে প্রথমেই পচনক্রিয়া শুরু হয়) তা অপসারণ করে আলাদা পাত্রে সংরক্ষণ করা হতো, তবে হৃৎপিণ্ড, যাকে জীবনের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়েছিল, তা শরীরের অভ্যন্তরেই রেখে দেয়া হতো।

তারপর দেহটি কেমিক্যালে ডুবিয়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে তার উপর পিচের প্রলেপ মাখিয়ে দেয়া হতো যাতে আর্দ্রতা রোধ করা যায়। এভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে "মমি"। মমি একটি ফার্সি ভাষার শব্দ, যার অর্থ পিচ (ফার্সি কেন? কারণ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একসময় পারসিকরা মিশর শাসন করত, তাদের কিছু কিছু শব্দ গ্রিক ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সেখান থেকে আমাদের কাছে।

হতে পারে *মমিকরণ* বিষয়টি মিশরীয়দের উৎকণ্ঠা আর কুসংস্কারের ফসল, তবে অবশ্যই এর কিছু ভালো ফল রয়েছে। এটা মিশরীয়দের রাসায়নিক সম্বন্ধে জানার প্রেরণা যোগায়। এভাবে তারা অনেক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছিল, এমনকি অনেকে মনে করে "খেম" (Khem) শব্দ থেকে কেমিস্ট্রি (Chemistry) শব্দের উদ্ভব। এই খেম শব্দটি প্রাচীন মিশরের নাম।

যদি কোনো কারণে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে বা অপহৃত হয়, তাহলে জীবন পুনস্থাপনের জন্য অন্য ব্যবস্থাও রাখা হতো। মৃত ব্যক্তির মূর্তি নির্মাণ করে সমাধির মধ্যে স্থাপন করা হতো, আর জীবিত অবস্থায় ব্যক্তিটি যেসব জিনিস ব্যবহার করত– যেমন যন্ত্রপাতি, অলংকার, আসবাব ও চাকর বাকরের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, এমনকি খাদ্য পানীয়ও রেখে দেয়া হতো।

তাছাড়া মৃত ব্যক্তিটির জীবৎকালের ঘটনাবলি সমাধির দেয়ালে উৎকীর্ণ এবং চিত্র খোদাই করে রাখা হতো। এসব দেয়াললিখন ও চিত্র থেকে সেকালের মিশরীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। হাতি, জলহস্তি ও কুমীর শিকারের ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সেকালের নীল উপত্যকার সমৃদ্ধ জীবনযাপনের লেখচিত্র।

ভোজনোৎসবের চিত্রও দেখা যায়, যেখান থেকে আমরা মিশরীয় খাবারের ধারণা লাভ করতে পারি। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক জীবন ও ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ছবিও দেখা যায়। পারিবারিক জীবনে উষ্ণ প্রেমের সম্পর্কও দেখানো হয়েছে। মেয়েরা সমাজে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করত (গ্রিকদের চাইতে অনেক উঁচু); শিশুরা অনেকটা বেশি প্রশ্রয় পাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যেত। এটা বেশ অবাক করার মতো যে মিশরীয়দের ইহলৌকিক চিন্তার চাইতে পারলৌকিক ভাবনা অনেক বেশি অগ্রাধিকার লাভ করেছিল।

মৃত্যুর পরে জীবনের নিশ্চয়তাবিধান অনেক বিস্তার ও ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত এটা এই কারণে যে প্রথম দিকে শুধু রাজন্যদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য ছিল। রাজাকে দেখা হতো দেবতাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আর সেজন্য রাজার উপর দেবত্ব আরোপ করা হতো। যদি তিনি সকল রীতিনীতি মেনে দেবতাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, তাহলে নীলের পানির স্ফীতি সঠিক মাত্রায় থাকবে, অঢেল ফসল ফলবে আর রোগবালাই দূরে থাকবে। রাজাই সবকিছু, রাজাই মিশর।

স্বাভাবিকভাবে রাজার মৃত্যু হলে সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা আবশ্যক ছিল, কারণ এটা ছিল সমগ্র মিশরের সমাহিতকরণ, আর তার রাজত্বকালে যাদের মৃত্যু হয়েছে, রাজার সাথে সাথে তারা সবাই অনন্ত জীবন লাভ করবে।

সময় গড়িয়ে চলার সাথে সাথে মিশরের সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে, বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা, প্রাদেশিক শাসকরা– যারা অভিজাত সম্প্রদায়– একই সম্মাননা প্রত্যাশা শুরু করে। তারাও সমাধি মন্দির আর মমিকরণ কামনা করে ব্যক্তিগত চিরস্থায়ীত্ব, রাজার মাধ্যমে নয়। এটা বৃহত্তর ধর্মীয় মাত্রা সংযোজন করতে পারলেও, মিশরীয়দের জাতীয় প্রচেষ্টার অধিকাংশই একটা নিষ্ফল সমাহিতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্যয়িত হয়ে যায়। তাছাড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বেড়ে যায় বিপজ্জনক মাত্রায়।

যেহেতু সম্পদশালী আর ক্ষমতাশালীরাই এভাবে সমাহিত হতো, তাই একে অন্যকে অতিক্রম করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ত। তাই মৃতের আত্মীয়স্বজন সর্বদাই চেষ্টা করত স্বজনদের জাঁকজমকপূর্ণভাবে সমাহিত করার।

সমাধিগৃহে মূল্যবান ধাতুর অলংকার ও তৈজস দেওয়ার কারণে সর্বদাই তা কবর লুটেরাদের আকর্ষণ করত। তাই কবর রক্ষা, মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ রাখা, আইনের প্রতিবন্ধকতা ও দেবতাদের রোষ থেকে বাঁচনো অত্যন্ত কঠিন ছিল, আর খুব অল্পসংখ্যক কবরই আজকের দিন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

আমাদের বুঝতে হবে এমন এক সময় যখন বিকল্প কাগজের মুদ্রার প্রচলন হয়নি, তখন মিশরীয়দের এভাবে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ কবরে রেখে দেয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না, যাতে করে অর্থনীতিতেও ধস নেমেছিল। কবর লুটেরাদের মতলব যাই থাকুক না কেন, তারা সোনারূপা বের করে এনে মুদ্রা সার্কুলেশন বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল।

কবরের নজির থেকেই প্রাচীনকালে মেম্ফিসের গুরুত্ব বোঝা যায়। এক সময় যেখানে মেম্ফিস শহর ছিল, সেখানে নীল নদের প্রান্ত ঘেঁষে শুরু হয়ে মরুভূমির সীমান্ত পর্যন্ত মৌচাকের মতো অসংখ্য চুনামাটির কবর ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে এখানে রয়েছে সাক্কারা নামে একটা গ্রাম, আর সমাধিক্ষেত্রটাও এই নামেই পরিচিত।

প্রাচীনতম কবরগুলি বাড়ির বাইরে নির্মিত আয়তাকার বেঞ্চের মতো। আধুনিক আরবি ভাষায় এই বেঞ্চগুলিকে বলে "মাস্তাবা," আর প্রাচীন কবরগুলিকেও এই নামেই অভিহিত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন মাস্তাবাগুলি ছিল ইটের তৈরি। সমাধিকক্ষটি ছিল একটি সুরক্ষিত কফিন, কোনো কোনোটি পাথরের তৈরি, কোনো কোনোটির উপরিতলও পাথরের। এর উপরে থাকত একটা চেম্বার যেখানে মৃত ব্যক্তির জীবনচিত্র অঙ্কিত থাকত যাতে লোকে তার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারে। সর্বপ্রাচীন কোনো কোনো সমাধিকে মনে করা হতো প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের। যদি তাই হয়, তাহলে কিছুকালব্যাপী মেম্ফিস ছিল সেই সময়ের রাজধানী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. প্রাচীন রাজত্ব

ইমহোটেপ

প্রথম দুই রাজবংশের রাজনৈতিক বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায়। *মানেথোর* তালিকায় আমরা প্রায় বিশ জন রাজার নাম দেখতে পাই, তবে তার বেশি নয়। কাহিনী প্রচলিত আছে যে *মেনেস* প্রায় ষাট বছর রাজত্ব করেছিলেন, যারা মিশরের পশ্চিম উপকূলে কর্তৃত্ব করত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত তিনি একটি জলহস্তির উদরস্থ হন। তবে এগুলির কোনোটাকেই যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায় না, বিশেষ করে শেষেরটি, কারণ জলহস্তিরা তৃণভোজী।

তৎসত্ত্বেও প্রাচীন মিশর ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধিশালী হচ্ছিল, আর সেই সাথে দেবত্বের দাবীদার রাজাদের প্রতাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রজাদের চোখে তারাই ছিল ধনসম্পদের নিয়ন্তা।

স্বাভাবিকভাবেই রাজারা ব্যাপৃত থাকত জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে। কারণ জনগণের শ্রদ্ধাভক্তি এবং তাদের উপর দেবত্ব আরোপ রাজাদের বিশেষভাবে আপ্লুত করত। তাছাড়া এর একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও ছিল। জীবিত ও মৃত উভয় ক্ষেত্রে রাজাদের শানশওকত, তাদের দেবত্ব নিয়ে প্রজাদের মধ্যে নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করত, আর এতে করে তার নিরাপদে রাজ্য শাসনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেত।

এধরনের নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর আরও বৃদ্ধি পেত। আমরা খুব কমই জানতে পেরেছি কীভাবে পুরনো রাজবংশের সমাপ্তি আর নূতন রাজবংশের উত্থান ঘটত। অনুমান করা যায় পর পর কয়েকজন দুর্বল উত্তরাধিকারীর কারণেই রাজবংশের পতন ডেকে আনত। হয়তো কোনো শক্তিশালী জেনারেল ক্ষমতা দখল করত, অথবা রাজদরবারের কোনো প্রভাবশালী অমাত্য প্রথমে রাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদেষ্টা, তারপর রাজার শক্তিদাতা এবং শেষ পর্যন্ত রাজার বার্ধক্য অথবা দুর্বলতার সুযোগে তাকে সরিয়ে দিয়ে বা গোপনে হত্যা করে নিজেই রাজক্ষমতা দখল। এমনও হতে পারে যে রাজবংশে পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাব দেখা দিল আর সেই সুযোগে কোনো জেনারেল বা রাজকর্মচারী পুরাতন বংশের কোনো মহিলাকে বিয়ে করে নিজেকে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে ঘোষণা করল।

জাতিও পুরনো রাজবংশের একজন দুর্বল, অক্ষম, অপ্রাপ্তবয়সী শাসকের পরিবর্তে একজন শক্তিশালী রাজাকে স্বাগত জানাত। তবে একজন দেবত্বপ্রাপ্ত রাজপরিবারের প্রতি মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা সহজে দূর করা সম্ভব হতো না। সে কারণে নূতন শাসক এমন কিছু চমকপ্রদ দৈবী শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করত যা পূর্বতন রাজাদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যায়।

এটাই ঘটে থাকতে পারে যখন তৃতীয় রাজবংশ সিংহাসনে আরোহণ করে। ক্ষমতার প্রদর্শন এতই উল্লেখযোগ্য ছিল যে এই রাজবংশের আরম্ভকে বলা হয় প্রাচীন রাজত্ব (এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় পরবর্তী রাজবংশসমূহের মহানুভবতা ও জাঁকজমক, ইতিহাসে যাদের পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজবংশরূপে)।

তৃতীয় রাজবংশের প্রথম (সম্ভবত দ্বিতীয়) রাজা ছিলেন *জোসার*। তার রাজত্বকালের শুরু আনুমানিক ২৬৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আর তিনি ভাগ্যবান ছিলেন *ইমহোটেপের* মতো একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পেয়ে।

ইমহোটেপ ইতিহাসে পরিচিত প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয় আর তাকে ঘিরে কল্পকথা তৈরি হতে থাকে। তিনি পরিচিতি লাভ করেন একজন মহান চিকিৎসকরূপে, যার আরওগ্য করার ছিল যাদুকরী ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে বহু শতাব্দী পরে মিশরীয়রা তাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের দেবতা বলে গণ্য করত। মনে করা হয় তিনি খাদ্য সঞ্চয় করে খরাজনিত দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মিশরবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। আর সম্ভবত বাইবেলের যোসেফের কাহিনী ইমহোটেপকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল।

চিকিৎসক হিসাবে গড়ে ওঠা কল্পকাহিনী ছাড়াও একজন কর্মকুশলী বিজ্ঞানী হিসাবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তবে এটা বাস্তব সত্য যে ইমহোটেপই ছিলেন একজন সত্যিকারের স্থপতি। তিনি *জোসারের* জন্য একটা *মাস্তাবা* নির্মাণ করেন যেটা ছিল এযাবৎ নির্মিত কবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর এটা তৈরি হয় পাথর দিয়ে, ইট দিয়ে নয়। আর এতেই নূতন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছিল। ইমহোটেপ উভয় পার্শ্বে ২১০ ফিট দীর্ঘ আর ২৫ ফিট উচ্চ এই মাস্তাবাটা নির্মাণ করেছিলেন *সাক্কারাতে*। এটাই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ প্রস্তর নির্মিত স্থাপনা, তবে এটা মানব নির্মিত সংরক্ষণ, কারণ পাথর এমনভাবে খোদাই করা হয়েছিল যাতে করে স্থাপনাটা বৃক্ষ বা নলখাগড়ার রূপ লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোসার কিন্তু মাস্তাবা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, অথবা হয়তো ইমহোটেপ নিজেও তার নূতনত্বে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাই এর চাইতে উন্নততর কিছু করতে চেয়েছিলেন। কারণ যাই হোক না কেন ইমহোটেপ মাস্তাবাটার ভিত্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বাড়িয়ে ৪০০ ও ৩০০ ফিট করেন। তারপর এর উপরে ক্ষুদ্রতর আর একটা মাস্তাবা নির্মাণ করেন, তার উপরে আরও একটা এমনি করে পর পর অনেকগুলি। অবশেষে যার উচ্চতা গিয়ে দাঁড়ায় ২০০ ফিট।

তার চেয়েও বড় কথা, একে ঘিরে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর স্থাপনা নির্মাণ করেন, যার নিশানা এখনও রয়ে গেছে, আবার গোটা এলাকাটা লাইমস্টোনের প্যানেল দিয়ে ঘেরাও করা। পরিবেষ্টিত স্থানটির দৈর্ঘ্য ১৮০০ ফিট এবং প্রস্থ ৯০০ ফিট।

নির্মাণশৈলীর সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের অনেকটাই এখন ম্লান হয়ে গেছে, তবে আদি স্থাপনা ভাঙ্গাচোরা আর অযত্ন মেরামতে অনেকটা ম্লান হলেও নির্মাণের ৪৬০০ বছর পরেও এটা এখনও টিকে আছে। এটা যে শুধু পাথরের তৈরি পৃথিবীর প্রথম স্থাপনা তাই নয়, মানুষের তৈরি সর্বপ্রাচীন নির্মাণ যা এখনও পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্দেহ নাই *ইমহোটেপ কর্তৃক জোসারের* বহুমুখি মাস্তাবা নির্মাণ অতীতের নির্মাণশৈলীর এক মহান নিদর্শন, সময়ের মাপকাঠিতে এ বিশাল অগ্রগতি, যার প্রশংসা করে কখনো শেষ করা যাবেনা, তবে শূন্য থেকে এর আবির্ভাব ঘটেছিল মনে করা ভুল হবে। আটলান্টিসের আশ্রয়প্রার্থীদের দ্বারা এর সূত্রপাত ভাবাও ঠিক নয়। মিশরীয়দের বহু শতাব্দীর ধীর ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছিল এই কৌশল।

তবে বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মধ্যেই প্রাচীন রাজবংশের কীর্তিকলাপ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জোসারের রাজত্বকালেই মিশরীয় লিপি পরিপূর্ণতা লাভ করে (ইমহোটেপ, যার উপর মিশরের সকল অগ্রগতির কৃতিত্ব আরোপিত হয়, মিশরীয় লিপি ও স্থাপত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন)। হায়ারোগ্লিফিক লিখন আর শুধু বস্তুর কার্টুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, মানবচিন্তার বিমূর্ত অভিব্যক্তিও প্রকাশ পেল।

প্যাপিরাস রীড (প্যাপিরাস শব্দটি আমাদের কাছে এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে তবে এর উৎস অজানাই রয়ে গেছে), যা নীল নদের উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মাত, তাই লেখার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হতো। রীডের অন্তঃসার নিষ্কাশন করে নেয়া হতো, তারপর আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে শুকিয়ে নেয়া হতো, যার ফলে একটি মসৃণ, দৃঢ়, এবং স্থায়ী অবতল পাওয়া গিয়েছিল। প্রাচীন কোনো জাতিই এত উন্নত লেখার উপকরণ লাভ করেনি। ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস অঞ্চলে ভারী মাটির ফলক ব্যবহার করা হতো আর প্রতীকগুলি এর উপর ঠুকে দেয়া হতো। এটা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পর্যাপ্ত ছিল ঠিকই তবে মিশরীয়দের মতো এত সুন্দর ছিলনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিক ও রোমান সভ্যতাতেও প্যাপিরাস ব্যবহার করা হয়েছিল যতদিন না এর সরবরাহ এত কমে গিয়েছিল যে এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকাল আমরা প্রায় একই ধরনের একটা জিনিস লেখার কাজে ব্যবহার করি যার উপাদান কাঠ থেকে সংগ্রহ হয়, আর আমরা এটাকে এখনও বলি *পেপার*, যদিও প্যাপিরাসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই।

লেখার জন্য সুবিধাজনক ও সস্তা অবতল প্রাপ্তি সভ্যতার অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। মুখের কথার চাইতে লিখিত নির্দেশনা প্রদান অনেক বেশি কার্যকর ছিল, বিশেষ করে যে সব বিষয়ে ভ্রান্তি বিপজ্জনক হতে পারে, যেমন অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে।

সম্ভবত এটা কোনো দৈবক্রম নয় যে সর্বপ্রাচীন যে প্যাপিরাস গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে (হয় এটা প্রাচীন রাজবংশের আমলের, নয়তো সে সময়ের কোনো বইয়ের কপি) বলা হয় *এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস*, যাতে ফ্র্যাকচারের মতো রোগের চিকিৎসার কথা লেখা আছে।

পি রা মি ড

বিশালাকৃতি সমাধিগৃহ নির্মাণ মিশরীয়দের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মিশরীয় রাজাদের উত্তরসূরিরাও পূর্বজদের মতো সমাধি নির্মাণের চিন্তায় উদগ্র হয়ে পড়ত, সেই সমাধি হবে আরও বিশাল আরও জাঁকজমকপূর্ণ। এই ইচ্ছার চাপ থেকেই স্থাপত্য কলাকুশলতায় উন্নতি হচ্ছিল। ইমহোটেপ তার স্থাপনায় ব্যবহার করেছিলেন ছোট ছোট পাথর, ইতিপূর্বে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ইটের অনুকরণে। এসব ছোট পাথরের টুকরা মাপমতো কেটে, মসৃণ করে সঠিক স্থানে বসানোর চাইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সাইজ মতো কেটে সঠিক স্থানে বসানো অনেক সহজ ছিল। পাথরের আকার যত বড় হতো, সেগুলি যথাস্থানে বসাতে সময় তত কম লাগত, অবশ্য পাথরগুলির বহনসাধ্য হওয়া আবশ্যক ছিল।

বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড বহন করার কাজে মিশরীয়রা ব্যবহার করেছিল শ্লেজ, রোলার, এবং ঘর্ষণ কমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ তেল, আর বিপুল পরিমাণ মানুষের পেশিশক্তি। পরবর্তী দুই শতাব্দী যাবৎ যেসব বিপুলায়তন সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল, তা সর্বকালের জন্য বিশ্বের বিস্ময়রূপে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে, যা প্রাচীন রাজবংশ তথা মিশরের সার্বিক পরিচিতি।

দুহাজার বছর পরে যখন গ্রিকরা দলে দলে মিশরে প্রবেশ করেছিল, এসব বিপুলায়তন স্থাপনা দেখে তাদের মুখ হা হয়ে গিয়েছিল, যেসব স্থাপনা ইতিমধ্যেই বহু শতাব্দী পার হয়ে এসেছে। তারা এগুলির নাম দিয়েছিল *পিরামিড* (pyramid),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটির উৎস অজ্ঞাত। জোসারের বহুমুখী মাস্তাবা এই প্রকারের একক উদাহরণ, যা এযাবৎ টিকে আছে। পরবর্তী রাজাদের মাথায় এই চিন্তাটা খেলে গিয়েছিল যে পিরামিডের প্রান্তগুলি ধাপে ধাপে উত্তোলিত না করে মসৃণ রাখলেই তা টেকসই হওয়ার বেশি সম্ভাবনা (ধাপবিশিষ্ট হওয়ায় জোসারের পিরামিডকে বলা হয় সিঁড়ি পিরামিড)।

নূতন ধারার প্রচলন হয় ২৬১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যখন মিশরে চতুর্থ রাজবংশ ক্ষমতা লাভ করে। এই রাজবংশের শাসনকালে মিশর তার সংস্কৃতির শীর্ষে আরোহণ করে।

সম্ভবত *স্নেফেরু* ছিলেন এই রাজবংশের প্রথম ব্যক্তি, যিনি তার পূর্বসূরি তৃতীয় রাজবংশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এটা করার জন্য তিনি তার সিঁড়ি পিরামিডকে আগের চাইতে আরও অনেক বড় করে বানিয়েছিলেন– যার ধাপ ছিল আটটি। তারপর তিনি ধাপের মধ্যবর্তী অবচ্ছেদগুলি পূরণ করে দেন যাতে পার্শ্বদেশগুলি সুসমতল দেখায়, অবশেষে পুরো স্থাপনাটা সাদা লাইমস্টোন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, যাতে উজ্জ্বল মিশরীয় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে এর মহিমা পূর্বতন সকল কীর্তিকে ছাড়িয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তী প্রজন্মে এর লাইমস্টোন খুবলে তুলে নিয়ে অন্যত্র ব্যবহার করা হয়েছে (অন্য পিরামিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য)। তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইমস্টোন এমনিতেই খসে পড়েছে, যাতে মনে হয় পিরামিডটি অসম স্তরে নির্মিত।

স্নেফেরু আরও একটা পিরামিড তৈরি করান যেখানে প্রতিটি উপরের ধাপ নিচের চাইতে সামান্য ছোট, কাজেই পিরামিড স্তরবিন্যস্ত করেও মসৃণ রইল। উপরের দিকের প্রস্তরগুলিকে একটু বেশি ঢালু করা হয়েছিল যাতে শীর্ষে পৌছনো দ্রুততর হয়। হয়তো বয়োবৃদ্ধির কারণে স্নেফেরু চাইছিলেন নির্মাণ কাজটা দ্রুততর করতে যাতে তার মৃত্যুর পূর্বেই নির্মাণ কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এটাকে বলা হয় *বক্র পিরামিড*।

স্নেফেরুর পর প্রত্যেকটি পিরামিড সত্যিকারের পিরামিড হয়ে উঠেছিল (আশিটার মতো এখনও টিকে আছে) যেগুলি মসৃণভাবে ঢালু হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।

চতুর্থ রাজবংশের বিলাসিতা, যা রূপলাভ করেছে পিরামিডের মধ্য দিয়ে, তাতে অনুমান করা যায়, তারা নিশ্চয়ই চাকচিক্যময় দুর্গ বানিয়েছিল, আর রাজারা ব্যবসাবাণিজ্যে উৎসাহ যোগাত। মিশরের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ব্যয় করা হতো, যেসব সম্পদ দেশে উৎপন্ন হতো না সেগুলি বিদেশ থেকে ক্রয় করার কাজে। মিশরীয় সেনাবাহিনী সিনাই উপদ্বীপ দখল করেছিল, কারণ ছিল এর তামার খনি– যে তামা অলংকার হিসাবে দেশে ব্যবহার করা যেত, আবার বিদেশেও রফতানি করা হতো।

একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দেশে পাওয়া যেত না, আর তা হলো কাঠের গুড়ি, যা পাওয়া যেত সোজা দীর্ঘ গাছ থেকে। কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার হতো দৃঢ়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণীয় স্তম্ভ নির্মাণে। বিশাল স্থাপনা নির্মাণে পাথরের চাইতে সহজে পরিবহণযোগ্য। পাথরকাটা, বহন করা, মসৃণ করা অনেক বেশি কঠিন। নীলের উপত্যকায় সঠিক প্রজাতির গাছ জন্মাত না, ওখানকার গাছপালা উপ-উষ্ণমণ্ডলীয়, তবে এগুলি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলে সিনাই উপদ্বীপে পাহাড়ের ঢালে জন্মায়।

এই অঞ্চলটার নানারকম নাম আছে। প্রাচীন হিব্রুরা উপকূলের দক্ষিণাংশকে বলত *কেনান*, এর সামান্য উত্তরাঞ্চল পরিচিত ছিল লেবানন নামে। লেবাননের *সিডার* বৃক্ষ ছিল চতুর্থ রাজবংশের কাছে দারুণ কাঙ্খিত। তাই বাইবেলে বহুবার এর গুণকীর্তন করা হয়েছে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে গ্রিকরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে বলত ফিনিশিয়া, আর এর পেছনের এলাকাকে বলত সিরিয়া। এসবই খুব পরিচিত, আর আমি এই নামগুলিই ব্যবহার করব।

চতুর্থ রাজবংশের রাজারা হয়তো সিনাইয়ের উপর দিয়ে স্থলপথে বাণিজ্যবহর পাঠাত, আর তারপর উত্তর দিকে যেখানে সিডারবৃক্ষ সহজলভ্য ছিল। উভয় পথ মিলে এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩৫০ মাইল, আর সেসব দিনে স্থলপথে যাতায়াত ছিল শ্রমসাধ্য আর কষ্টকর। তার চেয়েও বড় কথা এত দীর্ঘ পথে কাঠের গুড়ি টেনে আনা ছিল প্রায় অসম্ভব।

বিকল্প ব্যবস্থা ছিল জলপথে ফিনিশিয়া পৌঁছানো। দুর্ভাগ্যবশত মিশরীয়রা সমুদ্রগামি জাতি ছিলনা (আর কখনো হতেও পারেনি)। তাদের অভিজ্ঞতা বলতে নীলের মৃদু শান্ত স্রোতধারা। তারা এটা ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে *স্নেফেরুর* আমলে ১৭০ ফিটের মতো নৌকা নীলের উজান ভাটিতে নির্বিঘ্নে চলাচল করত।

তবে নদীতে চলাচলের উপযোগী জাহাজ ভূমধ্যসাগরের অশান্ত ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য মোটেই উপযোগী ছিল না। তবু চাহিদার তাগিদে স্নেফেরু চল্লিশটার মতো জাহাজ পাঠিয়েছিলেন সিডার কাঠ সংগ্রহের জন্য। এ ধরনের কিছুটা শক্ত করে বানানো জাহাজ নীল নদ থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢুকে পড়ত আর সমুদ্রের কূল ঘেঁষে যাত্রা করে অবশেষে ফিনিশিয়ায় প্রবেশ করত। সেখানে বিশাল বিশাল কাঠের গুঁড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বোঝাই করে আবার মিশরে ফিরে আসত।

আমাদের সন্দেহ, কিছু কিছু জাহাজ মাঝপথে হারিয়ে যেত (যেমনটা সব যুগেই হয়ে থাকে, এমনকি আমাদের সময়েও), তবে যথেষ্টসংখ্যক টিকে থাকত লাভজনক বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য। মিশরীয়রা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র লোহিত সাগরেও প্রবেশ করার সাহস দেখিয়েছিল, যেটা ছিল দেশের পূর্বপ্রান্তে, আর সে পথে তারা দক্ষিণ আরবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল, আর সেখান থেকে আফ্রিকার সোমালি উপকূলে। সেখান থেকে তারা ধুনা আর রেসিন সংগ্রহ করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি নীলের প্রবাহ ধরে প্রথম প্রপাত পার হয়ে দক্ষিণের রহস্যময় অরণ্যে প্রবেশ করত, আর সেখান থেকে হাতির দাঁত আর পশুর চামড়া নিয়ে আসত, (চতুর্থ রাজবংশের আমলে উপত্যকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং নিবিড় চাষাবাদের কারণে, ইতিমধ্যেই সেখানকার বৃহদাকার প্রাণীদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছিল, হাতিরা দক্ষিণ দিকে প্রথম প্রপাত পার হয়ে চলে গিয়েছিল)।

বিশাল পিরামিড

স্নেফেরুর উত্তরাধিকারী ছিলেন খুফু। তার আমলেই পিরামিড নির্মাণ সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে, কারণ তিনিই সর্বকালের সর্ববৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করেন। এটা ঘটেছিল ২৫৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ইমহোটেপের নির্মাণের ঠিক এক শতাব্দী পরে। এ সময়টাতে মিশরীয় প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছিল।

খুফু তার দানবাকার পিরামিড বানিয়েছিলেন সাক্কারা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে একটা পাহাড়ী উপত্যকায়, আজ যেখানে গিজা শহর অবস্থিত। এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেখা গেল এর বর্গাকৃতি তলদেশে প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ৭৫৫ ফিট, যাতে করে এটা তেরো একর জায়গা দখল করে ছিল। এর দেয়ালগুলি ঢালু হয়ে উঠে গেছে ভূমি থেকে ৪৮১ ফিট। বিশাল পিরামিডটা নির্মাণ হয়েছিল ২৩০০০০০ নিরেট পাথরের স্ল্যাব দিয়ে যার প্রত্যেকটার ওজন ছিল ২.৫ টন। প্রত্যেকটি বয়ে আনা হয়েছিল প্রায় ছয়শ মাইল দূর থেকে (জাহাজে করে নীল নদের স্রোতের সাহায্য নিয়ে প্রথম প্রপাতের পাহাড়ি এলাকা থেকে)।

সে সময়কার প্রযুক্তির বিবেচনায়, যখন কোনো স্থাপনা নির্মাণের জন্য শুধু মানুষের হাতের সাহায্যই একমাত্র সম্বল ছিল (এমনকি চাকার সাহায্যও পাওয়া যায়নি), মহান পিরামিডকে অবশ্যই সারা পৃথিবীর অনন্য স্থাপত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে, চীনের প্রাচীরকে একমাত্র ব্যতিক্রম মনে করা যেতে পারে।

পিরামিডকে নিয়ে মানুষের বিস্ময় কখনো নিবৃত্ত হবার নয়, মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ স্থাপনা; এর নির্মাণের ৪৫০০ বছর পরেও একে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। গ্রিকরা একে এবং এর আশেপাশের পিরামিডগুলিকে "বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের" একটি বলে অভিহিত করেছে। আর তাদের তালিকাভুক্ত আশ্চর্যের মধ্যে একমাত্র পিরামিডই আজ অবধি টিকে রয়েছে। হয়তো প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রিক সভ্যতার মতো বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও এগুলি টিকে থাকবে।

মহান পিরামিডটি স্বভাবতই হেরোডোটাসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, আর তিনি এ সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য সংগ্রহের জন্য মিশরীয় পুরোহিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তারা তাকে অনেক দীর্ঘ মজাদার কাহিনী শুনিয়েছিল যেগুলি মোটেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিগ্রাহ্য ছিলনা। তারা হেরোডোটাসকে বলেছিল যে এই পিরামিডটা তৈরি করতে বিশ বছর সময় লেগেছিল, আর এক লক্ষ লোক নিয়োজিত ছিল। কথাটা হয়তো সত্যি।

তারা হেরোডোটাসকে রাজার নামও বলেছিলেন যিনি এটা বানিয়েছিলেন, তবে তিনি সেটা এমনভাবে অনুবাদ করেছিলেন যাতে গ্রিকদের কাছে শ্রবণসুখকর হয়, তাই খুফু হয়ে গিয়েছিল *খিওপ্স*। তারপর ল্যাটিন ভার্সনে সেটা হয়ে গেল *চিওপ্স*, (সাধারণভাবে মিশরীয় নামের ল্যাটিন বানানে গ্রিক ভার্সনের সাথে আমরা অধিক পরিচিত (এরপর আমি কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ল্যাটিন বানান ব্যবহার করব)।

এটা বহুল প্রচলিত যে লাখ লাখ পিরামিড নির্মাতারা সবাই ছিল ক্রীতদাস, যারা তত্ত্বাবধায়কদের কষাঘাতে কাতরাতে কাতরাতে কাজ করতে বাধ্য হতো। বাইবেলের *বুক অব এক্সোডাস* থেকে অনেকেই ধারণা লাভ করে যে নির্মাতারা ছিল ক্রীতদাসে পরিণত করা ইসরাইলি, তবে প্রকৃত সত্য হলো ইসরাইলিদের মিশরে প্রবেশ করার হাজার বছর আগেই পিরামিডগুলি নির্মিত হয়েছিল, আর যাই হোক না কেন, পিরামিডগুলি স্বাধীন মানুষদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল, আর শ্রমিকেরা খুশি মনেই কাজ করেছিল, আর তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করা হয়েছিল।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে সে যুগের মিশরীয় সংস্কৃতিতে এধরনের পিরামিড নির্মাণ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এগুলি নির্মিত হয়েছিল ঐশ্বরিক রাজা এবং দেবতাদের খুশি করার জন্য, আর সেই সাথে জনগণের সুখ, শান্তির ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য। নির্মাতারা সম্ভবত একই মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, যে মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মধ্যযুগে মানুষ ক্যাথিড্রাল নির্মাণে এগিয়ে এসেছিল, আর আধুনিক মানুষ নির্মাণ করে বিশাল হাইড্রোলিক ড্যাম। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে পিরামিড নির্মাণের একটা বিশেষ মওসুম ছিল, আর তা হলো নীলের বন্যার সময়, যখন কৃষিক্ষেত্রে কোনো কাজ থাকত না। কাজেই বলা যায় একটা উদ্দেশ্য মানুষকে কাজ পাইয়ে দেয়া আর তাদের ব্যস্ত রাখা।

গত শতাব্দীতে পিরামিড সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য, তার মূলে ছিল আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ। কারণ স্থাপনাগুলি এত বিশাল আর এত নিখুঁতভাবে তৈরি (বর্গাকার অবকাঠামো সঠিকভাবে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিম নির্ণয় করে বসানো হয়েছিল)। অনেকেই মনে করে মিশরীয়দের বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক গণিতের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ ছিল। এমনটা ভাবা হয় যে অভ্যন্তরীণ গলিপথগুলি কোনো দৈববাণীকে অনুসরণ করে নির্মিত, আর সেগুলি এগিয়ে গেছে ভবিষ্যকালের পরিমাপ করে আর তার শেষ প্রান্ত পৃথিবীর সমাপ্তি জ্ঞাপন করে। অনেকেই এটাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন যে মহান পিরামিড এমন এক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের সাথে ৩০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ছেদ করেছে, মনে হয় যেন মিশরীয়রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানত যে পৃথিবী বর্তুলাকার, বৃত্তের মাঝে ৩৬০ ডিগ্রী পাওয়া যায়, আর সব চাইতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বহু সহস্রাব্দ পরে নির্ণীত হয় যে ভূমধ্যরেখা ঠিক লন্ডনের কাছ দিয়েই চলে গেছে।

অনেকেই অনুমান করেন যে মহান পিরামিডটি ছিল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির, আর একদা এক ব্যক্তি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (যার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখানো হয়েছিল) যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে অবকাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে নির্মাণ করা হয়েছিল মহাকাশযান উড্ডয়নের ঘাঁটি হিসাবে।

তবে দুঃখের বিষয়, এসব জল্পনা কল্পনা নেহাতই ভিত্তিহীন। মিশরতত্ত্ববিদরা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন মহান পিরামিড যা হওয়ার কথা আসলে তাই– একটি সুনির্মিত সমাধি। তাছাড়া এটা তার আসল উদ্দেশ্য সাধনেও ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ রাজার মৃতদেহ ও সম্পদ রক্ষা করা। খুফুর মৃতদেহটি এক বিশাল প্রস্তরস্তূপের নিচে সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও, আর সেখানে পৌছানোর পথটিও নানান গোলকধাঁধার মাধ্যমে তৈরি করা এবং গন্তব্যে নানান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, চোরেরা সব প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গেচুরে মূল কেন্দ্রে ঢুকে যায়। শেষ পর্যন্ত আধুনিক পর্যবেক্ষকরা যখন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছান, তখন সেখানে এক শূন্য শবাধার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। খুফুর পিরামিড উৎকর্ষের পরম শিখরে পৌছেছিল। তারপর থেকে স্থাপত্যশৈলীর বিচারে শুরু হয় অধোগতি।

খুফুর উত্তরাধিকারীরূপে শাসনভার লাভ করেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তারপর আর এক কনিষ্ঠ পুত্র। এই কনিষ্ঠজন ছিলেন খাফ্রে, হেরোডোটাস যাকে অভিহিত করেছিলেন কেফ্রেন (Chephren)। ২৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যিনি বানিয়েছিলেন তার পিতার চাইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির একটা পিরামিড। তিনি তার পিতা খুফুকে টেক্কা দিতে চেয়েছিলেন তার পিরামিডকে পিতার পিরামিডের চাইতে আরও উঁচু করে বানিয়ে। এর অধিকাংশ চুনাপাথরের আস্তরণ রয়ে গেছে শীর্ষদেশের কাছকাছি।

খাফ্রের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন মেনকুরে, গ্রিকদের কাছে যিনি মাইসেরিনাস (Mycerinus)। তিনি তৃতীয় আর একটি পিরামিড বানিয়েছিলেন যেটি ছিল তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ছোট, যার নির্মাণকাল ২৫১০ এর কাছাকাছি।

এই তিনটি পিরামিড একসাথে গিজায় অবস্থিত, ৪৫০০ বছর আগের প্রাচীন সাম্রাজ্যের মহত্ত্বের নিদর্শন। অবশ্য আদিতে এগুলি যে আকারে ছিল এখন আমরা এগুলিকে আর সে আকারে দেখতে পাই না। কথাটা যে শুধু চুনাপাথরের আস্তরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাই না, প্রত্যেকটাকে ঘিরেই রয়েছে পরবর্তী রাজাদের অসংখ্য ছোট ছোট পিরামিড, যেগুলি নির্মিত হয়েছিল পরবর্তী রাজা এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের সমাধি হিসাবে। খাফ্রের পিরামিডের প্রবেশপথে রয়েছে কমপক্ষে ২৩ জন রাজার মূর্তি। কাজেই এগুলিকে শুধু পিরামিড না বলে বলা চলে পিরামিড কমপ্লেক্স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জিনিস, যা পিরামিডে ছিল না, চতুর্থ রাজবংশের সময়ে নির্মিত সেই জিনিসটি পিরামিডের খ্যাতিকেও ম্লান করে দিয়েছিল, আর সেটা ছিল খাফ্রের পিরামিডের প্রবেশপথে বিশাল এক শায়িত সিংহের মূর্তি, পিরামিড থেকে মাত্র ১২০০ ফিট দূরে। একটা প্রাকৃতিক প্রস্তর স্তূপ শিল্পীর বাটালের আঁচড়ে রূপ নেয় এক বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শনরূপে। সিংহের মাথাটি রাজকীয় সজ্জায় ভূষিত। মূর্তিটি রাজা খাফ্রের প্রতিবিম্ব আর সমগ্র মূর্তিটি রাজার ক্ষমতা ও গৌরবের রূপায়ণ।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে গ্রিকরা মিশরীয় ভাস্কর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিংহের মূর্তির মধ্যে সিংহের শরীরে মানব (বরং মানবীর) মস্তকে একটা দানবের কল্পকাহিনী আবিষ্কার করেছিল। গ্রিকরা এই মূর্তির মধ্যে মানবের অমঙ্গলের ধারণা পেয়েছিল, তাই তারা মূর্তিটার নাম দিয়েছিল স্ফিংক্স, যার অর্থ শ্বাসরোধকারী। গ্রিক প্রবাদে বলা হয়েছে, সিংহমানবী স্ফিংক্স পথিকদের একটা ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করত আর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাকে গলা টিপে হত্যা করত। তাই যে কোনো মানুষ যদি রহস্যজনক আচরণ করে তাহলে বলা হয় সে স্ফিংক্সের মতো ব্যবহার করছে।

মিশরে হাজার হাজার স্ফিংক্স আছে তবে সর্ববৃহৎ স্ফিংক্সটি নির্মাণ করেছিলেন খাফ্রে। আর এর গম্ভীর মুখাবয়ব মরুভূমির মধ্যে এক মহা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। তবে নেপোলিয়নের সৈন্যরা এই মহান সিংহমানব মূর্তিটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তাদের কামানের ধার পরীক্ষা করার জন্য। এমনকি পরবর্তী রাজবংশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিডগুলির দেয়ালের লিপি, যার উদ্দেশ্য ছিল সমাহিত ব্যক্তির পারলৌকিক জীবনযাপন সহজতর করা। পিরামিডের এসব লিপিতে মিশরীয়দের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এসব লিপি এবং "দ্য বুক অব ডেড" সর্বপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের দলিল।

অ ব ক্ষ য়

মেনকুরের মৃত্যুর মাত্র কয়েকবছর পর এবং কয়েক শতাব্দী সাফল্যমণ্ডিত রাজত্বের পর প্রায় ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ চতুর্থ রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। এটা কি মেনকুরের বংশধরের অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু, নাকি কোনো সফল বিদ্রোহের কারণে, সেটা নির্ণয় করা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এ ক্ষেত্রে কল্পকাহিনীও নীরব।

তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, বিভক্তি এসেছিল। চতুর্থ রাজবংশের আগমনের পূর্বে একটানা পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মিশর একক রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল, তবে তার মাঝে যে রীতি প্রথার বিভেদ ছিল না তা নয়। এই বিভক্তি ছিল ধর্মভিত্তিক, এবং প্রত্যেক নগরের আলাদা আলাদা দেবতা ছিল, আর সে বিভক্তি কালান্তরে বেড়েই চলেছিল। রাজবংশের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মাচরণ পদ্ধতিতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন সূচিত হতো। আর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিতরাও রাজবংশ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখত।

এভাবেই চতুর্থ রাজবংশ *হোরাসকে* তাদের প্রধান দেবতারূপে গণ্য করত, আর তাকে মান্য করত তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতীকরূপে। যেহেতু মেম্ফিসের পৃষ্ঠপোষক দেবতা বিশ্বস্রষ্টা *প্টা*, যিনি ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, তাই তাকেও মান্য করা হতো। তবে মেম্ফিসের ত্রিশ মাইল উত্তরে *ওন্নুতে* প্রধান দেবতা ছিল সূর্যদেবতা *রী*, নগরটি হাজার হাজার বছর ধরে *রী* এর অনুগত ছিল। গ্রিকদের কাছে নগরটি পরিচিত ছিল হেলিওপলিস (Heliopolis), অর্থাৎ দ্য সিটি অব সান বা সূর্য নগরী নামে।

রী এর পুরোহিতরা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাধর, এমনকি চতুর্থ রাজবংশের রাজারাও তাদের সিংহাসনের সাথে সূর্যদেবতার নাম যুক্ত করতে পেরে গৌরবান্বিত মনে করত, যাতে করে *খাফ্রে* আর *মেনকুরেকে* একসাথে পাই।

চতুর্থ রাজবংশ দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে– সেটা যে কারণেই হোক না কেন– *মেনকুরের* মৃত্যুর পর *রী* এর পুরোহিতরা তাদের নিজেদের একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে পঞ্চম রাজবংশের সূচনা ঘটায়। এই বংশটি টিকেছিল প্রায় দেড় শতাব্দী যাবৎ, আর তারপর আনুমানিক ২৩৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয় ষষ্ঠ রাজবংশের।

পিরামিড নির্মাণের অবনতি ঘটতে থাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের আমলে। কোনো বিশাল দানবীয় মূর্তি নির্মাণ হয় নাই, তার জায়গায় তৈরি হয়েছিল ছোট ছোট মূর্তি। হয়তো মিশরীয়রা বিশালত্বে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছিল, যার মধ্যে কোনো নূতনত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। এতে শুধু জাতীয় শ্রমেরই অপচয় ঘটছিল, ইতিমধ্যেই মিশরে যার অভাব দেখা দিয়েছিল।

মিশরে শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হচ্ছিল, আর সামরিক শক্তির দিক দিয়েও মিশর এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশর সামরিক শক্তিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল প্রথম *পেপির* শাসনামলে, যিনি ছিলেন ষষ্ঠ রাজবংশের তৃতীয় রাজা, আর যিনি ছিলেন মেমফিসের বাসিন্দা। পেপির আমলেই অন্য যে কোনো রাজার চাইতে সর্বাধিক স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল, আর সাক্কারাতে তার একটা ছোট পিরামিড ছিল।

তার ছিল এক জেনারেল যার নাম *উনি*, যার সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তারই ছেড়ে যাওয়া একটা শিলালিপি থেকে (আমাদের বিশ্বাস এই শিলালিপিটাতে তেমন অতিরঞ্জন ছিল না)। একজন অখ্যাত দরবারী থেকে তিনি নিজেকে একজন জেনারেলের পদমর্যাদায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন। তিনি পাঁচবার সীমান্ত আক্রমণকারী যাযাবরদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যার ফলে খনিজসমৃদ্ধ সিনাই উপদ্বীপে মিশরের অধিকার পাকাপোক্ত হতে পেরেছিল। এমনকি তার বাহিনী সিনাইয়ের উত্তরপূর্বে এশীয় ভূখণ্ডেও প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম জলপ্রপাতের দক্ষিণেও তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে হয়তো এসব দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান আর সেই সাথে পিরামিড আর মন্দির নির্মাণ তৎকালীন মিশরীয় সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছিল আর মিশরীয় সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে রাজ্যের সীমা যতই প্রসারিত হতে থাকে, কাজকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে, তত বেশি পরিমাণে রাজন্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে হয়, আর তখন স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারী, জেনারেল আর প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর আনুপাতিক হারে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

এই সময়ে অভিজাত শ্রেণীর পৃথক মমিকরণ আর পারলৌকিক জীবন নিশ্চিতকরণের দাবি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিক থেকে দেখলে এটাকে হয়তো প্রগতিশীল মনে হতে পারে, কারণ এতে রাজার সাথে সমষ্টিগত পারলৌকিক জীবনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মুক্তির দাবি উচ্চারিত হয়েছিল, যাতে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এভাবে ধর্মের গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এর মধ্যে একটা নৈতিকতার প্রক্ষেপ দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

অপরপক্ষে রাজন্যরা শক্তিধর হলে, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করে, আর তার ফলে দেশের সর্বসাধারণের সমস্যাগুলি চাপা পড়ে যায়, যার পরিণাম ভোগ করে সর্বসাধারণ।

প্রথম পেপির একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র পেপি দ্বিতীয় নাম ধারণ করে ২২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তবে সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি ছিলেন নিতান্তই নাবালক। একদিক দিয়ে বিচার করলে তার শাসনকাল ছিল ইতিহাসে অনন্য। এর স্থায়ীত্বকাল ছিল নব্বই বছর! এটাই ছিল ইতিহাসে রেকর্ডভুক্ত একক ব্যক্তির দীর্ঘতম শাসনকাল। এই দীর্ঘ শাসনকাল মিশরের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে এনেছিল।

প্রথমত, প্রায় প্রথম এক দশক, যেহেতু এত কমবয়সী একজন রাজা দেশ শাসনে অসমর্থ, তাই প্রয়োজন ছিল একজন শক্তিধর রাজন্যের বা একজন সক্ষম দরবারীর। এরূপ একজন ব্যক্তি রাজার সমান পরিপূর্ণ আস্থা ও সম্মান অর্জন করতে পারেনা। এমতাবস্থায় অবিরাম প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকে ক্ষমতা দখলের জন্য। একজন নাবালকের দীর্ঘদিন সিংহাসনে আসীন থাকার ফলে রাজার হাত থেকে ক্ষমতা রাজন্যদের হাতে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পেপির আমলে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। অভিজাত শ্রেণীর সমাধিগুলি রাজাদের সমাধির চাইতে আরও বেশি সৌকর্যময় হয়ে উঠছিল, আর যদিও মিশরীয় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটছিল, এটা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে।

যখন দ্বিতীয় পেপি সত্যিকারের রাজদণ্ড হাতে তুলে নিলেন, ততদিনে রাজন্যবর্গ এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, যে তাদের সামলানো কঠিন, আর রাজাকেই সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়, কারণ ততদিনে তিনি নিজেই জরাগ্রস্ত, দুর্বল, আর সেই দুর্বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুষ্ঠিতে রাজ্যের রশি সামলে রাখা সম্ভব ছিলনা। সিংহাসনে যে ব্যক্তিটি বসে আছেন তিনি রাজার ছায়ামাত্র, মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

২১৮২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পেপির মৃত্যু হয়, আর তার মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যেই মিশর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। কোনো রাজাই কলহরত অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বেশিদিন টিকতে পারেনি। ষষ্ঠ রাজবংশ এবং সেইসাথে প্রাচীন সাম্রাজ্যও ধসে পড়ল, মিশরের একত্রীকরণের সব সম্ভাবনাই লোপ পেল আর মিশর পরিণত হলো এক খণ্ড বিখণ্ড অরাজক ভূখণ্ডে।

ষষ্ঠ রাজবংশের শেষ সময়ের একটা প্যাপিরাস লিখন সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর লেখক *ইপুয়ার* রাজ্যে অরাজকতা আর ঘৃণা বিদ্বেষের ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্য প্রচুর বিলাপ করেন। তার বিলাপের মধ্যে হয়তো কাব্যিক অতিশয়োক্তি ছিল তবে একটা ক্ষয়িষ্ণু রাজ্যে প্রজাদের দুঃখকষ্টের একটা জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়।

ইপুয়ারের লেখায় মানব দুর্ভোগের কাহিনী* এতই জীবন্ত ছিল যে, ১৯৫০ সালে লেখা ইসরাইলী লেখক *ইমানুয়েল ভেলিকভস্কি* তার লেখা *"ওয়ার্লডস ইন কলিশন"* বইতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে বাইবেলের *এক্সোডাস* পর্বে যে ভয়াবহ প্লেগের উল্লেখ আছে তা অবিকল *ইপুয়ারের* লেখার সাথে মিলে যায়।

তবে ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট অতিকথন রয়ে গেছে। ভেলিকভস্কির নৈসর্গিক দুর্যোগ বৈজ্ঞানিকভাবে অসিদ্ধ (আর ইপুয়ারের কাব্যিক অতিকথন মোটেই আক্ষরিক সত্য বলে মেনে নেয়া যায়না) যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে সেটা বাইবেলে উল্লিখিত সময়ের চাইতে অন্তত হাজার বছর পূর্বের।

---

* একটা অংশে তিনি বলেছেন... 'চিরতরে মুছে গেছে মানুষের মুখের হাসি যা আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা। বিষাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে মূর্তিমান হয়ে, আর তার সাথে মিশে আছে বিলাপ... এখন যে ভূখণ্ড পেছনে পড়ে আছে তা ক্লান্ত, অবসন্ন... চারদিকে ফসলের ধ্বংসস্তূপ... গোলাঘর এখন শূন্য আর তার মালিক এখন ধরাশায়ী... '

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. মধ্য সাম্রাজ্য

থিবিস

এক শতাব্দীর অস্পষ্টতা, "অন্ধকার যুগ" আর গৃহযুদ্ধ, অস্থিরতা আর সিংহাসনের ভুয়া দাবিদারদের মাঝে বিবাদ। এই যুগে মহান পিরামিড নির্মাতা মহান সম্রাটদের সকল কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়কার বিশেষ কোনো খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়নি। সে সময়কার ছোটখাটো শাসকদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়, মহান সমাধি বা বিস্তারিত শিলালিপি কোনোটাই তাদের করা সম্ভব হয়নি।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে মানেথো চারটি রাজবংশের উল্লেখ করেন তবে পৃথকভাবে কোনো রাজার নাম উল্লেখ করতে পারেননি, আর তারা তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেও পারেননি। কাজেই এ যুগটা ধোঁয়াশে রয়ে যায়। সম্ভবত তারা ছিল স্থানীয় গোষ্ঠীপতি, যারা নিজেদের রাজা বলে দাবি করত, তবে নিজেদের শাসনকেন্দ্রের বাইরে তাদের সামান্যই ক্ষমতা ছিল।

সপ্তম ও অষ্টম রাজবংশ *মেম্ফিস* থেকে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করত আর তারা সেই শহরকেই প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা দাবি করত। নবম ও দশম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজবংশের কেন্দ্র ছিল *হেরাকিস্নওপলিস*। এটা *মোয়েরিস* হ্রদের তীরে অবস্থিত একটা প্রাচীন শহরের বর্তমান গ্রিক নাম।

সন্দেহ নাই সে সময় মিশর যদি অন্য কোনো দেশ হতো (এমনকি যদি সেটা পরবর্তী কোনো শতাব্দীতেও হতো) এই বিভেদ বিভাজন অনিবার্যভাবেই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনের সৃষ্টি করত। দেশটি আক্রান্ত হতো, অধিকৃত হতো, কে জানে কত দিনের জন্য। এটাকে মিশরের সৌভাগ্য বলা যায় যে সে সময় পার্শ্ববর্তী কোনো দেশই এর সুযোগ নেওয়ার অবস্থায় ছিল না। অবশেষে মুক্তি মিলল সুদূর দক্ষিণের এক শহর– মেম্ফিস থেকে ৩৩০ মাইল দক্ষিণে আর প্রথম জলপ্রপাত থেকে মাত্র ১২৫ মাইল উত্তরে। এই শহরের প্রধান দেবতার নাম ছিল আমন অথবা আমেন, উর্বরতার দেবতা, পূর্ববর্তী রাজত্বের আমলে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলনা, তবে সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সময়ে যখন নগরটির গুরুত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেই সাথে এই দেবতার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই শহরটি পরিচিতি পেয়েছিল *নুয়ে* নামে (অর্থাৎ আমেনের শহর) বাইবেলে *নোহ্* নামে যার উল্লেখ আছে।

অনেক শতাব্দী পরে যখন গ্রিকদের আগমন ঘটল, ততদিনে নগরটির পরিসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর সেখানে অনেক বিশালাকৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছে। কাজেই গ্রিকরা এর নাম দেয় "ডায়োসপলিস ম্যাগনা" বা দেবতার বিশাল শহর। এরই একটা উপশহরের নাম তারা রেখেছিল থিবিস, তাদের নিজেদের শহরের নামানুসারে। ইতিহাসে এই থিবিস নামটাই বেশি পরিচিত, যদিও নামটা বেশ গোলমেলে, কারণ গ্রিক নামের এই শহরের সাথে একে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের আমলে থিবিসের অনেক উন্নতি ঘটেছিল সন্দেহ নাই, কারণ এই সময়ে প্রথম প্রপাতের পাশ দিয়ে একটা বাণিজ্যপথ নির্মিত হয়েছিল। লোয়ার ঈজিপ্টে মেম্ফিস, হেলিওপলিস, হেরাক্লিওপলিসের রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এই শহরটি তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। এই অন্ধকার শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২১৩২ পর্যন্ত থিবিসে পরপর বেশ কিছু সক্ষম গভর্নর ক্ষমতায় এসেছিল যারা ক্রমান্বয়ে আপার ঈজিপ্টে তাদের অধিকার সম্প্রসারণ করতে সমর্থ হয়েছিল। *মানেথো* তাদের একাদশ রাজবংশরূপে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। তারা আট বছর ধরে হেরাক্লিওপলীয়দের সাথে যুদ্ধ চালিয়েছিল। অবশেষে ২০৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় *মেন্টুহোটেপ* এই বিজয় অভিযান পূর্ণ করেছিলেন।

পেপির রাজত্বের ১৩০ বছর পর আবারও একবার মিশর একক সম্রাটের অধিকারে এসেছিল। বলা যায় মধ্য রাজবংশের সূচনা হলো। ধর্মের উপরও এই যুগের প্রতিফলন ঘটেছিল, থিবীয় দেবতা আমেন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, (কারণ তার অধিষ্ঠান ছিল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজবংশের নিজ শহরে) যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা রী'র পুরোহিতরা নূতন দেবতাকে পূর্বতন দেবতার প্রতিরূপ বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল, আর *আমেনকেই* সর্বোচ্চ দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল।

এই সময়ে থিবিস প্রসারিত ও শক্তিধর হয়ে উঠছিল, সমাধি ও স্মৃতিসৌধ তাকে আরও ঋদ্ধ করে তুলছিল। এমনকি রাজবংশের পতনের পরও এটা টিকে ছিল। মধ্য সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে, একাদশ রাজবংশ এক কঠিন সময়ের মধ্যে পড়ে গেল। মেন্টুহোটেপ বংশের শেষ রাজার (চতুর্থ বা পঞ্চম বংশধর) জুটেছিল একজন অতি সক্ষম উজির যার নাম ছিল আমেনেমহাট, যিনি নিজেও ছিলেন থিবিস বংশের, কারণ দেবতা আমেনের সাথে তার নামের আংশিক মিল ছিল।

বিস্তারিত বিবরণ আমাদের অজানা, তবে আমেনেমহাট ১৯৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অবশ্যই বিদ্রোহ করে নিজেকে প্রথম আমেনেমহাট নামে দ্বাদশ রাজবংশের প্রথম সম্রাটরূপে সিংহাসন দখল করে বসেন। তিনি থিবিস থেকে অপসারণ করে মেম্ফিসের ২৫ মাইল দক্ষিণে লিশ্‌ট্‌ নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ বহু দূরবর্তী থিবিস থেকে বিক্ষুব্ধ সাম্রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা কঠিন ছিল। তবে থিবিসও তার অগ্রগতির বেগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ পরবর্তী শতাব্দীতে এটা আবার রাজধানী হয়েছিল আর পরবর্তী পনেরোশো বছর ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা লাভ করেছিল।

AMARBOI.COM

নু বি য়া

পুনরেকত্রিত মিশর আবারও একবার কর্মচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। আবার চালু হলো পিরামিড নির্মাণ, এবং প্রথম আমেনেমহাট এবং তার পুত্রকেও লিশ্‌ট্‌ শহরের কাছে নির্মিত পিরামিডে সমাহিত করা হয়। প্রথম আমেনেমহাট সিনাইতে তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন, দক্ষিণের সাথে তার বাণিজ্য বজায় রাখেন এবং অমাত্যদের পদানত রাখতে সমর্থ হন। এটা অন্ধকার শতাব্দীর সব কলুষ দূরীভূত হওয়ার মতো, কোনো কিছুই চিরতরে দূর করা যায়না। মধ্য রাজবংশের কোনো রাজাই প্রাচীন রাজবংশের রাজাদের মতো একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করতে পারেনি। মধ্য সাম্রাজ্যের পারিষদদের কখনোই সম্পূর্ণরূপে পোষ মানানো যায়নি।

তবু বলা যায় চতুর্থ রাজবংশের মতো দ্বাদশ রাজবংশকেও সুবর্ণযুগ বলা যায়, আর পিরামিডগুলি বিশালাকৃতি না হলেও অনেক শৈল্পিক কারুকার্যময় ছিল। মধ্য রাজবংশের কিছু কিছু অলংকার, যেগুলি লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল আর আধুনিকরা আবিষ্কার করতে পেরেছিল তার বিস্ময়কর সূক্ষ্ম কারুকাজ। ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম, কাঠের উপর খোদিত ত্রিমাত্রিক চিত্রকর্ম রাজার জীবনপদ্ধতি প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কবরে রাখা হতো। ১৯২০ সালে থিবিসের এক সমাধিগৃহে এমনি এক গুপ্ত ভাণ্ডারের পুরোটাই অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। সমাধিগৃহের বিশাল জাঁকজমকের চাইতে এসব সুক্ষ্ম কারুকাজ অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

মধ্য রাজবংশের সাহিত্যকর্মও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মিশরের দ্বাদশ রাজবংশকে মিশরীয় সাহিত্যের ধ্রুপদী যুগরূপে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত যা টিকে আছে তা সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কে জানে যা টিকে আছে তা যা টিকে নাই তার কত ক্ষুদ্রাংশ!

প্রথমবারের মতো জাগতিক সাহিত্য (যা পুরাণ বা ধর্মীয় সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন) রচিত হয়েছিল। বলা যায় প্রথমবারের মতো পাঠযোগ্য সাহিত্য উপকরণ আমাদের হস্তগত হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উদ্দীপনাময় কল্পনাশ্রয়ী দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী, যেমন জাহাজডুবি এক নাবিকের কথা যে দৈত্যাকার এক সরীসৃপের দেখা পেয়েছিল। আর এক গল্পে আছে "দুই ভাইয়ের" কাহিনী যা অনেকটা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতো, যা প্রায় অবিকৃতভাবে আমাদের হাতে এসেছে, যোসেফের বাইবেলের অনেক কাহিনী হয়তো এসব গল্পের থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। তাছাড়া রয়েছে "সিনুহের কাহিনী" যাতে রয়েছে এক মিশরীয়র কথা যে সিরিয়ায় যাযাবরদের সাথে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিল। এতে সিরিয় যাযাবরদের অদ্ভুত জীবনপ্রণালীর কাহিনী রয়েছে যার সাথে মিশরীয়দের কোনো মিল নাই।

বিজ্ঞানের উন্নতিও লক্ষণীয়, অন্তত "ঢ়াইন্ড পেপার" নামে এক দলিলের পাঠোদ্ধার করে তাতে দেখা গিয়েছিল, যা লেখা হয়েছিল দ্বাদশ রাজবংশের আমলে যাতে বর্ণনা রয়েছে কিভাবে ভগ্নাংশ ও ত্রিমাত্রিক বস্তুর পরিমাপ করা যায়। মিশরীয় গণিত অত্যন্ত বাস্তবোচিত যাতে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিয়ম দেওয়া আছে (ঠিক যেমন রান্নার রেসিপি)। তেরো শতাব্দী পরে গ্রিকরা এরই সাধারণীকরণ করেছিল। অবশ্য দুঃখের কথা আমাদের জ্ঞান "ঢ়াইন্ড পেপিরাসের" মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা বলতে পারিনা আরও কত গুরুত্বপূর্ণ দলিল নষ্ট হয়ে গেছে।

তাছাড়াও রয়েছে জ্ঞানঋদ্ধ বাণী আর তত্ত্বকথা, যার উদ্দেশ্য ছিল জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। যে উদাহরণটার সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত তা হলো বাইবেলের প্রবচন অধ্যায়। এর মিশরীয় সমতুল্য আছে যা প্রায় হাজার বছরের পুরনো। এর একটাকে যুক্ত করা হয়েছে প্রথম আমেনেমহাটের সাথে। মনে করা হয় এটা তার পুত্রকে দেওয়া উপদেশাবলী, উদ্দেশ্য কি করে ভালো রাজা হওয়া যায় এই শিক্ষা দেওয়া। এতে কিছু তিক্ত বক্তব্য আছে যাতে বোঝা যায় কিছু দরবারী লোকজন তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল।

এমন হতে পারে আমেনেমহাটকে হত্যা করা হয়েছিল, তবে সেটা যদি হয়েও থাকে, তাতে রাজবংশে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। কারণ তার উত্তরসূরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে সিংহাসনে বসেছিল প্রথম *সেনুসরেট*, যার জন্য পিতা রেখে গিয়েছিলেন জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রবাদ প্রবচন। যিনি রাজত্ব করেছিলেন ১৯৭১ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত, গ্রিকদের কাছে যিনি পরিচিত ছিলেন *সেসোস্ট্রেস* নামে।

প্রথম সেসোস্ট্রেস মধ্য রাজবংশের শক্তিকে সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেন আর তিনিই প্রথম মিশরীয় সম্রাট যিনি দেশজয়ে মনোনিবেশ করেন। সম্প্রসারণের একটা যুক্তিগ্রাহ্য এলাকা ছিল দক্ষিণে নীলনদ সমৃদ্ধ এলাকা, প্রথম প্রপাত থেকে উজানের দিকে। এই এলাকায় সাত শতাব্দী আগে স্নেফেরুর আমল থেকে মিশরীয় সম্রাটরা বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল, তবে মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটত উগ্র যোদ্ধা সম্প্রদায়ের আক্রমণের ফলে। এই বাণিজ্য পথ সুরক্ষার জন্য স্নেফেরুকে প্রায়ই অভিযান পরিচালনা করতে হতো যেমনটা করতে হতো ষষ্ঠ রাজবংশের প্রথম পেপিকে।

স্নেফেরুর ধারণা ছিল একটা সামগ্রিক বিজয় নিশ্চিত করা গেলে এবং সমগ্র মিশরকে একক আধিপত্যে আনা গেলে ব্যবসা বাণিজ্য সহজতর হবে এবং মিশরের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। সেসোস্ট্রেসের পদক্ষেপের ফলে মিশরের দক্ষিণের দেশগুলিতেও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লেগেছিল। মিশরীয় এবং বাইবেলীয় লেখকদের লেখায় দক্ষিণের এই অঞ্চলটি পরিচিত ছিল *কুশ* নামে। গ্রিকদের কাছে অঞ্চলটি পরিচিত ছিল *ইথিওপিয়া* নামে, যার অর্থ "পোড়া মুখ" যা হয়তো নিগ্রোদের কালো মুখের দিকে ইঙ্গিত করে (অথবা হয়তো এটা ঈজিপ্ট নামের বিকৃত রূপও হতে পারে)।

তবে মিশরের আধুনিক ইতিহাসবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত ইথিওপিয়া নামটি বেশ বিভ্রান্তিকর, কারণ বর্তমান সময়ে যে অঞ্চলটাকে ইথিওপিয়া নামে অভিহিত করা হয় প্রাচীন গ্রিকদের পরিচিত ইথিওপিয়া অঞ্চলের অনেকটা দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত (সুদান একটি আরবী শব্দ যার অর্থ কালো, কাজেই ইথিওপিয়া ও সুদান শব্দ দুটির মর্মার্থ একই)। অবশ্য আধুনিক সুদান আমাদের আলোচিত অঞ্চলের চাইতে অনেক বিস্তৃততর এলাকা নিয়ে গঠিত।

তবে এই এলাকার সর্বোৎকৃষ্ট নাম, যেটি আমিও ব্যবহার করতে চাই তা হলো *নুবিয়া*। এর দ্বারা আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকে সরাসরি উল্লেখ করা যায়। এর ফলে আর কারও পক্ষেই বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। এটি একটি আঞ্চলিক উপজাতীয় শব্দ, যার অর্থ "দাস," হয়তো বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সেসোস্ট্রেসকে যদি বিজয়ীর জীবন শুরু করতে হয় তাহলে অবশ্যই তার একটা সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে, তবে তার এমন কোনো বড়সড় সৈন্যবাহিনী ছিলনা। মিশরকে সৌভাগ্যবান মনে করা যায় যে তার সুরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীর তেমন প্রয়োজন ছিলনা, একটা রাজকীয় দেহরক্ষীবাহিনী দিয়েই চলত, যেটা স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর চাইতে বড় ছিলনা। সিনাই অধিকৃত অসংগঠিত আদিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এমনকি মধ্য রাজবংশের আমলেও, যখন শতাব্দীব্যাপী অন্তর্কলহ এবং অরাজকতা ঠেকানোর জন্য সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, সেটাও পূর্বের এশীয় শক্তির তুলনায় নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ছিল। নুবিয়া তখন ছিল আদিম জাতি অধ্যুষিত এলাকা যারা মিশরের দুর্বল সামরিক শক্তিরও মোকাবিলা করতে পারত না।

কাজেই প্রথম সেসোস্ট্রেস তার সেনাদল নিয়ে প্রথম প্রপাত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নীলনদী বরাবর সারি সারি দুর্গ বানিয়েছিলেন আর প্রথম প্রপাত থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণে দ্বিতীয় প্রপাত পর্যন্ত সমস্ত বাহিনীকে তার অধিভুক্ত করতে পেরেছিলেন। ঐ বংশের অন্য রাজারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হতে পেরেছিল, আর তৃতীয় প্রপাতে সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা ছিল আরও দু'শ মাইল উজানে।

নিঃসন্দেহে মিশরীয়রা অহংকার করতে পারে যে তারা অসংগঠিত প্রতিবেশীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল (জাতীয় পর্যায়ে যে কেউ দুর্বল প্রতিবেশীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবি করতেই পারে)। পনেরো শতাব্দী পরে যখন হেরোডোটাস মিশর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন মিশরীয়দের দেখেছিলেন নিজেদের দুর্বলতায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে, আর পুরোহিতরা তাদের পৌরাণিক অতীতে আশ্রয় খুঁজছিল। তারা অতীত রাজাদের বিজয়কাহিনী নিয়ে অতিশয়োক্তি করত আর ভান করত তারা তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর সবটাই জয় করতে পেরেছিল। আর তারা সেই বিজয়ী পৌরাণিক রাজার কী নাম দিয়েছিল, কেন? সেসোস্ট্রেস!

গো ল ক ধাঁ ধা

প্রথম সেসোস্ট্রেসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আমেনেমহাটের রাজত্বকালে *পুন্ট* নামে এক রাজ্যের সাথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। পুন্ট সম্বন্ধে আমরা শুধু এটুকুই জানি যে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে সেখানে পৌঁছা যেত, হয়তো সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ছিল। এটা বর্তমানে আরব উপদ্বীপের ইয়েমেন অথবা বিপরীত দিকে আফ্রিকার উত্তর উপকূলের সোমালীল্যান্ড। সে যাই হোক, সেখানকার প্রাপ্ত সোনা সংগ্রহ করে সিরীয় উপকূলের ক্যানানাইট শহরসমূহে বাণিজ্য চালানো হতো। কিছুটা বণিকদের মাধ্যমে আর কিছুটা সামরিক শক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মিশরীয় শক্তি সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

শান্তির কলাকৌশলকেও অবহেলা করা হয় নাই, দ্বাদশ রাজবংশের আমলে *লেক মোয়েরিস* উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২৫ শতাব্দী আগে থেকেই এটা সংকুচিত হতে থাকে, যে সময়ে উপকূলভাগে নব্য প্রস্তর যুগের গ্রাম-বসতি গড়ে ওঠা শুরু করে, আর এর সাথে নীলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোয়েরিস থেকে খাল কেটে নীলের প্রবাহ ঠিক রাখাও মধ্য রাজবংশের ফারাওদের একটা চিন্তার বিষয় ছিল। বন্যার সময় যেমন খাল আটকে দিয়ে তেমনি শুষ্ক মৌসুমে খালের মুখ খুলে দিয়ে প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা যেত।

মিশরীয় শ্রমিকদের কথা বিবেচনায় নিলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী পরে হেরোডোটাস লেকটি দেখে ভেবেছিলেন এটা কৃত্রিমভাবে নির্মিত।

তৃতীয় আমেনেমহাটের রাজত্বকালেই দ্বাদশ রাজবংশ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের শীর্ষে আরোহণ করেছিল, যিনি ১৮৪৯ থেকে ১৭৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজত্বকালে মিশর সাম্রাজ্য তৃতীয় প্রপাত থেকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যার দূরত্ব প্রায় নয়শত মাইল আর জনসংখ্যা পনেরো লক্ষ অতিক্রম করে গিয়েছিল। তবে মধ্য সাম্রাজ্যের কারও ক্ষমতাই পিরামিড নির্মাতা প্রাচীন সম্রাটদের ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

সম্ভবত তৃতীয় আমেনেমহাট বা নিকটতম কোনো পূর্বজের আমলেই পৌরাণিক গোষ্ঠীপতি আব্রাহাম প্যালেস্টাইনে বাস করতেন। যদি বাইবেলের কাহিনীকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে মনে হবে যে আব্রাহাম কেনান থেকে মিশর পর্যন্ত গোটা এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন, আর এতে করে এটাই নির্দেশ করে যে উভয় অঞ্চল একই রাজত্বভুক্ত ছিল।

তৃতীয় আমেনেমহাট ২৪৯ ফিট উচ্চতার দুটি পিরামিড নির্মাণ করে স্থাপত্যশৈলীকে বিশিষ্টতা প্রদান করতে পেরেছিলেন। সেই সাথে নির্মাণ করিয়েছিলেন নিজের এক বিশালাকৃতি মূর্তি আর মোয়েরিস হ্রদের তীর বরাবর একক প্রাচীরবেষ্টিত একপ্রস্থ জটিল ইমারত যা ছিল তার প্রাসাদ। এর অংশবিশেষ সমাধির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শুধু ভারত্ব আর ক্ষমতা দিয়ে পিরামিডের মমিগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিলনা, কাজেই আমেনেমহাট কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন– ভারত্ব দিয়ে নয়, চতুরতা দিয়ে কবর লুটেরাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন।

হেরোডোটাস প্রাসাদ জটিলতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, যা পিরামিডের বিস্ময়কেও হার মানায়। তিনি এর সাড়ে তিন হাজার কক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন, যার অর্ধেকটা মাটির উপর আর অর্ধেকটা মাটির নিচে (তাকে অবশ্য মাটির নিচের কক্ষগুলিতে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নাই, কারন এগুলি ছিল সমাধিকক্ষ)। তিনি এর জটিল আঁকাবাঁকা প্রবেশ পথেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

মিশরীয়রা এই স্থাপনাটির নাম দিয়েছে, হ্রদে "প্রবেশ পথের মন্দির"। গ্রিকরা তাদের ভাষায় এর নাম দিয়েছিল "ল্যাবিরিন্থোস," যার ইংরেজি রূপান্তর "ল্যাবিরিন্থ" (গোলকধাঁধা)। আজকাল এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় যে কোনো আঁকাবাঁকা পথ বোঝাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরীয় গোলকধাঁধার আকৃতি, এর সুচতুর নির্মাণ-কুশলতা, শ্বেতপাথর, ঋদ্ধ অলংকরণ অবাক করার মতো, তবে দুঃখের কথা আমাদের যুগের প্রশংসা অর্জনের জন্য তা বর্তমান কাল অবধি টিকে থাকেনি। তৎসত্ত্বেও বলা যায় মধ্য সাম্রাজ্যের স্থপতিদের এত সব উদ্ভাবনী কুশলতা খুব একটা কাজে লাগেনি। এর ভেতরের কবরগুলি মহা ধুরন্ধর কবর লুটেরাদের কাছে হার মেনেছিল।

নিশ্চিত করে বলা যায়, মধ্য রাজবংশের মিশরীয় গোলকধাঁধার কথা খুব কম লোকই জানতে পেরেছিল, অনেকেই শুধু গ্রিক পুরাণের মাধ্যমেই এসব কথা জেনেছিল। এই গোলকধাঁধার প্রয়োগ দেখা যায় ক্রীট দ্বীপের রাজধানী "নসোসে" (নীল উপত্যকা থেকে যার অবস্থান প্রায় চারশ মাইল উত্তরে)। এতে কল্পকথা রয়েছে, এখানে বাস করত এক "মিনোতাউর," (ষাঁড়ের মাথাওয়ালা দৈত্য) যাকে বধ করেছিল এথেনীয় বীর "থিসিউস"।

ক্রীট সম্বন্ধে গ্রীক লোকগাঁথা আবিষ্কার হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যার সত্যিকারের ভিত্তি ছিল। এই দ্বীপেও ছিল এক প্রাচীন সভ্যতা, যা মিশরের চাইতে কম প্রাচীন ছিলনা, আর প্রাচীন রাজবংশের পুরোটা সময় ধরেই এই দুই দেশের মাঝে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল (মিশরীয়রা সমুদ্রচারী জাতি না হলেও ক্রীটিয়রা তা ছিল, প্রকৃতপক্ষে ক্রীটিয়রাই ইতিহাসের প্রথম নৌসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল)।

মিশরের মধ্য রাজবংশের আমলেই ক্রীটের প্রাসাদগুলি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। হয়তো এগুলি মিশরীয় গোলকধাঁধার কাহিনীর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এমনকি সেগুলির কিছু অনুকৃতিও এর মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে। এমনকি গ্রিক পুরাণেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে। ষাঁড়কে উর্বরতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে *মিনোতাউরের* কল্পনা– অনেক ধর্মের মধ্যেই ক্রিটীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দ্বাদশ রাজবংশও থীবীয় উৎসের কথা অস্বীকার করেনি। দক্ষিণের শহরগুলি নির্মিত হয়েছিল এবং সেগুলি সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছিল এবং অনেক মন্দির ও স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তী থীবীয় বংশের দ্বারা সেগুলি খর্বাকার করা হয়েছিল।

তবে তৃতীয় আমেনেমহাটের মৃত্যুর পর কিছু একটা ঘটেছিল। হয়তো কোনো একজন দুর্বল রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছিল, আর সেই সুযোগে অমাত্যরা কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। হয়তো গোলকধাঁধা নির্মাণে অনেক শক্তিক্ষয় হয়েছিল, যেমনটা ঘটেছিল বহু শতাব্দী পূর্বে পিরামিড নির্মাণের কারণে।

কারণ যা-ই থাক না কেন, মহান সম্রাটের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই মধ্য রাজবংশের সমৃদ্ধির অবসান ঘটল। এটা টিকেছিল মাত্র আড়াই শতাব্দীব্যাপী, প্রাচীন সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকালের অর্ধেক মাত্র।

আবারও সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, খণ্ডিত রাজ্যগুলি অভিজাতদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। আবারও ছায়া সম্রাটরা সিংহাসনের দাবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে হাজির। *মানেথো* দুটি রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বংশ যারা একই সময়ে রাজত্ব করতেন, যারা কেউই সাম্রাজ্যের সত্যিকারের দাবিদার ছিলেন না। বাস্তবিকপক্ষে *মেনেসের* সুকৃতি আবারও ধসে পড়ল, আর দুই মিশর আলাদা হয়ে গেল ত্রয়োদশ রাজবংশ থিবিসকে কেন্দ্র করে আপার ঈজিপ্টে রাজত্ব করত, আর চতুর্দশ রাজবংশ লোয়ার ঈজিপ্টে তার শাসনকাজ চালাত বদ্বীপের ঠিক কেন্দ্রস্থলের এক শহর "জোইসকে" কেন্দ্র করে।

আবার এক শতাব্দী ধরে চলল বিশৃঙ্খলা আর এল এক অন্ধকার যুগ। এবার অবশ্য বিবদমান রাজবংশগুলি এককভাবে যুদ্ধ করে এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ পেল না, তারা কেউই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ ছিল না। তার বদলে এমন কিছু ঘটল, সভ্যতার সূত্রপাতের পরে মিশরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে যেমনটা আর কখনোই ঘটেনি। বিদেশি এক আগ্রাসন ঘটল যারা মিশরের দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল।

মিশরবাসীগণ, যাদের রয়েছিল দেড় হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, যারা এমন একটা দেশের অধিবাসী যেখানে রয়েছে দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পিরামিড, যারা অন্যের সাথে বাণিজ্য করত শুধু কাঁচামাল আহরণের জন্য– কাঠের তক্তা, মশলা, ধাতুর তাল। যেখানে মিশরীয় সৈন্যরা অভিযান পরিচালনা করেছিল এবং তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, যেমন নুবিয়া এবং সিরিয়া, সেসব দেশের লোক অনেক কম সম্পদশালী এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে স্বল্পোন্নত। তারা নিজেদেরকে নিয়ে অহংকার করত যেমনটা করত রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংরেজরা নিজেদেরকে নিয়ে অথবা এখন যেমনটা করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে।

তাহলে এমনটা কী করে ঘটল যে সামান্য কিছু বিদেশি বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র মিশর ধসে পড়ল– এমনকি বিভক্ত মিশরও, আর এটা দখল করে নিল কোনো রকম প্রতিরোধ ছাড়াই?

হিক্সস

পরবর্তী মিশরীয় ইতিহাসবিদগণ মিশর ইতিহাসের এই অধ্যায়টি নিয়ে লজ্জাবোধ করেন, আর তাদের ইতিহাসগ্রন্থ থেকে এই পর্বটি মুছে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, আর আমাদের দুঃখের বিষয় হলো এই পর্বটি সম্বন্ধে বা কারা এই আগ্রাসক ছিল তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এমনকি বিজয়ী আক্রামকদের নামও খুব কমই জানতে পারি।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদি ঐতিহাসিক *যোসেফাস* মেনেথোকে উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন আগ্রাসকদের বলা হতো *হিক্সস* আর এর অর্থ করা হয় "মেষপালক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা।" এতে বোঝা যায় তারা ছিল যাযাবর, যাদের জীবিকা ছিল মেষচারণ, যেটা সভ্য মিশরীয়রা বহু পূর্বেই ত্যাগ করে কৃষিনির্ভর সভ্যতায় প্রবেশ করেছে, আর যেটাকে তারা বর্বরতা মনে করত।

হয়তো ব্যাপারটা সেরকমই, তবে বর্তমানে এটাকে বুৎপত্তিজাত মনে করা হয় না। তৎপরিবর্তে বিশ্বাস করা হয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে মিশরীয় শব্দ "হিক শাস" থেকে যার অর্থ *উজান দেশের শাসক* অথবা কেবল "বিদেশি শাসক।"

তাছাড়া এটা নিশ্চিত যে হিক্সসরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে সিনাই উপদ্বীপ পার হয়ে বন্যার বেগে ধেয়ে এসেছে এবং তারা ছিল এশিয়ান আর তাদের কাছে ছিল উন্নত সামরিক উপকরণ। ইতিপূর্বে মিশরীয়রা এশিয়ার খুব অল্পদূর পর্যন্তই প্রবেশ করতে পেরেছিল, আর এখন এশীয়রা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

১৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার লোকজন, যারা ছিল এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে অগ্রগামী, এতদিন পর্যন্ত তারা মিশরে আঘাত হানার চেষ্টা করেনি। বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ছিল ঠিকই, তবে কোনো সামরিক সংঘাত ছিল না। যে নয়শ মাইলের দূরত্ব দুটি নদী সভ্যতাকে পৃথক করে রেখেছিল তাদের প্রাচীন ইতিহাসে কার্যকর অন্তরক হিসাবে কাজ করেছিল।

মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং প্রাচীন রাজবংশের প্রথম শতাব্দীতে ইউফ্রেতিস তাইগ্রিসের নগরগুলি বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। তারা একে অপরের সাথে অবিরাম সংগ্রাম করে চলে, নিজেদের নগরের চারপাশে সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করে, তারপর নগরদুর্গ অবরোধ এবং সেগুলি ভেঙ্গে ফেলার কৌশল আয়ত্ত করে। তারা নিজেদের মধ্যে কলহে এত ব্যস্ত থাকত যে বাইরের কোনো অভিযানের কথা ভাবতেও পারেনি।

খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে *আগাদে* নগরের *সার্গন* নামে এক শাসক সমগ্র এলাকাটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার সীমানা সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। একই সাথে মিশর হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী আর পঞ্চম রাজবংশ শান্তিতে রাজত্ব করেছিল। সার্গন বা তার উত্তরসূরি কেউই তাদের সংকটময় যোগাযোগ লাইন সম্প্রসারিত করতে সাহস করেনি যেখান থেকে তারা নীল বিধৌত ভূমিতে আক্রমণ চালাতে পারে।

দুই শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে সার্গনের সাম্রাজ্যে অবক্ষয় শুরু হয় আর শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর প্রাচীন মিশর সাম্রাজ্যও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকা পরিণত হয় বিবদমান ভূখণ্ডে আর তারা মোটেই কোনো দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না।

ঠিক সেই সময়ে যখন মিশরে মধ্য সাম্রাজ্য ক্ষমতা পাকাপোক্ত করছিল, তখন এ্যামোরাইট্স্ নামে এক যাযাবর গোষ্ঠী ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস অঞ্চলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। তারা ইউফ্রেতিস নদীর তীরে এক ক্ষুদ্র শহর "বাব-ইলুকে" (তখনও গুরুত্বহীন) তাদের রাজধানী বানাল। *বাব-ইলু* শব্দের *অর্থ দেবতার*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*প্রবেশদ্বার। গ্রিক*দের কাছে শহরটির নাম হয়ে দাঁড়ায় *বেবিলন*, আর এই নামেই আমাদের কাছে এটা সমধিক পরিচিত। এ্যামোরাইটসদের অধীনে বেবিলন এক মহান নগরে পরিণত হয় আর পরবর্তী দেড় হাজার বছর ধরে এর মহত্ত্ব টিকে থাকে। তাই প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকা সচরাচর এই নামেই উল্লেখ দেখা যায়।

আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেবিলনের রাজা *হামুরাবি* এক সাম্রাজ্যের উপর শাসন কায়েম করেছিলেন আয়তনে যা প্রায় সার্গনের রাজ্যের সমান ছিল। ইতিমধ্যে যদিও মিশরে মধ্য রাজবংশ ক্ষমতার শিখরে অবস্থান করছিল আর এশীয়রা শক্তিধর হলেও মিশরের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়নি এমনকি সিরিয়ায় মিশরীয়দের শাখা প্রশাখাতেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেনি।

মিশর ও এশিয়ায় ক্ষমতার উত্থান পতনের মধ্যে একটা ভারসাম্য সর্বদাই বিরাজমান ছিল, আর এদিক দিয়ে বলা যায় মিশর ছিল অধিক ভাগ্যবান যদিও সেই সৌভাগ্যের সময়কাল দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। এশিয়ার তুলনামূলকভাবে যে বিস্তীর্ণ এলাকায় সংঘর্ষ চলে আসছিল, সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমর উপকরণের উদ্ভব ঘটে– অশ্ব এবং রথ। এশিয়া এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল যা বেবিলনের সভ্যতাকেন্দ্রের উত্তরে প্রসারিত, তারই কোনো এক জায়গায় ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়েছিল।

যাযাবরেরা সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে আসে, তবে সব সময় তাদের যুদ্ধ করে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ থাকে। যাযাবরদের একটা সুবিধা হলো তারা চমক সৃষ্টি করতে পারে এবং তারা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। সাধারণত নগরবাসীরা যুদ্ধের প্রতি বীতস্পৃহ থাকে, তবে তাদের থাকে সংগঠিত সামরিক বাহিনী এবং নগরপ্রাকার। নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা তাদের থাকে। এ্যামোরাইটসরা বেবিলনে প্রবেশ করে নিজেদের জন্য ছোট ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করে, আর শুধু তখনই বড় বড় নগরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল যখন বেবিলনীয় সভ্যতার সাথে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পেরেছিল।

তবে হামুরাবি যুগের অবসানে যাযাবরেরা তাদের নতুন হাতিয়ার নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এল। প্রতিটি ঘোড়া দুই চাকার রথ টেনে সৈন্যদের পরিবহণের কাজ করেছিল। প্রতিটি রথে ছিল দুজন করে আরোহী, একজন রথ পরিচালনা করত আর অন্যজন বর্শা বা তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। তাদের অস্ত্রগুলি ছিল দীর্ঘতর, দৃঢ় এবং অনেক দূরে নিক্ষেপ করার উপযোগী, আর এসব অস্ত্র ধীরগামী পদাতিকদের চাইতে অনেক বেশি কার্যকর ছিল।

ছুটন্ত মেঘের মতো বিদ্যুৎগতি অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে এসব ধীরগতি পদাতিক বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। উন্মত্ত অশ্বের খুরের বজ্রনির্ঘোষ শব্দ আর ঘাড়ের কেশরের ঝাঁকানি তাদের কাছে ছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য। এসব দ্রুতগামী জন্তুর মোকাবিলা মোটেই সহজ ছিলনা। তখন তাদের ছুটে পালানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলনা আর তখন অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে তাদের ঘেরাও করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিলনা।।

হামুরাবির আমলে অশ্বারোহী যাযাবররা যেখানেই অগ্রসর হয়েছে সেখানেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, যদি না শত্রুপক্ষ দ্রুত অশ্বারোহণের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে বা প্রাকারবেষ্টিত নগরের মধ্যে আশ্রয় নিতে পেরেছে।

বেবিলনের নগরসমূহ কিছু সময়ের জন্য তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তবে একটি জাতিগোষ্ঠী, বেবিলনীয়দের কাছে যারা পরিচিত ছিল "কাশ্শি" আর গ্রিকদের কাছে "ক্যাসাইট" নামে, তারা ক্রমাগত এগিয়ে আসতে থাকে। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা বেবিলনিয়ায় এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল যা প্রায় সাড়ে চার শতাব্দীব্যাপী টিকেছিল।

বেবিলনীয় নগরসমূহ যতদিন উত্তরের যাযাবরদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, পশ্চিমের সিরীয় নগরসমূহ ততদিন তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যাযাবরেরা সিরিয়া দখল করে নেয়। কিছু কিছু কেনানীয় শহর তাদের দখলে চলে যায় আর কিছু মিত্ররূপে তাদের সাথে যোগ দেয়।

যাযাবর ও কেনানীয়দের একটা সম্মিলিত বাহিনী মিশরের উপর হামলে পড়ে। তারা কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতি বা গোষ্ঠি ছিলনা, আর তারা নিজেদেরকে হিক্সসও বলত না। মিশরীয়রাই এই নামটা তাদের দিয়েছিল, আর কোনো একক নামই কোনো একক জাতি নির্দেশ করে না।

তাছাড়া হিক্সসদের কোনো অগ্রসরমান সাম্রাজ্যের অগ্রভাগও বলা চলে না, বরং তারা ছিল বিশৃঙ্খল হামলাকারী দস্যুদল। তবে তাদের আয়ত্তে ছিল অশ্ব আর রথ এবং তীর ধনুক, যেগুলি যে কোনো মিশরীয় অস্ত্রের চাইতে উন্নততর।

মিশরীয়দের ঘোড়া ছিল না। পরিবহণের জন্য তাদের ছিল ধীরগামী গাধা। তাদের রথ ছিল না। হয়তো কোনো সক্ষম রাজা শত্রুর হাতিয়ার সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারত, তবে এসময় মিশর নিজেদের মধ্যেই বহুধা বিভক্ত ছিল। মিশরের ভাগ্যে চলছে অবক্ষয়ের পালা।

অশ্বারোহীরা বিদ্যুৎগতিতে প্রবেশ করল। মিশরীয় পদাতিকরা ছুটে পালাল। ১৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই পতন ঘটল মিশরের মহান সম্রাট তৃতীয় আমেনেমহাটের মৃত্যুর আশি বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। তবে সমগ্র মিশরের পতন ঘটল না। হিক্সস বাহিনী তেমন বড়সড় ছিল না। আর তারা সমগ্র নীল অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ার সাহস পায় নাই, বরং তারা সুদূর দক্ষিণের নীল উপত্যকাকে নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেওয়াটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবেছিল। লোয়ার ঈজিপ্টের সাথে সিরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে তারা একটা সাম্রজ্যের উপরই তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

নীল অববাহিকার দক্ষিণপ্রান্তে *আভারিস* নগরে তারা তাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের রাজত্বের একপ্রান্ত নীল অববাহিকা আর অন্যপ্রান্ত সিরিয়া। হিক্সস বংশের দুটি ধারা মিশরের উপর রাজত্ব করেছিল। মানেথো তাদের উল্লেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ রাজবংশরূপে (এটা মনে রাখার মতো যে বিদেশি শাসকদেরও রাজবংশরূপে চিহ্নিত করা হতো)। প্রকৃতপক্ষে এসব রাজবংশ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কারণ পরবর্তী মিশরীয়গণ তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে এবং তাদের লেখায় ওদের কথা বেশি না লিখতেই পছন্দ করতেন। তাদের লিপিতে যদি ওদের কথা কিছু লিখতেই হতো তবে তা ছিল চরম বিদ্বেষপূর্ণ।

কাজেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে হিক্সসরা সাংঘাতিক নিষ্ঠুর ও চরম অত্যাচারী এবং তারা মিশরে নির্দয়ভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। তবে কথাটা সত্য বলে মনে হয় না। তারা মোটামুটি ভদ্রভাবেই দেশ শাসন করেছিল।

যে বিষয়টি মিশরীয়দের খেপিয়ে তুলেছিল তা হলো হিক্সসরা এশীয় রীতিনীতি মেনে চলত আর তারা মিশরীয় দেবতাদের দিকে মোটেই দৃষ্টি দিত না। মিশরীয়রা হাজার বছর ধরে যে সব রীতিনীতি সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য বলে পালন করে এসেছে, আর যারা বিদেশিদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, তারা এটা কিছুতেই মাথায় ঢোকাতে পারছিল না যে অন্য মানুষদেরও ভিন্ন জীবনধারা থাকতে পারে, যেটা তাদের কাছে সঠিক মনে হতে পারে, যেমনটা মিশরীয়দের কাছে তাদের নিজেরটা। মিশরীয়দের কাছে হিক্সসরা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহী এক জনগোষ্ঠী, এবং তাদের কখনোই ক্ষমা করা যেতে পারেনা।

সত্যি বলতে কি, দ্বিতীয় হিক্সস রাজবংশের ষোলতম শাসক পুরোপুরি মিশরীয় হয়ে উঠেছিলেন, তবে সেটা মিশরীয়দের সন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্ট না হলেও এশীয়দের ক্ষুব্ধ করার মতো যথেষ্ট ছিল। এটা হিক্সস শাসনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল।

এমনটা হতে পারে যে হিক্সসদের শাসনামলে বিপুলসংখ্যক এশীয় অভিবাসী মিশরে প্রবেশ করেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণ সিরিয়া (কেনান) থেকে। স্থানীয় মিশরীয় শাসনামলে এসব অভিবাসীদের সন্দেহের চোখে দেখা হতো, আর তাদের মিশরে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করা হতো। অপরপক্ষে হিক্সস রাজারা এশীয় অনুপ্রবেশ উৎসাহিত করত, যারা স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে রাখার ব্যাপারে রাজাদের সহায়ক বলে মনে করত।

হয়তো বাইবেলের ইউসুফ ও তার ভাইদের গল্প মিশর ইতিহাসের এই সময়ের প্রতিফলন। নিশ্চয় মিশরের সহৃদয় রাজা যিনি ইউসুফকে তার প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন এবং ইয়াকুব ও তার সঙ্গী ইহুদিদের জন্য *গোশেনে* (বদ্বীপে, আভারিসের পূর্বে) একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা স্থানীয় মিশরীয়দের সাথে মিশে যেতে না পারে। ঐ রাজা যে একজন হিক্সস ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক যোসেফাস, যিনি ইহুদি জাতির মহত্ত্ব প্রতিপাদনে উদ্গ্রীব ছিলেন, তাদের একটা বিজয়ী ইতিহাস দেওয়ার জন্য এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে হিক্সসরা ছিল ইহুদি আর ঠিক এই সময়টাতেই তারা মিশর জয় করেছিল, যদিও ব্যাপারটা মোটেও সেরকম ছিলনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. সাম্রাজ্যের উত্থান

পুনরায় থিবিস

একদিকে উত্তরে যখন হিক্সসরা রাজত্ব করছে, থিবিসে তখন মধ্য সাম্রাজ্যের গৌরবগাথা বুকে ধারণ করে আমেনের পুরোহিতরা রাজ্য চালাচ্ছে। তারা ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা সুসংগঠিত করেছিল, আর এটা সহজ হয়েছিল, সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য কোনো বৃহৎ শক্তির অস্তিত্ব ছিলনা– অন্ততপক্ষে আপার মিশরে– আর তারা বড় কিছু করার পরিকল্পনা করছিল।

হিক্সসদের আগমনের প্রায় সত্তর বছর পর ১৬৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে থিবীয় শাসকরা নিজেদেরকে রাজা বলে ঘোষণা করে আর সঙ্গতকারণেই তারা নিজেদেরকে সমগ্র মিশরের সত্যিকারের রাজা মনে করতে থাকে। এভাবেই এক নূতন রাজবংশের সূচনা ঘটে মেনেথো যার নাম দেন সপ্তদশ রাজবংশ।

প্রথমদিকে থিবীয় রাজাদের অবস্থা তেমন আকর্ষণীয় বোধ হয়নি। উত্তরাঞ্চল মূলত হামলাকারীদের দখলেই রয়ে যায়। নুবীয়দের দুর্গ পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাদের অধিকারে যেটুকু রয়ে যায় তা মূলত তাদের নিজ নগর আর উত্তর দক্ষিণে একশ মাইল দীর্ঘ নীলনদের সংকীর্ণ উপত্যকা। আর এটুকুও নিজেদের অধিকারে রাখতে তাদের অনেক ঘাম ঝরাতে হয়।

দুটি বিষয় তাদের অনুকূলে কাজ করেছিল। যদি একটি যুদ্ধবাজ জাতি কঠোরভাবে সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় আর তারা যদি কোনো সভ্য দেশ জয় করে তা দখলে নেয়, তাহলে অতি শীঘ্রই তারা বিলাসী এবং আয়েশি জীবনে আসক্ত হয়ে পড়ে, আর অতি শীঘ্রই কষ্টকর সামরিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা যুদ্ধপ্রিয় থাকে না (ঐতিহাসিকরা যুদ্ধের প্রতি এই অনীহাকে প্রায়ই অবক্ষয়ের লক্ষণ বলে ধারণা করেন, তবে যুদ্ধের প্রতি এই বিতৃষ্ণাকে একটি অসভ্য জাতির সভ্যতার দিকে পদক্ষেপ বলেও মনে করা যেতে পারে)।

সে যা-ই হোক না কেন, হিক্সসরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে নমনীয় হতে শুরু করে। শাসকরা, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আচরণ এবং ভাবভঙ্গিতে মিশরীয় হয়ে পড়ে আর সে কারণেই আর আগের মতো যুদ্ধনিপুণ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, গোপন অস্ত্রটি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পরে আর গোপন থাকে না। দক্ষিণ মিশরীয়রা ইতিমধ্যে অশ্ব ও রথের ব্যবহার রপ্ত করে নেয়, আর হিক্সসদের সাথে সমানে সমানে লড়াই করতে সক্ষম হয়।

সপ্তদশ রাজবংশের রাজারা হিক্সসদের সাথে যুদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তারা তাদের ক্ষমতা উত্তর দিকে সম্প্রসারিত করে আর আক্রমণকারীদের এলাকা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে থাকে। হিক্সসদের শেষ রাজা *কামোসের* রাজত্বের শেষদিকে তাদের রাজ্যের সীমা রাজধানীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

কামোস বা সামগ্রিকভাবে হিক্সস, কাউকেই আর শেষ বিজয় দেখার অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। কী ঘটেছিল সেটা জানা যায়নি। অনুমান করা যেতে পারে কামোসের মৃত্যুর পর তার কোনো সন্তান জীবিত ছিল না। সম্ভবত তার দূর সম্পর্কের কোনো ভাই ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল। সেটা হয়ে থাকলে তাকে কোনো মতেই নূতন রাজবংশের সূচনা বলে গ্রহণ করা যায় না। আমরা ঠিক জানিনা মানেথো রাজবংশ নির্ণয়ের জন্য কোন্ মানদণ্ড ব্যবহার করেছিলেন। হয়তো মানেথো ভেবেছিলেন হিক্সসদের বিতাড়নের পর একটা নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল, সেখানে ক্ষীণ পারিবারিক সম্পর্ক বড় বাধা ছিল না।

অষ্টাদশ রাজবংশ (সপ্তদশ রাজবংশের মতোই) মিশরের ইতিহাসে তেমন মহত্ত্ব অর্জন করতে পারেনি। ১৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় যার প্রথম প্রতিনিধিত্ব করেন *আহমোসে* এবং তিনি তার পূর্বসূরির সম্ভবত ভাই, এবং আমোসের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন।

বদ্বীপের এক চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি হিক্সসদের শেষ রাজা তৃতীয় এ্যাপোফিসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে মিশরের বাইরে তাড়িয়ে দেন। এমনকি তিনি হিক্সসদের প্যালেস্টাইন পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে আরও একবার তাদের পরাজিত করেন।

এভাবেই হিক্সসরা হঠাৎ করেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে প্রায় দেড় শতাব্দীব্যাপী এক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য শাসন করে হঠাৎ করেই আবার রহস্যজনকভাবে নিঃশব্দে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়। সিরিয়া এবং আশেপাশের অঞ্চলের সেমিটিক গোত্রের লোকদের সাথে হিক্সসদের আলগা হলেও এক ধরনের সম্পর্ক ছিল, আর এখন তারা সেই এলাকাতেই ফিরে গেল। তবে হিক্সসরূপে তাদের আর কোনো পরিচয় রইল না, আর বিভিন্ন সেমিটিক গোত্র– যেমন কেনানীয়, ফিনিসীয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যামোরীয় পরিচয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে দীর্ঘদিন মিশরীয়দের সাথে যুদ্ধ করেছিল।

হিক্সসদের সাথে মোকাবেলা শেষ করার পর আহমোস উত্তরে নুবিয়া পর্যন্ত মিশরীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং প্রভাবশালীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হিক্সস উপাখ্যান থেকে মিশরীয়রা অন্তত একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিল, আর উদ্ধত অভিজাতরা সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হয়েছিল। এভাবেই মিশরীয় পরিস্থিতি মহান চতুর্থ রাজবংশের আবহে প্রত্যাবর্তন করেছিল। আহমোসের শাসনকাল এভাবেই প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী অস্থিরতার পরে ক্ষমতা সংহত করতে পেরেছিল। তাই পরবর্তী মিশরীয় ইতিহাসকে বলা হয় নূতন সাম্রাজ্য।

সন্দেহ নাই হিক্সসদের আমলে যেসব এশীয় জাতি মিশরে প্রবেশ করেছিল, প্রকৃত মিশরীয়রা ক্ষমতায় পুনরাবর্তনের পরেও তাদের কেউ কেউ রয়ে যায় আর তারা স্বাভাবিকভাবেই "পঞ্চমবাহিনী" হিসেবে কাজ করেছিল। তাই নিরাপত্তার কারণে এশীয়দের সকল প্রকার অধিকার থেকে নিবৃত্ত করে রাখা হয়েছিল। এই ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্যই ইহুদিরা ফারাওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

তবে অন্তত একটা বিষয়ে প্রাচীন ও মধ্য সাম্রাজ্য থেকে নতুন সাম্রাজ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আর তা হলো মিশরীয়রা জীবনের সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারা বুঝতে শিখেছিল, পৃথিবীতে তারাই একমাত্র জাতি নয়। মিশরের চারদিকে যে সব জাতি তাদের বেষ্টন করে আছে তারা সবাই নিকৃষ্ট প্রাণী নয়। তাদের চারপাশে আরও অনেক যুদ্ধবাজ জাতি রয়েছে যারা তাদের ধ্বংস করে দিতে পারে আর মিশরকে গুড়িয়ে দেয়ার আগেই তাদের গুড়িয়ে দিতে হবে।

মিশরীয় বাহিনীতে এবার যুক্ত হলো রথ, যার ঐতিহ্য রয়েছে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের। সম্রাটদের আবির্ভাব ঘটল যাদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পরিচালনার মাধ্যমে মিশরের বাইরে বিজয়লাভের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাজা এখন শুধু পুরোহিত আর ঈশ্বর নন, তিনি এখন একজন মহা-শক্তিধর সেনাপতিও বটে। এভাবেই রাজা তার প্রজাদের কাছে আরও মহৎ হয়ে উঠল। ঈশ্বররূপে জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি ছিল শান্ত, অপ্রদর্শনীয় শস্য উৎপাদনের প্রতীক, তবে সেনাপতিরূপে তিনি ছিলেন উগ্র ভয়ংকর মূর্তিরূপে।

নতুন সাম্রাজ্যে মিশরীয় রাজারা এক নতুন উপাধি অর্জন করেছিল। ইতিপূর্বে মিশরের সাধারণ লোক সম্রাটের নাম উচ্চারণ করে তাকে অপবিত্র করা হয়েছে বলে মনে করা হতো। বর্তমানকালে আপনি বলার পরিবর্তে যেমন সম্বোধন করা হয় 'ইয়র ম্যাজেস্টি, এমনকি বর্তমান গণতান্ত্রিক আমেরিকাতেও সম্বোধন করা হয় মিঃ প্রেসিডেন্ট, অথবা বলা হয় 'হোয়াইট হাউস মনে করে যে–' তেমনি মিশরীয়রা সম্রাটের উল্লেখ করতে গিয়ে তার প্রাসাদের নামানুসারে বলত "পে-রো" যার বর্তমান রূপ ফারাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, এই উপাধিটা অষ্টাদশ রাজবংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি, এটা আমাদের কাছে এসেছে বাইবেলের কল্যাণে। বাইবেলে যে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সে সব ঘটনার সূত্রপাত নব্য রাজবংশকে কেন্দ্র করে। ওল্ড টেস্টামেন্টে অনৈতিহাসিকভাবে ফারাও কথাটা আব্রাহামের সাথে দ্বাদশ এবং যোসেফের (ইউসুফ) কালের কল্পকথা যুক্ত করা হয়েছে নব্য রাজবংশের সাথে।

সম্প্রসারণ

প্রথম আমহোসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম আমেনহোটেপ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (কোনো কোনো মিশর তত্ত্ববিদ আমেনোফিস নামটা বেশি পছন্দ করেন, কারণ মিশরীয় নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য না থাকলেও উচ্চারণের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য রয়ে গেছে)।

প্রথম আমেনহোটেপের অধীনেই মিশরে এক নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটল। তার সেনাদল নুবিয়ার গভীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাল ইতিপূর্বে যে সীমা বিস্তৃত ছিল তিন শতাব্দী পূর্বে তৃতীয় আমেনেমহাটের আমলে। নীল নদের পশ্চিমে সিনাইয়েরও ওপারে ছিল তার সাম্রাজ্যের পরিসর।

মিশরের পূর্বপ্রান্তে বিশাল সাহারা মরুভূমি। তবে এমনকি মধ্য সাম্রাজ্যের আমলেও এটা আজকের মতো ততটা শুষ্ক ও জনহীন ছিলনা। উপকূলীয় অঞ্চল প্রচুর লোক পোষণের উপযোগী যথেষ্ট উর্বর ছিল। আজ যেখানে শুধু কিছু ঝোপঝাড় আর কিছু ছাগল ভেড়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়না, সেকালে সেখানে ছিল পর্যাপ্ত আঙুর বাগান, আর জলপাইয়ের উদ্যান। আর মরুদ্যানগুলিও ছিল অসংখ্য আর সুবিস্তৃত।

পরবর্তী শতাব্দীসমূহে গ্রিকরা মিশরের পশ্চিম উপকূলে কলোনি স্থাপন করে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে গ্রিকরা মিশরের পশ্চিমের উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকার নাম দিয়েছিল "লিবিয়া"। তাই ইতিহাসে এই এলাকার মরুদ্যানে বসবাসরত লোকরা পরিচিত ছিল "লিবীয়" নামে এলাকাটা এখনও লিবিয়া নামেই পরিচিত, (আর ১৯৫১ সালে স্বাধীন লিবিয়া রাষ্ট্রের পরিচিতি লাভ করে)। লিবীয়রা জাতিগতভাবে মিশরীয়দের সমগোত্রের হলেও সংস্কৃতিগতভাবে ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। নীল নদের পলিবাহিত উর্বর মাটি মিশরীয়দের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানের কারণে, মিশরীয়রা প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করতে পেরেছিল, যা মিশরে এক উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। প্রান্তিক সম্পদের অধিকারী হওয়ায় লিবীয়দের সে সুযোগ ছিলনা, পশুচারী যাযাবররা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিবীয়রা মাঝে মাঝে পূর্বদিকে নীল উপত্যকার শান্তিপূর্ণ কৃষি অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করাটাকে লাভদায়ক মনে করত। চকিত আক্রমণে হতবুদ্ধি করে দিতে পারলে লুটের মাল বেশ ভারীই সংগ্রহ করা যেত আর প্রতিশোধমূলক আক্রমণে মিশরীয়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিবীয়দের তেমন কাবু করতে পারতনা।

এসব হামলার সংখ্যা বেড়ে যেত যখন মিশরীয়রা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকত। কারণ এমন অবস্থায় মিশরীয়দের জন্য সীমান্তের উপর নজরদারি রাখা কঠিন ছিল। হিক্সস আমলে যখন মিশরে চলছিল দারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থা, তখনই লিবীয়রা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিল আর সেই অবস্থা মিশরীয়দের জন্য ছিল চরম বেদনাদায়ক।

প্রথম আমেনহোটেপ বুঝতে পেরেছিলেন লিবীয়দের ঠেকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় পশ্চিম দিকে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা। নীলের পশ্চিমের মরুদ্যানসমূহ এবং উপকূলের শক্ত ঘাটিগুলি অবশ্যই মিশরীয় সেনাবাহিনীকে স্থায়ীভাবে দখলে নিতে হবে। লিবীয় আক্রমণকারীদের যদি আসতেই হয়, তাহলে আরও দক্ষিণের ঘাটি থেকে আসতে হবে। তাদেরকে বহুদূরের পথ অতিক্রম করে আসতে হবে এবং ফিরেও যেতে হবে বহু দূরের পথে। সেক্ষেত্রে তাদের অবিরাম মিশরীয় আক্রমণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে লাভের চাইতে ঝুঁকির মাত্রাই বেশি হবে।

প্রথম আমেনহোটেপ তার পরিকল্পনা সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে পেরেছিলেন বলেই মিশরীয় ক্ষমতার সীমানা তৃতীয় এবং চতুর্থ রাজবংশের তুলনায় চতুর্দিকে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পেরেছিল। উত্তরে নুবীয়, পশ্চিমে লিবীয় এবং উত্তর-পূর্বে কেনানীয়দের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সেজন্যই এই সময়টাকে মিশরীয় সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

প্রথম আমেনহোটেপের কোনো পুত্র, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে কোনো উত্তরাধিকারীও ছিলনা, তবে এটাও সঙ্গত মনে হয়না যে তিনি একজন দখলদার ছিলেন, মানেথো তাকে দিয়ে কোনো রাজবংশের সূচনা করেননি, বরং নূতন রাজা এবং তার বংশধরকে অষ্টম রাজবংশের অংশ হিসেবেই দেখিয়েছিলেন। সম্ভবত আমেনহোটেপের কোনো পুত্র ছিলনা আর তার জামাতাই সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। তার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার নিশ্চিত হয় তার স্ত্রীর অধিকারের মাধ্যমে।

সে যাই হোক, ১৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় আসীন হলেন প্রথম থুতমস, আনেক সময় যে নামটি উচ্চারিত হয় থতমেস নামে। প্রথম থুতমস আমেনহোটেপের নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। তিনি আরও দক্ষিণে চতুর্থ প্রপাত পর্যন্ত অগ্রসর হন, যাতে করে নীল নদের প্রায় বারোশত মাইল পর্যন্ত তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকারে চলে আসে এক বিশাল এলাকা। নূতন ফারাওর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল নিজের অধিকারে নিয়ে আসা যেটা পরবর্তী তিন শতাব্দীব্যাপী মিশরের অংশ রয়ে যায়।

যেখানে কেনানীয়রা বাস করত, গ্রিকরা যাকে বলত সিরিয়া, সেখানে একটা উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মরু সাগরের ঠিক উত্তরে জেরিকো নামে যে শহরটি গড়ে উঠেছিল, সেটা ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শহরগুলির অন্যতম, যার সময় নির্ধারণ করা হয় ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক কৃষিভিত্তিক সমাজে, যে সময়ে নীল এবং ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকায় সভ্যতার স্পর্শ লাগেনি।

কেনানীয় শহরগুলির সাথে কোনো নদীপথের সংযোগ ছিলনা, তাই এগুলি কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধও হতে পারেনি। তাদের ইতিহাসের অন্তকাল পর্যন্ত এগুলি পৃথক নগররাষ্ট্ররূপেই রয়ে যায়। তাই তারা একদিকে ঐক্যবদ্ধ মিশর এবং অন্যপাশে বেবিলনিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে পারেনি। শুধু মিশর ও বেবিলনিয়ার দুর্বল মুহূর্ত ছাড়া তারা কখনোই স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকতে পারেনি, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তো অনেক দূরের কথা।

মিশরীয় সৈন্যরা ইতিপূর্বেও সিরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। মধ্য সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগে তৃতীয় আমেনেমহাট এক শহর দখল করেছিলেন যাকে "শেখেম" বলে চিহ্নিত করা হয় যার অবস্থান ছিল সিনাই উপদ্বীপের সীমান্ত থেকে প্রায় একশ মাইল উত্তরে। প্রথম আমহোস যেখানে হিক্সসদের তাড়া করে সিরিয়ায় ঢুকে পড়ে, আর প্রথম আমেনহোটেপ সেখানে বিজয় অর্জন করেন।

প্রথম থুতমস এর চেয়েও বেশি কিছু করতে চেয়েছিলেন। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করে ইউফ্রেতিসের উজানে *কার্খেমিশ* দখল করে নেন, যা সিনাই উপদ্বীপ থেকে চারশ মাইল উত্তরে। তার উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ সেখানে তিনি একটা পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করেন। মেঘবিহীন ভূখণ্ডের সন্তান, মিশরীয় সৈন্যরা বৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে ভাবল "তাদের উপর আকাশ থেকে নীল নদ ঝরে পড়ছে।" তারা ইউফ্রেতিসের স্রোতোধারার গতিপথ দেখেও অবাক হয়েছিল, "যে নদীর প্রবাহিত হওয়ার কথা উত্তর দিকে তা প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ দিকে।"

নূতন রাজত্বের আগমনে স্থাপত্যের এক অভিনব আড়ম্বরপূর্ণ রীতির প্রচলন ঘটল। পিরামিড স্থাপনের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রীতির অবসান ঘটল। নূতন করে আর কোনো পিরামিডের স্থাপনা হলোনা। তার পরিবর্তে ফারাওরা তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করল বিশালাকৃতি স্তম্ভ আর বিপুলায়তন মূর্তি স্থাপনায়।

সুদৃশ্য অলঙ্করণের ধারা বহমান রইল অষ্টম রাজবংশের ফারাওদের রাজধানী থিবিসে। এসময় একাদশ বা দ্বাদশ রাজবংশের মতো বদ্বীপ বা লেক মোয়েরিসের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হলোনা। হয়তো নিম্ন মিশর তার মর্যাদা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে, কারণ, যে সময় থিবিস স্বাধীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সময়ে এ অঞ্চলটা হিক্সসদের অধীনে ছিল। তাছাড়া দীর্ঘ নুবীয় এলাকা মিশরীয় আধিপত্যে আসার ফলে থিবিস আরও বেশি কেন্দ্রীয় অবস্থানে এসে গেল।

থুতমস এবং তার উত্তরসূরিরা থিবিসে বিশাল বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। প্রত্যেক রাজাই চেষ্টা করেন প্রস্তরখণ্ডের প্রাচুর্যে ও অলঙ্করণের আতিশয্যে তার পূর্বসূরিকে অতিক্রম করতে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই থুতমস থিবিসের উত্তরপ্রান্তে *আমেনে* তার মন্দির নির্মাণ করেন যে স্থানটি এখন আধুনিক *কার্মাক* গ্রামের অন্তর্গত। থিবিসের দক্ষিণ অংশে পরবর্তীকালে আরও একটা বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির নির্মাণ হয়েছিল।

থিবিস নগরটির অবস্থান ছিল নীল নদের পূর্ব তীরে। পশ্চিম তীরে গড়ে উঠেছিল বিশাল এক সমাধিসৌধ। তখন পর্যন্ত শবদেহকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করতে হতো যাতে শবদেহের সাথে প্রদত্ত অলঙ্কারসমূহ নিরাপদ থাকে। ইতিপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল। তাই থুতমস অন্য কিছু একটা ভেবেছিলেন।

পর্বতপ্রমাণ পিরামিড নির্মাণ করে তার মাঝে শবদেহকে রাখার পরিবর্তে তিনি প্রাকৃতিক পাহাড়কে নির্বাচন করেছিলেন। পর্বতের পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পর্বতের নিচে মাটির গভীরে মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেই কবরের সুরক্ষার সব রকমের ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। কবর-তস্করদের বোকা বানাবার জন্য কবরে প্রবেশের করিডর বানিয়েছিলেন গোলকধাঁধার আকারে। মূল্যবান রত্নসমূহ যেখানে রাখা হতো সেই প্রকোষ্ঠ সুরক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল এবং অনুরূপ প্রকোষ্ঠ আরও অনেকগুলি বানানো হতো। একটি সমাধি স্থাপন করা হয়েছিল মাটির গভীরে ৩২০ ফিট নিচে এবং সেখানে পৌছানোর আঁকাবাঁকা পথটি ছিল ৭০০ ফিট দীর্ঘ।

পাহাড়ের নিচের প্রথম সমাধিটি ছিল প্রথম থুতমসের, তবে পরবর্তী অন্তত আরও ষাটজন ফারাও এই পদ্ধতিটি অনুকরণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে উপত্যকাটি একটি মৃতের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। তবে এসব কিছুই কোনো কাজে আসেনি। ঘুরপাক খাওয়া সুড়ঙ্গপথ, ধূর্ত মেকি পথ, গুপ্ত প্রবেশপথ, শক্তিশালী তন্ত্রমন্ত্র কোনোকিছুই কাজে আসেনি। একটি ছাড়া সব কবরই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই তছনছ হয়ে যায়। যে একটি কবর আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকে সেটা কেবল দৈবক্রমে। পরবর্তী কবর খননের বালি পাথরের আবর্জনাস্তূপ আগেরটির প্রবেশপথ ঢেকে দিয়েছিল আর তাই পরবর্তী পঁয়ত্রিশ শতাব্দীব্যাপী আর কেউ সেই আবর্জনাস্তূপের দিকে দৃষ্টি দেয়নি।

প্রথম থুতমসের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েক শতাব্দীব্যাপী থিবিস ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মহান জাঁকজমকপূর্ণ এক নগরী। অপরিমেয় বাহুল্যময় রাজধানী জনমনে শুধু যে অহেতুক অহংকারের জন্ম দেয় তাই নয়, সম্ভাব্য শত্রুদের মাঝেও সমীহর সঞ্চার করে। এটাকে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধরূপেও গ্রহণ করা যায়।। আধুনিককালে তৃতীয় নেপোলিয়ন এই তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিলেন।

মহান রানি

প্রথম থুতমসের পরে আবির্ভাব হয়েছিল এক উল্লেখযোগ্য শাসকের। তিনি ছিলেন তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। প্রথম থুতমসের রাজত্বের শেষভাগে তিনি পিতার সাথে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন, আর নিজের হয়ে রাজত্ব করেন অতি অল্প সময়ের জন্য, যদি অবশ্য তেমনটা করার মোটেই সুযোগ হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শাসকরূপে আবির্ভাব ঘটেছিল এক নারীর, যিনি ছিলেন প্রথম থুতমসের কন্যা আর দ্বিতীয় থুতমসের স্ত্রী।

মিশরীয়দের একটা স্বাভাবিক প্রচলিত প্রথা ছিল নিজের ভগ্নীকে বিবাহ করা, যে প্রথাটি আমাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এনিয়ে হয়তো অনেক যুক্তি দাঁড় করানো যায়। এমনটা হতে পারে উত্তরাধিকার বর্তিত হতো কন্যার মাধ্যমে, পিতৃতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল, অথবা এমনটা হতে পারে তখন পর্যন্ত কৃষিকাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল নারীদের উপর (আর পুরুষদের দায়িত্ব ছিল শিকার করার), তাই ভূমির অধিকার বর্তাত নারীদের উপর। এই রীতি মিশরীয়রা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল বহু শতাব্দীব্যাপী, আর কন্যাকে বিবাহ করার পূর্ব পর্যন্ত রাজপুত্র কখনোই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেনি, কারণ কন্যাই ছিল প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

এমনও হতে পারে যে মিশরীয় রাজপুত্রকে অবশ্যই তাদের সমকক্ষকে বিবাহ করতে হবে– রাজগৃহ থেকে প্রায়ই যে উন্নাসিক প্রথাটির বিরোধীতা আসত। এধরনের একটা মনোবৃত্তি বর্তমানে ইউরোপীয় রাজপরিবারেও দৃষ্টিগোচর হয়। ইউরোপীয় রাজপরিবারে বিবাহ প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকে প্রথম কাজিনের মধ্যে। তবে গীর্জার ধর্মবিশ্বাসের কারণে সাধারণের মধ্যে এই প্রথাটির বিরোধীতা হয়ে থাকে। সীমিত সংখ্যার কারণে, রাজপরিবারের ব্যাপারে গীর্জার পক্ষ থেকে কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে।

এই গৌরবের যুগে মিশরীয় রাজপরিবারের সমকক্ষ আর কোনো পরিবার ছিলনা। উন্নাসিকতার কারণেই ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। যে ক্ষেত্রে পিতার একাধিক স্ত্রী থাকত, সেক্ষেত্রে সৎ ভাইবোন। দ্বিতীয় থুতমস তার সৎ বোন হাৎশেপসুতকে বিয়ে করেছিলেন। ১৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় থুতমসের মৃত্যুর পর তার এক রক্ষিতার পুত্র (হাৎশেপসুতের পুত্র নয়) তাত্ত্বিকভাবে তৃতীয় থুতমসের ফারাও হিসাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের কথা থাকলেও অল্প বয়সের কারণে শাসনকার্য চালাতে সক্ষম ছিলেন না এবং তার প্রতিনিধিরূপে সৎমা হাৎশেপসুতই সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাধর এক নারী, আর শীঘ্রই একজন ফারাওর সকল ক্ষমতাই গ্রহণ করে বসেন। তিনি যেসব স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছিলেন তাতে সর্বদাই তাকে একজন পুরুষের পোশাকে দেখা য়ায়, এমনকি তাতে কোনো স্তনের রেখা দেখা যায়না বরং মুখে কৃত্রিম দাড়িগোফই শোভা পায়। তিনিই ইতিহাসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নারী শাসক।

অবশ্য কৃত্রিম দাড়িতেই সবকিছু সমাধান হয়ে যায়না। তিনি দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করতে পারতেন না, তাই আশা করতেন তার সেনাধ্যক্ষরা এমনকি সাধারণ সৈন্যরাও তার অনুগত হয়ে চলবে। এই বংশের যুদ্ধময় ইতিহাসে তার রাজত্বকালই ছিল সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ আর তিনি তার রাজ্যকে লুটের দ্বারা নয় বরং শিল্পের দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন সিনাইয়ের খনি এবং চেষ্টা করেছিলেন মিশরের বাণিজ্য সম্প্রসারণে।

তিনি থিবিসের ওপারে এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যাতে তিনি পান্টের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্যসমূহ অঙ্কিত করান। যেসব দ্রব্য আমদানি করা হতো সেগুলি, এমনকি তার মধ্যে একটা চিতাবাঘ এবং কিছুসংখ্যক বানরও অন্তর্ভুক্ত ছিল (হাৎশেপসুত কি এগুলো পোষার জন্য এনেছিলেন নাকি তার কোনো চিড়িয়াখানা ছিল)।

চতুষ্কোণ স্তম্ভ (ওবেলিস্ক) সাধারণত নির্মাণ করা হতো সূর্যদেবতা রী'র প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। এগুলি দীর্ঘ পাতলা, উপরের দিকে সামান্য সরু সোজা করে স্থাপিত পাথরের স্তম্ভ এবং শীর্ষদেশ পিরামিডের মতো তীক্ষ্ণ। আদিতে উজ্জ্বল ধাতুর পালিশ দেওয়া ছিল যাতে পবিত্র সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হতে পারে (এতে প্রতিফলিত ছায়া সূর্যঘড়ির মতো সময় নিরূপণে সহায়তা করত নাকি?)। "ওবেলিস্ক" শব্দটা এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে যার অর্থ "সুচ"।

চতুষ্কোণ স্তম্ভ সর্বপ্রথম নির্মিত হয় প্রাচীন রাজবংশের আমলে, আর সে সময় এগুলি তেমন উঁচু ছিলনা। একক গ্র্যানাইট প্রস্তরখণ্ড কেটে মিশরীয়রা এই স্তম্ভ নির্মাণ করত, আর এগুলি যত দীর্ঘ হতে থাকে ততই এগুলি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এগুলি সূর্যঘড়ি হিসাবেই হোক বা স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবেই হোক, দশ ফিট উচ্চতাকেই উঁচু বলে গণ্য করা হতো।

মধ্য রাজবংশের আমলে যখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিড নির্মাণ করা হতো, তখন ওবেলিস্ক নির্মাণে বেশি শ্রম দেয়া সম্ভব ছিল। এগুলি স্থাপন করা হতো মন্দিরের সামনে, প্রত্যেক দরজার দুপাশে। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশপথেই ছিল এসব আকর্ষণীয় বস্তু। হেলওপলিস ছিল এসব স্তম্ভ দ্বারা সমৃদ্ধ। এগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল অগুনতি আর এগুলির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত হিয়ারোগ্লিফিকে উৎকীর্ণ ছিল সেইসব রাজার কীর্তিকাহিনী যার আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল আর ছিল রাজার ইচ্ছামতো আত্মপ্রশংসা। মধ্য রাজবংশের একটা ওবেলিস্কের উচ্চতা ছিল ৬৮ ফিট।

নূতন রাজবংশের আমলে যখন পিরামিড নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিল, তখন বিশাল উচ্চতার ওবেলিস্ক নির্মাণ একটা উন্মাদনায় পরিণত হয়। প্রথম থুতমস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ওবেলিস্ক নির্মাণ করেন যার উচ্চতা ছিল ৮০ ফিট, এরপর হাৎশেপসুতের নির্মিত স্তম্ভ দুটির প্রত্যেকটির উচ্চতা ছিল ৯৬ ফিট করে।

সর্বোচ্চ ওবেলিস্ক যা আজও টিকে আছে, সেই ১০৫ ফিট ওবেলিস্কটি নির্মিত হয় রোমে। আর একটি ৬৯ ফিট ওবেলিস্ক, যেটা তৈরি হয়েছিল হাৎশেপসুতের উত্তরাধিকারের আমলে, সেটা ১৮৮১ সালে নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে বয়ে আনা হয়। সেখানে এটা পরিচিতি লাভ করে মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত রানি ক্লিওপেট্রার নামানুসারে "ক্লিওপেট্রার সুচ" নামে যিনি রাজত্ব করেছিলেন ওবেলিস্কটি নির্মাণের প্রায় ১৫০০ পরে। লন্ডনেও রয়েছে আর একটা ক্লিওপেট্রার সুচ।

মিশরে যেসব ওবেলিস্ক নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র তিনটি, একটা হেলিওপলিসে আর দুটি থিবিসে। শেষের দুটির মধ্যে একটি প্রথম থুতমস আর অন্যটি হাৎশেপসুতের আমলে।

ওবেলিস্ক আধুনিক মানুষের কাছে একটা ধাঁধা হাজির করে। এগুলি ভীষণ ভারী, সবচেয়ে ভারীটির ওজন প্রায় ৪৫০ টন। এত ভারী একখণ্ড পাথর কিভাবে খাড়া করা হলো সেটা এক দুর্বোধ্য ব্যাপার, যদি সেকালে মিশরীয়দের আয়ত্তে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা বিবেচনায় নেওয়া হয়। এনিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, তবে মিশরতত্ত্ববিদরা এব্যাপারে একমত হতে পারেনি, এই একই ধাঁধার সম্মুখীন হতে হয় যখন ভাবি, ব্রিটনরা প্রাচীনকালে কিভাবে *স্টোনহেঞ্জ* উত্তোলন করেছিল, আর এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেই একই সময়ে, মিশরের সিংহাসনে যখন আসীন সম্রাট হাৎশেপসুত। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে পিরামিডের অনুকরণের চেষ্টা না করা হলেও, ওবেলিস্কের অনুকরণ করা হয়েছিল। এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৮৪ সালে ওয়াশিংটন স্তম্ভ যা নির্মাণ করা হয়েছিল জর্জ ওয়াশিংটনের স্মৃতির উদ্দেশে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ওয়াশিংটন স্তম্ভটি মিশরে তৈরি যে কোনো স্তম্ভের চাইতে বিশালাকার। এর উচ্চতা ৫৫৫ ফিট আর এ চতুষ্কোণ ভিত্তি প্রস্তরের প্রত্যেক পার্শ্বদেশ ৫৫ ফিট (এই পাঁচ সংখ্যাগুলি নেহায়েৎ কাকতালীয় নয়)।

যতই রাখঢাক করা হোক না কেন, ওয়াশিংটন মন্যুমেন্ট মোটেই একক প্রস্ত রখণ্ডে নির্মিত নয়, সাধারণ নির্মাণশৈলীর কারুকাজ আর মিশরীয়দের মতো মোটেই একক প্রস্তরখণ্ডের নিখুঁত নির্মাণকাজ নয়।

শীর্ষদেশ

১৪৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রানি হাৎশেপসুতের মৃত্যুর সময় তৃতীয় থুতমস প্রায় পঁচিশ বছরের যুবক আর নিজের তেজ ও সাহস দেখাবার জন্য উদগ্রীব। পরবর্তীকালে আমরা তাকে যেভাবে দেখি তাতে মনে হয়না তিনি তার ফুপু-সৎমার আচলবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। এতে বোঝা যায় মহিলাটি কী কঠোর প্রকৃতির ছিলেন যাতে তৃতীয় থুতমসের মতো একজন শক্তিমান ব্যক্তিকে কব্জায় রাখতে পেরেছিলেন।

নূতন ফারাও মহিলার প্রতি কতটা বিতৃষ্ণ ছিলেন আর রানি তার উপর কতটা নিপীড়ন চালিয়েছিলেন তা আর গোপন থাকেনা। হাৎশেপসুতের রেখে যাওয়া স্মৃতিচিহ্নগুলির প্রতি কতটা অসম্মান দেখিয়েছিলেন। তার নাম যত জায়গা থেকে মুছে ফেলা যায় সেটা তিনি করেছিলেন আর তার জায়গায় পূর্ববর্তী থুতমসের নাম বসিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তার মন্যুমেন্টটি অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, যা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় অসম্মান।

তারচেয়েও বড় কথা, যে সব ক্ষেত্রে রানি অনুজ্জ্বল ছিলেন সেখানে নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা– যেমন সামরিক ক্ষেত্র। এটাকে শুধু আত্মম্ভরিতা মনে করা ঠিক হবেনা, আবশ্যিকতাও বটে। সিরিয়ার পরিস্থিতি তার প্রপিতামহ প্রথম থুতমসের চাইতে অবনতির দিকে যেতে থাকে। একটা নূতন শক্তির উত্থান ঘটেছিল।

দুই শতাব্দী পূর্বে একটি অ-সেমিটিক জাতি হুরীয়রা উত্তর দিক থেকে উঠে এসেছিল। তখন সিরিয়ার সেমিটিক জাতিসমূহের উপর চাপ পড়েছিল আর তাই তারা হুরীয়দের দক্ষিণে মিশরের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল যাতে হিক্সস আধিপত্য নিরঙ্কুশ হতে পারে। এমনকি হুরীয় সেনাবাহিনীর একাংশ হিক্সস বাহিনীর সাথে মিশে গিয়েছিল।

তবে হুরীয়রা মূলত ইউফ্রেতিসের উজান অঞ্চলেই থেকে যায়, যেখানে তারা "মিত্তানী" নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের গোড়াপত্তন করে, যেটি ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস অঞ্চলের এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড। সিরিয়া মিশর সীমান্ত ঘাটিতে তাদের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। সেই অঞ্চলে মিশরীয় প্রভাবের উপর এটা ছিল এক বিপজ্জনক আশঙ্কা।

একজন শক্তিশালী রাজা হয়তো এর থেকে মুক্ত থাকার জন্য উত্তর সীমান্তে প্রতিরোধমূলক আক্রমণ চালাতে পারত, হাৎশেপসুতের শান্তির নীতি মিশরবাসীদের জন্য সুখকর হলেও দূর সীমান্তে বিপদের কালোছায়া ফেলেছিল।

তৃতীয় থুতমস ক্ষমতালাভের পর সিরিয়ার কেনানীয় রাজা ভেবেছিল এটাই মিশরীয় আধিপত্য খর্ব করার উপযুক্ত সময়। নতুন রাজা একজন নারীর ক্রীড়নক ছিলেন বলে তাদের মধ্যে ধারণা জন্মে তিনি যুদ্ধে তেমন সামর্থ্য দেখাতে পারবেন না, তাছাড়া তাদের পেছনে ছিল নূতন শক্তি মিত্তানী, যারা অর্থ ও সামরিক শক্তি দিয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিল।

তবে তৃতীয় থুতমস এর যোগ্য জবাব দিতে পেরেছিলেন। তিনি যুদ্ধযাত্রা করে সিরিয়ার "মেগিডো" শহরে কেনানীয়দের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হন। এই শহরটি বাইবেলে উল্লিখিত "আর্মাগেডন" শহর যেটা পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত যেরুজালেম শহরে পরিণত হয়। সেখানে থুতমস এক মহান বিজয় অর্জন করেন, তারপর ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে তার আরব্ধ কাজের সমাপ্তি টানেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেগিডোর ১২০ মাইল উত্তরে কাদিশ শহরে তার প্রতিপক্ষ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে তৃতীয় থুতমস ১৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাদিশ দখল করতে সমর্থ হন, যদিও এজন্য তাকে ছয়টি অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

কাদিশের উত্তরে আরও একটা ভয় ছিল আর তা হলো খোদ মিত্তানীর তরফ থেকে। তৃতীয় থুতমস আরও এগারোটি অভিযান পরিচালনা করেন আর তিনি ইউফ্রেতিস উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হন, ইতিপূর্বে যেমনটা করেছিলেন প্রথম থুতমস, তবে এবারের প্রতিপক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি ইউফ্রেতিস পার হয়ে যান, যেটা তার পিতামহ করতে পারেননি, এবং মিত্তানীয় রাজ্য আক্রমণ করেন। তার সব সাফল্যের মতো এবারও মিত্তানীকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন।

এটা মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য এক বিপুল গৌরবের বিষয়, আর এজন্য প্রথম থুতমসকে বলা হয় "থুতমস দ্য গ্রেট।" অথবা "মিশরের নেপোলিয়ন।" সামরিক সাফল্যই যদি সবকিছু হয়, তাহলে থুতমস একজন সফল জেনারেল হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকতেন। তবে রাজ্যের সুশাসন নিশ্চিত হওয়ায় মিশর এক সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশরূপে আবির্ভূত হয়। সেজন্য তৃতীয় থুতমসকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাও বলে অভিহিত করা হয়।

স্বয়ং শাসক হিসেবে ৩৩ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৪৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় থুতমসের মৃত্যু হয়। তিনি মিশরে যে গতির সঞ্চার করেন, সেই গতিতেই মিশর চলতে থাকে পরবর্তী পৌণে এক শতাব্দীব্যাপী আর এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ লক্ষে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় আমেনহোটেপ, চতুর্থ থুতমস, তৃতীয় আমেনহোটেপ, এরা সবাই থুতমস দ্য গ্রেটের পুত্র এবং পৌত্র ছিলেন এবং তারা সবাই মহান ফারাওর ঐতিহ্য সযত্নে লালন করেছিলেন। তারা অবশ্য সাম্রাজ্যের পরিসর বাড়াবার চেষ্টা করেননি, আর এটা করা অবশ্যই বিজ্ঞোচিত হতো না, কারণ ইতিমধ্যে মিশরের সীমানা এতদূর প্রসারিত ছিল, যে পর্যন্ত একটি দেশ নির্বিরোধে শাসন করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা এর বাইরে প্রসারিত করা সম্ভব ছিলনা।

চতুর্থ থুতমস সুচিন্তিতভাবে শান্তির নীতি অনুসরণ করেন এবং মিশরীয়দের বিচ্ছিন্নতার নীতি পরিত্যাগ করে এক মিত্তানীয় মেয়েকে বিবাহ করেন। তিনি তৃতীয় থুতমসের আরব্ধ সর্বশেষ ওবেলিস্কটির নির্মাণকাজ শেষ করেন, যে দৈত্যাকার বস্তুটি এখন রোমে বিরাজমান।

চতুর্থ থুতমসের মিত্তানীয় রানির পুত্র তৃতীয় আমেনহোটেপের আমলে মিশরের সমৃদ্ধি চরম শিখরে আরোহণ করে। তৃতীয় আমেনহোটেপ, যিনি ১৩৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সাইত্রিশ বছর ধরে মিশরের শাসনভার বহন করেন, বাইরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনার চাইতে তিনি দেশের ভিতরে বিলাসিতাকে প্রাধান্য দিতেন, মিশরবাসীও তার সাথে সেই বিলাসিতায় অংশীদার হতো। তার পূর্বসূরিরা অবিরাম চেষ্টা করত থিবিসের সৌন্দর্যবর্ধনে আর আমেনের মন্দির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রসারণে। তিনিও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন চারপাশের করদরাজ্যসমূহ থেকে যে অর্থ আসত সেই অর্থের সাহায্যে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মিত্তানী রানি "তি"কে তিনি খুব ভালোবাসতেন। বিস্তারিত শিলালিপিতে নিজের সাথে তিনি রানিকেও শামিল করেন আর নীল নদের পশ্চিম তীরে এক মাইল দীর্ঘ বিশাল এক হ্রদ খনন করান।

তার মৃত্যুর পর তার সম্মানার্থে এক চমৎকার মন্দির নির্মাণ করা হয় যার প্রবেশপথের দুপাশে তার দুটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়। সূর্যোদয়ের পরেই উত্তরের মূর্তিটা থেকে এক মধুর ধ্বনি নির্গত হতো। মনে হয় আমেনের পুরোহিতরা ভিতরে কোনো একটা কৌশল সংযোজন করেছিল যাতে সাধারণ মানুষকে অভিভূত করা যায়। আর এটা নিশ্চিত যে শুধু আমেনের ভক্তরাই অভিভূত হতো তাইনা, পরবর্তীকালে গ্রিক পর্যটকরাও চমকিত হতো।

প্রকৃতপক্ষে এসব অত্যাশ্চর্য মূর্তির কথা গ্রিকদের কাছে অনেক আগেই পৌঁছেছিল, কারণ তাদের অনেকেই কল্পকথায় আস্থা এনেছিল। একটি গ্রিক পুরাণকথায় ট্রয়ের যুদ্ধে (তৃতীয় আমেনহোটেপের আমলের দেড় শতাব্দী পরের ঘটনা) ইথিওপিয়ার এক রাজাকে ঘিরে একটি কাহিনী আছে, নীল নদের অনেক উজানের ইথিওপিয়া সে সময় মিশরের অধিভুক্ত ছিল। মেমনন নামের এই রাজাটি ট্রয়ের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, আর মনে করা হতো সে ছিল ঊষাদেবী "ঈয়সের" পুত্র। তিনি *একিলেসের* দ্বারা নিহত হন, আর মেমনন প্রতি প্রভাতে তার মাকে স্মরণ করে গান গাইত। এই মেমননই হয়তো তৃতীয় আমেনহোটেপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

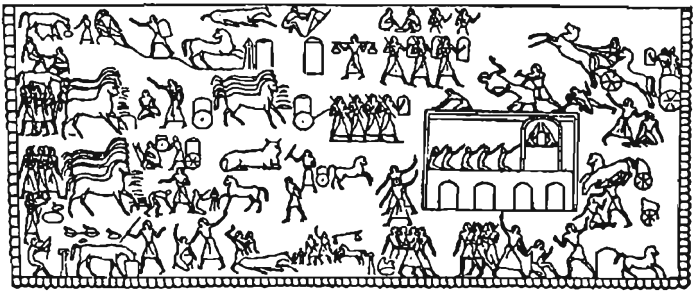

৬. সাম্রাজ্যের পতন

ধর্ম সংস্কারক

তৃতীয় আমেনহোটেপের স্ত্রী এবং চতুর্থ আমেনহোটেপের মাতা রানি "তি" মিশরের অনেক গৌরবের সাথেই আপোস করেন। তিনি এক মিত্তানীয় নারী হিসাবে মিশরের অনেক জটিল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তিনি তার সরল রীতিনীতির প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন।

তার স্ত্রৈণ স্বামী (যিনি নিজেও একজন অর্ধ মিত্তানীয় ছিলেন), তার কথার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। তবে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি, কারণ তার পক্ষে শক্তিধর মিশরীয় পুরোহিত যারা বহু শতাব্দীব্যাপী ধর্মভীরু মিশরীয় জনগণের কর্তৃত্ব করে এত শক্তিমান হয়ে উঠেছে যে এমনকি ফারাওরাও তাদের ঘাটাতে সাহস পেতনা।

তবে রানি "তি" অবশ্যই তার দলে কিছু লোক টানতে পেরেছিলেন, কারণ তৃতীয় আমেনহোটেপের রাজত্বের শেষ বছরগুলিতে নূতন ধর্মের নিশ্বাস কিছুটা অনুভূত হচ্ছিল। তবে "তি"র প্রথম ধর্মান্তরণ ছিল তার নিজ পুত্র, আর অন্যেরা তাকে অনুসরণ করেছিল এই প্রত্যাশায় যে "সঠিক ধর্ম" অনুসরণ করলে কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করা যাবে।

তৃতীয় আমেনহোটেপের জীবৎকালে তার পুত্র তেমন কিছু করতে পারেননি, তবে ১৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নূতন রাজা (জন্মসূত্রে তিন-চতুর্থাংশ মিত্তানীয়) তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া নূতন মতাদর্শ এবং তার সাথে স্বসৃষ্ট ধারণা সম্প্রচারে শক্ত অবস্থানে চলে গেলেন।

এমনকি তিনি তার নিজের নাম আমেনহোটেপ বদলে ফেললেন, কারণ এতে মিশরীয় দেবতা আমেনের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, যে দেবতাকে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কার বলে ভাবতে শুরু করেছেন। তার নিজস্ব দেবতা গৌরবমণ্ডিত সূর্য, যার পূজা তিনি শুরু করেন অমিশরীয় পদ্ধতিতে। তিনি তার পূজা করেন মোটেই দেবতা হিসাবে নয়, সচরাচর যেমন মানব বা কোনো প্রাণীর আকৃতিতে, বরং আপন রশ্মিতে ভাস্বর সূর্যগোলক যার উজ্জ্বল কিরণে পৃথিবীতে আলো আর উষ্ণতার সঞ্চারে প্রাণের উদ্ভব হয় (আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধারণাটা খুব অসঙ্গত নয়)।

তিনি এই গোলকটির নাম দেন "আতন" আর নিজের নামকরণ করেন "ইখনাতন" অর্থাৎ "আতনের সন্তুষ্টি"।

ইখনাতন নামে ইতিহাসে যার পরিচয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মিশরীয়দের উপর তার নিজস্ব বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া। ইতিহাসে তিনিই প্রথম ধর্মোন্মাদরূপে পরিচিত, যদিনা আমরা আব্রাহামের ঘটনাটা আমলে নিই, ইহুদি কল্পকথা অনুসারে যিনি তার আপন ধর্মবিশ্বাস প্রতিপাদনের জন্য তার নিজ শহর "উর" এর সব দেবতার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ইখনাতনের ছয় শতাব্দী পূর্বে।

ইখনাতন আতনের মন্দির নির্মাণ করেন আর তার নূতন দেবতার একটি পরিপূর্ণ পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এমনকি তিনি সূর্যদেবের চমৎকার একটি স্তোত্রও রচনা করেন, যেটা উৎকীর্ণ পাওয়া যায় তারই এক পারিষদের সমাধিতে। এতে করে ফারাওর সৃজনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর এই স্তোত্রটি বাইবেলের একটি স্তুতিগানের অবিকল অনুকৃতি।**

বাস্তবিক ইখনাতন আতনের এমনই অন্ধ-ভক্ত ছিলেন যে তিনি তাকে শুধু মিশরীয় দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করেই ছাড়েননি, বরং তাকে মিশরের প্রধান দেবতা বানিয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আতনই হবে মিশরের একমাত্র দেবতা আর অন্য সব দেবতাদের বিলোপ করতে হবে। এভাবেই ইতিহাসে তিনিই প্রথম একেশ্বরবাদীরূপে পরিচিতি লাভ করেন, যদিনা আব্রাহামকে আমরা একেশ্বরবাদীরূপে স্বীকার করি।

কেউ কেউ বিতর্ক তোলেন বাইবেলের মুসা ইখনাতনের সমসাময়িক। তাই মিশরীয় ফারাও মহান পয়গম্বরের কিছু কিছু ইহুদিতত্ত্ব তার ধর্মে অনুপ্রবেশ

** তুমি আছ আমার হৃদয়ে
আর কেউ নাই যে চেনে তোমাকে
ব্যতিত তোমার পুত্র...
পৃথিবীর আবির্ভাব তোমারই হাতে
তুমি আছ স্ব-মহিমায়
আমরা বাঁচি তোমারই করুণায়
তোমার দৃষ্টিতে রয়েছে পৃথিবী
যাদের উত্থান ঘটিয়েছ তোমার সন্তানের তরে
তোমারই শরীর থেকে যাদের নির্গমন:
রাজা... ইখনাতন...
প্রধান সহধর্মিণী... নেফারতিতি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটিয়েছেন। তবে তেমনটা না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি কারণ মুসা ইখনাতনের সময় জীবিত ছিলেননা, জীবিত ছিলেন অন্তত এক শতাব্দী পরে। একথা আমলে নিয়ে অনেকেই মনে করেন বরং মুসাই ইখনাতনের একেশ্বরবাদের ধারণা লাভ করেন এবং তাকে আরও মসৃণ করেন।

ইখনাতন মুসাকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন কি না সেটা অনুমানের বিষয় তবে তিনি মিশরীয়দের শিক্ষা দিতে সক্ষম হননি। থিবিসের পুরোহিতরা তাকে একজন ঘৃণ্য ধর্ম অবমাননাকারী আখ্যায়িত করে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে একজন ফারাও, যিনি যতটা না মিশরীয় তার চাইতে বেশি বিদেশি, হিক্সসদের সমতুল্য।

সন্দেহ নাই তারা লোকদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছিল। মিশরীয়রা বেড়ে উঠেছে মন্দিরের জাঁকজমক আর পুরোহিতদের ভীতিকর আচার অনুষ্ঠান দেখে। তারা চায়নি হঠাৎ বানোয়াট এক সূর্যগোলক এসে সেসব ওলটপালট করে দিক।

ইখনাতন সান্ত্বনা পেতেন তার দরবারে অন্তত সূর্যপূজা হচ্ছে। তার পরিবার ও পারিষদরা সূর্যপূজা করছে। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা তার স্ত্রী নেফারতিতি। তার স্বামী মহারাজের চাইতে আশপাশের লোকজন তাকে বেশি চিনত– শুধু একটিমাত্র অপকৌশলের মাধ্যমে। অপকৌশলটি এই "বিধর্মী" রাজার মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক রূপ নেয়। প্রাচীন রাজবংশের আমল থেকেই বিশেষ স্টাইলে নিজেদেরকে রূপায়িত করতে পছন্দ করত। মাথায় বিচিত্র মস্তকাবরণ, শরীর দৃশ্যমান সামনে থেকে, বাহুদ্বয় শক্ত করে দুপাশে শরীরের সাথে প্রলম্বিত, পদদ্বয়ও সুসজ্জিত। অঙ্গভঙ্গি প্রশান্ত গৌরবমণ্ডিত।

ইখনাতনের মাধ্যমে একটা নূতন বাস্তবতা সামনে এল। ইখনাতন আর নেফারতিতি এক অনানুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে সামনে এল, স্নেহের প্রকাশে শিশুদের সাথে ক্রীড়ারত। ইখনাতন যে একজন কুৎসিৎ চেহারার লোক ছিলেন সেটা ঢাকার কোনো চেষ্টা করেননি; তোবড়ানো চোয়াল, ফোলানো পেট আর স্থূল উরু। সম্ভবত ইখনাতন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতেন, যার কারণে যুবাবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

তবে সবচেয়ে সুন্দর শিল্পকর্ম, চুনা পাথরে অঙ্কিত একটি রঙিন আবক্ষ মূর্তি, যেটি ইখনাতনের রাজধানীতে এক স্থপতির কারখানা খননের সময় উদ্ধার করা হয়। এখন এটা সংরক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে।

আনুমান করা হয় এটা নেফারতিতির মূর্তি, আর এটাই মিশরীয় শিল্পের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত, যা আজও টিকে আছে। এর অসংখ্য অনুকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে আর অজস্র দর্শনার্থী ফটোগ্রাফ নিয়েছে। এটা মানব মনে মিশরীয় শিল্প সৌকর্যের অক্ষয় কীর্তিরূপে চির জাগ্রত হয়ে থাকবে। ভাগ্যের পরিহাস যে নেফারতিতি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন এশীয় রানি।

এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে ইখনাতন ও নেফারতিতির বিবাহটিকে আদর্শ বিবাহ বলা যায় না, আর সে বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত নেফারতিতি রাজার অসন্তোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে থাকতে চাননি আর তিনি হয় বিচ্ছেদ অথবা স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। থিবীয়দের অনমনীয় প্রতিরোধের মুখে বিচলিত ও হতোদ্যম হয়ে অবশেষে ইখনাতন মহান রাজকীয় নগরী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৩৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং তার পরিবার ও তার ধর্মমতে আস্থা স্থাপনকারীদের নিয়ে সেখানে চলে যান আর এই নূতন নগরী তার দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। তিনি থিবিস ও মেম্ফিসের মাঝামাঝি নীল নদের পূর্ব তীরের একটি স্থান নির্বাচন করেন, আর সেটাই তার রাজধানী "আখেতাতুন" (আতনের দিগন্ত)।

এই নগরে তিনি নির্মাণ করেন মন্দির, প্রাসাদ আর তার নিজের ও রাজকীয় পারিষদদের জন্য ভিলা। "আতনের" মন্দিরটি কোনো গতানুগতিক স্থাপনা ছিলনা, কারণ এটা ছিল ছাদবিহিন। তার আরাধ্য সূর্যদেব বাধাহীনভাবে এর ভেতর তার কিরণ বর্ষণ করতে পারত।

আখেতাতুনে ইখনাতন বাস্তব পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক জগতে বাস করতে শুরু করেন। এক কৃত্রিমতার মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন, তার ধর্মীয় মনোভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন আমেনের পুরোহিতদের উৎপীড়নের কাজে। আমেন নামাঙ্কিত সব স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলেন, আর দেবতা শব্দের বহুবচন বিলুপ্ত করেন।

ইখনাতনের একোন্মাদনা ধর্ম আর সবকিছু থেকে তার আগ্রহ লোপ করে দেয়। তিনি সামরিক ও বৈদেশিক বিষয়গুলিকে অবহেলা করতে শুরু করেন। এগুলি অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল, কারণ যাযাবর আগ্রাসীরা পূবদিক থেকে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল। সিরিয়া থেকে জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধিদের বার্তার পর বার্তা আসতে থাকে ইখনাতনের কাছে। তারা সেখানকার বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে আরও বেশি সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করে।

স্পষ্টতই ইখনাতন এসব অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। একজন সৎ শান্তিবাদী শাসক হিসাবে যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তার অনীহা। প্রকৃতপক্ষে তিনি অনুভব করেছিলেন যুদ্ধ বলতে একমাত্র ধর্মযুদ্ধই বোঝায়, আর অন্য সবকিছুই গৌণ। এমনকি তিনি এটাও ভেবেছিলেন, মিশর যদি কষ্টভোগ করে তাহলে সেটা তাদের সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুতির ফসল।

কারণ যাই হোক না কেন, মিশরীয়দের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভগ্যজনক অধঃপতন, আর পূর্ববর্তী শতাব্দীতে তৃতীয় থুতমস ও তার উত্তরসূরিদের রাজত্বকালে যে অর্জন ছিল, তা হারিয়ে গেল। ইখনাতনের রাজত্বকালেই সিরীয় সীমান্তে বিভিন্ন হিব্রু গোত্র জাতি গঠন করে। তারা হলো বাইবেলে বর্ণিত মোয়াব, আম্মন, এদম।

এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উপজাতি গোত্র যারা মিশরকে উত্যক্ত করার চাইতে বেশি কিছু করতে পারত না, তার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল উত্তরের এক মহান শক্তির উদ্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বদিকে এশিয়া মাইনরে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী একটি জাতি (বর্তমানে অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা এই ভাষা থেকে উদ্ভূত) শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বেবিলনীয় রেকর্ড অনুসারে তারা ছিল "হাত্তি," তবে বাইবেলে তাদের বলা হয়েছে "হিট্টাইট," শেষোক্ত নামেই সাধারণত তাদের পরিচয়।

সেই সময় যখন মিশর ছিল হিক্সসদের যাতাকলের নিচে, তখন হিট্টাইটরা একজন যোগ্য রাজার অধীনে, ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এটাই ১৭৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রাচীন হিট্টাইট সাম্রাজ্য। তবে মিতান্নিদের উত্থান, এই প্রাচীন সাম্রাজ্যে ফাটল ধরায়, আর হাৎশেপসুতের আমলে হিট্টাইটরা মিতান্নিদের করদরাজ্য ছিল।

তৃতীয় থুতমস মিতান্নিদের ক্ষমতা খর্ব করে দিলে হিট্টাইটদের আরও একবার সুযোগ এল। তারা তাদের হৃত প্রাধান্য পূনরুদ্ধারের সুযোগ পেল, তারা মিতান্নিদের পরাজয়ের সুযোগ নিয়েছিল।

১৩৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুব্বিলুলিউ নামে এক রাজা হিট্টাইট সিংহাসনে আরোহণ করেন। সতর্কতার সাথে তিনি রাজ্যের পুনর্গঠন করেন কেন্দ্রীয় শাসন এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে। ইখনাতন যখন মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি নিজে এবং সামগ্রিকভাবে মিশরীয়রা ধর্মীয় কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন সুব্বিলুলিউ সুযোগ পেয়ে যান। তিনি মিতান্নিদের বিরুদ্ধে এক কষ্টকর অভিযান পরিচালনা করেন, যখন মিতান্নিদের অবস্থান ছিল মিশরীয়দের মিত্ররূপে।

মিত্তানীয়রা মিশরীয় সহায়তার মুখাপেক্ষি ছিল, তবে সে সাহায্য কখনোই আসেনি। তাদের পতন দ্রুততর হয় আর পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার জায়গায় পত্তন হয় শক্তিশালী হিট্টাইট সাম্রাজ্যের, যা মিশরের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সংস্কার বিফল

১৩৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইখনাতনের মৃত্যু হয় আর তিনি ছয় কন্যা সন্তান রেখে যান, তার কোনো পুত্র সন্তান ছিলনা। তার মৃত্যুর পর তার দুই জামাতা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রাজত্ব করেন, আর এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কারকের অর্জন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন এসবের অস্তিত্বই ছিলনা, টিকে থাকে শুধু ধর্মীয় কোন্দল যা মিশরের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

ইখনাতনের ধর্মানুসারীরা আবার পূর্বের অবস্থানে চলে যায়। আখেতাতন নগরী ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, এবং এক দৈত্যের নিবাস আখ্যায়িত করে ধ্বংস করে ফেলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো ধর্মের পুরোহিতরা আবার শক্তি সঞ্চয় করে আর সবকিছু তাদের কব্জায় নিয়ে নেয়। ইখনাতনের দ্বিতীয় শাসক জামাতা তুতেনখাতন যিনি ১৩৫২ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৩৪৩ পর্যন্ত ফারাও হিসাবে দেশ পরিচালনা করেন, তিনি তার নাম বদল করে রাখেন তুতেনখামেন, যেহেতু আমেন প্রধান দেবতার স্বীকৃতি লাভ করে।

তবু ইখনাতনের এক প্রতিধ্বনি বর্তমান সময়েও শ্রুতিগোচর হয়। বহুপূর্বে বিলুপ্ত আখেতাতনের অবস্থানস্থলে বর্তমানে তেল-এল-আমার্না গ্রাম। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এক নারী কৃষক তিনশত মাটির ট্যাবলেট খুঁড়ে বের করে যাতে রয়েছে কিউনিফর্ম অক্ষরে লেখা (যে লিপি পুরাতত্ত্ববিদরা পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন)। এতে মিশর সম্রাটের প্রতি বেবিলনিয়া, আসিরিয়া ও মিতান্নির এশীয় রাজাদের কিছু বার্তা রয়েছে। তারা সম্রাটের কাছে যাযাবরদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে সতর্ক খনন কাজ শুরু হয়। আখেতাতন শহরটি এক বিরান ভূখণ্ডে নির্মিত হয় আর ইখতাতনের মৃত্যুর পর তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। তাই পরবর্তী নির্মাণকাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যাতে ইখনাতনের সংস্কার করা ধর্মের অপরিমেয় নমুনা সংগৃহীত হতে পারে। আরও মিলতে পারে সে সময়ের সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।

প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের প্রতিশোধস্পৃহা আর ইখনাতনের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার প্রয়াস এতই তীব্র ছিল যে আমরা যদি এই দলিলপত্র হাতে না পেতাম, তাহলে অনেক কিছুই আমাদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যেত। মিশরের ইতিহাস আর ধর্মচর্চার বিষয়ে অনেক কিছুই থেকে যেত অজানা। আমার্না লিপি মিশরে প্রাপ্ত রোজেট্টা পাথরের পরে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ইখনাতনের জামাতা তুতেনখামেন আরও এক মহাসম্পদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, আর সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন গুরুত্বহীন ফারাও। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর, আর মৃত্যুর সময়ও তিনি কৈশোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তৎসত্ত্বেও বেশ জমকালোভাবে তাকে সমাহিত করা হয়।

তার সমাধি অনতিবিলম্বে লুট হয়ে যায়, তবে অবাক কাণ্ড! লুটেরারা ধরা পড়ে যায় আর লুটের মাল ফিরিয়ে দিতে তাদের বাধ্য করা হয়। এমন একটা কথা চালু আছে যে রাজার প্রত্যাবর্তন প্রতিহত হওয়ার সংবাদেই লুটের কাজ বন্ধ হয়, তাই হয়তো এই কবর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। এর দুই শতাব্দী পরে যখন অন্য একজন ফারাওর জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছিল তখন পাথরের টুকরোগুলি দিয়ে এমনভাবে সমাধিটা ঢাকা পড়ে যায় যে তুতেনখামেনের কবরের সমাধিপথ ঢাকা পড়ে যায়।

ঢাকা পড়ার কারণে এটা অক্ষত থেকে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালের মধ্যেই সব পিরামিড এবং সব পাহাড়ী কবর তছনছ হয়ে যায়। কোনো রত্নভাণ্ডারই অক্ষত থাকেনি, শুধু তুতেনখামেনেরটা বাদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২২ সালে লর্ড কার্নার্ভন ও হাওয়ার্ড কার্টারের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে দৈবক্রমে এর সমাধিক্ষেত্রের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করেন, বিশাল বিপুল, চমকপ্রদ। মনোহারিত্ব ছাড়াও মিশরতত্ত্ব গবেষণায় এর অসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে "ফারাওর রহস্য" উন্মোচিত হয়, আর আবিষ্কারের ছয় মাসের মধ্যেই মশার কামড়ে সংক্রমিত হয়ে এবং নিউমোনিয়ার আক্রমণে লর্ড কার্নার্ভন মৃত্যুবরণ করেন। সানডে সাপ্লিমেন্ট এ নিয়ে ঝড় তুললেও মনে হয়না এর সাথে ফারাওর অভিশাপের কোনো সম্পর্ক আছে।

ইখনাতনের দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতার পরে যে অষ্টাদশ রাজবংশ মিশরে দুই শতাব্দীর গৌরব এনে দিয়েছিল তার বিপর্যস্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। তুতেনখামেনের উত্তরাধিকার লাভ করেন "আই" নামের এক ফারাও, যিনি ইখনাতনের বিশ্বাসের কিছু কিছু চালু করার চেষ্টা করেন তবে এর সুফল লাভ করতে পারেননি।

পুরোহিতরা আতন-পূজা উচ্ছন্নের চূড়ান্ত দায়িত্ব অর্পণ করে সেনাবাহিনীর উপর। জেনারেলরা সচরাচর রক্ষণশীল মনোভাবের হয়ে থাকে, যারা সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধীতা করে থাকে। এক্ষেত্রে মিশরের সামরিক মর্যাদার হানি ঘটায় তারা বিরক্ত ছিল।

"হোরেমহেব" নামের এক জেনারেল আই এর উত্তরসূরিরূপে ১৩৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফারাও হয়ে বসেন। যার নেতৃত্বে প্রাচীন পদ্ধতি পূর্ণ শক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ রাজবংশের কেউ ছিলেন না, তবে তাকে ঐ বংশের একজন বলেই গণ্য করা হয়, কারণ তিনি ইখনাতনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তার নিজ বংশের সূচনা ঘটাননি।

শৃঙ্খলা ফিরে এল এবং সাম্রাজ্যের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য নুবিয়ায় অভিযান পাঠানো হলো। তবে সিরিয়ার দিকে হাত বাড়ানো হয়নি। ১৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুব্বিলুলিউয়ের মৃত্যু হয় এবং পেছনে রেখে যান এক হিট্টাইট শক্তি হোরেমহেব যাকে ঘাটাতে চাননি।

১৩০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হোরেমহেবের মৃত্যু হয় এবং তার একজন জেনারেল প্রথম রামেসেস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি বেশ বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, আর মাত্র বছরখানেক রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। তবে তিনি তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছিলেন, আর তাই তাকে ঊনবিংশ রাজবংশের প্রথম রাজা বলে অভিহিত করা হয়।

তার পুত্র প্রথম "সেত্তি" উত্তরাধিকার স্বত্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আর এবার মিশর আবার পূর্ণ শক্তিতে পুনরাবির্ভূত হলো। তিনি সিরিয়া আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিলেন মিশরের শক্তিমত্তা, তবে হিট্টাইটরা তার শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল, আর শান্তির স্বার্থে তাদের সাথে আপোস করতে বাধ্য হলেন। তিনি লিবিয়ানদের উপরও বিজয় অর্জন করলেন, আর থিবিস এবং থিবিস থেকে প্রায় একশ মাইল ভাটিতে আবিডোসে বিশাল বিশাল মন্দির নির্মাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। তিনি পাহাড়ের ঢালে বিপুলায়তনের এক সমাধি নির্মাণ করেন যেখানে অষ্টাদশ রাজবংশের সম্রাটরা শায়িত (অবশ্য তাদের কবর যদি লণ্ডভণ্ড হয়ে না থাকত)।

হিট্টাইটরা তখনও সেখানে বহাল তবিয়তে আর তাদের মোকাবেলা করাটা বিশেষ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটাই ছিল প্রথম সেত্তি আর তার উত্তরাধিকারীর সবচেয়ে বড় সমস্যা, যে পুত্র সকল বাধাবিপত্তি এড়িয়ে এক মহান সম্রাটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিলেন।

মহান আত্মম্ভর

এই পুত্রটি হলেন দ্বিতীয় রামেসেস, যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন ১২৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সে সময় তিনি ছিলেন নেহায়েত এক নাবালক আর তার রাজত্বকাল দীর্ঘায়িত হয় ষাট বছর ধরে, যা শুধু দ্বিতীয় পেপি ছাড়া আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

এই রাজত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মশ্লাঘা। রামেসেসের ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ, আর মিশরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি নিজের কৃতিত্বের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মৃতিস্তম্ভে ছেয়ে ফেলেন, যাতে উৎকীর্ণ হয় তার কৃতিত্ব আর মহত্ত্বের বিবরণ। এমনকি তার পূর্বসূরিদের স্মৃতিস্তম্ভেও তার কীর্তিগাথা লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

তিনি বিশাল থিবিসের মন্দির কমপ্লেক্সে (যেটা এখন কার্নাকে) আরও কিছু সংযোজন করেন, ওবেলিস্কগুলির উচ্চতা বৃদ্ধি করেন, আর নিজের বিরাট বিরাট মূর্তি নির্মাণ করান। তার নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্সটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, অন্তত আয়তনের দিক থেকে। এই মন্দিরের হলঘরটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, ৫৪০০০ বর্গফুটের চাইতে বেশি, এর ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে ১৩৪টি পিলারের উপর যার কোনো কোনোটা ১২ ফিট পুরু আর ৬৯ ফিট উঁচু।

তার আমলে থিবিস উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে, নীল নদের উভয় তীরে বিস্তার লাভ করে। এর সীমানা প্রাচীর ছিল ১৪ মাইল দীর্ঘ, আর সভ্য জগতের সব প্রান্ত থেকে সম্পদ আহরণ করে এখানে পুঞ্জিভূত করা হয়। অন্য দেশের লোক যারা এসব দেখত বা এর কাহিনী শুনত, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত।

গ্রিক কবি হোমারের ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে রচিত মহাকাব্য ঈলিয়াডে থিবিসের উল্লেখ আছে (যিনি এটা রচনা করেন দ্বিতীয় রামেসেসের সময়ের অন্তত তিন শতাব্দী পরে), যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় দ্বিতীয় রামেসেসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই।

এতে দেখা যায়, হোমার বলছেন, যখন একিলেস সকল উৎকোচ প্রলোভন অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, "মিশরের থিবিসের সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদ যদি আমার পায়ে ঢেলে দেয়া হয়... যে থিবিসে স্তূপীভূত আছে পৃথিবীর সকল সম্পদ... যে থিবিসের একশত গেট দিয়ে একসাথে একশত অশ্বারোহী বের হয়ে আসতে পারে..."

তবে সময় সব কিছুকে জয় করে নেয়, আর বহু পূর্বেই থিবিস লুপ্ত হয়ে যায় আর জমকালো থিবিসের মন্দিরটি এখন ভগ্নস্তূপ– তবে ভগ্নস্তূপের মাঝেও চমকপ্রদ। রামেসেসের একটি মূর্তি, যেটি মিশরের সর্ববৃহৎ, সেটি এখন ভগ্নাবস্থায় ভূপাতিত। তার ভূপাতিত মস্তকটিই ইংরেজ কবি শেলিকে উজ্জীবিত করেছিল তার শ্লেষাত্মক কবিতা লিখতে:

অদ্ভুত এক ভিনদেশী পথিকের সাথে আমার দেখা
যে বলে: পাথরের দুটি বিশাল দেহহীন পদযুগল
মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে... তার কাছে, বালির উপরে,
অর্ধ নিমজ্জিত ভগ্ন মুখমণ্ডল, যার ভ্রূকুটি
আর বলিরেখ অধরোষ্ঠ আর শীতল কণ্ঠের গর্জন
জানান দেয় এর ভাস্কর তার আবেগ বুঝতে পেরেছিল,
এখনও যা জীবন্ত, নিষ্প্রাণ পাথরে অঙ্কিত,
যে হাত তাদের ব্যঙ্গ করেছিল, যে হৃদয় খাইয়েছিল:
যা খোদিত রয়েছে পাদপ্রস্তরে:
"নাম আমার অজিমান্দিয়াস, রাজার রাজা
তাকাও আমার কাজের দিকে, তুমি শক্তিমান, আর ভগ্নহৃদয়!"
পাশে আর কিছু নাই, চারপাশে
বিপুলায়তন ভগ্নস্তূপ, সীমাহীন শূন্যতা
নির্মল মসৃণ বেলাভূমি, দিগন্তে প্রসারিত।

কার্মাকই একমাত্র স্থান নয় যেখানে দ্বিতীয় রামেসেস আত্মপ্রসাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেক দক্ষিণে প্রথম প্রপাত থেকে ১২০ মাইল দূরে, যেখানে মিশরীয় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাতারা সচরাচর যেতে সাহস করেননি, সেখানেও তিনি এক বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন।

বর্তমানে যে স্থানটিতে আবু সিম্বেল গ্রাম, শতাব্দীর বিস্মৃতি কাটিয়ে সুইস আবিষ্কারক লুডভিগ ব্রাখার্ড ১৮১২ সালে খনন কাজ চালিয়ে অতীতের এক স্মরণীয় স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করেন। সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে দ্বিতীয় রামেসেসের বিশাল দুটি উপবেশনরত মূর্তি আবিষ্কার করেন, যার প্রতিটির উচ্চতা ৬৫ ফিট। সেখানে তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। এর সবগুলিই সূর্যদেব "রি"র মন্দিরের সাথে সম্পর্কিত। সূর্য-দেবতা রামেসেসের সবচাইতে শ্রদ্ধেয় দেবতা, আর ফারাওর নিজের নামের অর্থও "সূর্যের পুত্র"। মন্দিরটি এমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মিত যে সূর্য অবাধে মন্দিরের মধ্যস্থলে স্থাপিত রামেসেসের মূর্তির উপর তার কিরণ বর্ষণ করতে পারে।

১৯৬০ এর দশকে প্রথম প্রপাতের নিকটে এক বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছিল, আর সেই বাঁধের উজানে এক বিস্তৃত দীর্ঘ হ্রদ সৃষ্টি হওয়ার কথা। যদি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে আবু সিম্বেলের মন্দির ও বিশাল মূর্তিগুলি পানিতে ডুবে যাবে। প্রবল চেষ্টা ও বিপুল ব্যয়ে মন্দির কমপেক্সটি উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। রামেসেসের আত্মা সত্যি যদি এটা দেখতে পেত তাহলে নিশ্চয়ই পরম তৃপ্তিলাভ করত।

রামেসেসের আত্মপ্রশংসা এতই প্রবল ছিল আর এত দক্ষতার সাথে সেটা রূপায়িত করতে পেরেছিলেন যে মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে বলতেন "রামেসেস দ্য গ্রেট"। আমার মতে তাকে যদি বলা যেত "রামেসেস আত্মম্ভর" তাহলে সেটাই হয়তো যথার্থ হতো।

সামরিক দিক থেকে দেখতে গেলে ধারণা করা হয় দ্বিতীয় রামেসেস তৃতীয় থুতমসের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন, তবে ধারণাটা ভ্রান্ত। নিশ্চিত করে বলা যায়, চতুর্থ প্রপাত পর্যন্ত নুবিয়া মিশরের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, আর লিবীয়রা অবদমিতই রয়ে যায়, সিরিয়া এবং তার উত্তরে হিট্টাইট শক্তি অক্ষতই রয়ে যায়। তার শাসনের প্রথম দিকে দ্বিতীয় রামেসেস হিট্টাইটদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, আর ১২৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাদিশে এক ভয়ংকর যুদ্ধে তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে শহর থেকে এক শতাব্দী পূর্বে কেনানীয় মিত্রবাহিনী তৃতীয় থুতমসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিল।

যুদ্ধের ফলাফল অস্পষ্ট। একমাত্র যে বিবরণটি আমাদের হস্তগত, সেটা রামেসেসের দাপ্তরিক শিলালিপি। স্পষ্টতই মিশরীয় বাহিনী অপ্রস্তুতভাবে আটকা পড়ে আর হিট্টাইট অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পশ্চাদপসরণ শুরু হয়ে যায় আর রামেসেস ও তার দেহরক্ষী আক্রমণের শিকার হয়। হঠাৎ রামেসেস মরিয়া হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন, একাই শত্রুর মোকাবেলা করেন এবং তাদের ঠেকিয়ে রাখেন যতক্ষণ না সৈন্যদল ফিরে এসে তার শক্তিবৃদ্ধি করে। ফারাওয়ের এমন প্রবল মনোবলে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সৈন্যবাহিনী প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ শুরু করে দেয় আর হিট্টাইট বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

আমরা যদি এই কাহিনীকে অবিশ্বাস করতে চাই, তাহলে আমাদের মার্জনা করা যেতে পারে। রামেসেস নিজের সম্বন্ধে সব রকমের মিথ্যা বলতেই পারদর্শী ছিলেন, আর রামেসেসকে হারকিউলেস বা স্যামসনের ভূমিকায় দেখার প্রয়োজন নাই। এটা ভাবারও প্রয়োজন নাই যে কাদিসের যুদ্ধে মিশরীয়দের জয় হয়েছিল। এটা হওয়ার মোটেই সম্ভাবনা নাই কারণ হিট্টাইটরা এই যুদ্ধের পরও আগের মতোই শক্তিশালী ছিল কারণ এর পরেও সতর বছর ধরে তাদের সাথে মিশরীয়দের যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবদিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় কাদিসের যুদ্ধ ছিল একটি স্বপ্নের যুদ্ধ, আর তা না হলে হিট্টাইটদেরই একটি ক্ষুদ্র বিজয়। রামেসেসের সকল উন্মাদনা সত্ত্বেও ১২০৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটা শান্তিচুক্তি করতে পেরে মিশর অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, যেখানে ইউফ্রেতিস নদীর দক্ষিণের অঞ্চলে হিট্টাইটদের আধিপত্য মেনে নেয়া হয়, আর মিশরের সন্নিহিত সিরিয়ার ক্ষুদ্র এলাকার উপরই শুধু মিশরের আধিপত্য বজায় থাকে। একজন হিট্টাইট নারীকে রাজপরিবারে আনার মাধ্যমে চুক্তিটাকে স্থায়ীত্ব দিতে পেরে রামেসেস তৃপ্তি লাভ করেছিলেন, আর এর মাধ্যমে তার রাজত্বের শেষভাগটা শান্তিপূর্ণই কেটেছে।

কাজেই যদি ভাবা হয় দ্বিতীয় রামেসেস তৃতীয় থুতমসের গৌরবের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন তবে সে কথাটি ঠিক নয়। তৃতীয় থুতমস মিত্তানীদের পরাজিত করে করদ বানিয়েছিলেন আর রামেসেসের সময় সেখানে ছিল এক অপরাজেয় হিট্টাইট সাম্রাজ্য।

এতৎসত্ত্বেও এই দুই শক্তির মধ্যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ উভয়ের জন্যই মারাত্মক ছিল। দৃশ্যত তাদেরকে শক্তিমান মনে হলেও তারা বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল, আর তৃতীয় কোনো শক্তির দিক থেকে সামান্য আঘাত এলেই তারা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ত।

একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে দ্বিতীয় রামেসেস ছিলেন একজন "উৎপীড়ক ফারাও," বাইবেলের এক্সোডাস পর্বে এই কথাটির উল্লেখ আছে যে তিনি ইসরাইলিদের ক্রীতদাস বানিয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়ে নেন। এর একটা কারণ এই যে তিনি ইসরাইলিদের দ্বারা ফারাওর ধনভাণ্ডার "পিথম ও রামসেস" শহর নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটাকে সম্ভাব্য বলেই মনে হয়। উনবিংশ রাজবংশের উদ্ভব বদ্বীপের পূর্ব প্রান্ত থেকে। বাইবেলীয় পুরাণ কথা অনুসারে ইসরাইলিরা বাস করত "গোশেনে"। রামেসেস এদিকে দৃষ্টি দিবেন এটাই স্বাভাবিক। নীলনদ যেখানে সাগরে মিশেছে, সেখানে "তানিস" শহরে তিনি একটা মন্দির নির্মাণ করেন আর এর ভেতরে নিজের ৯০ ফিট উঁচু এক মূর্তি স্থাপন করেন আর নির্মাণ করেন সংরক্ষণাগার যার উল্লেখ রয়েছে বাইবেলে। এসব সংরক্ষণাগার কাজে লাগে হিট্টাইটদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার সময় রসদ সরবরাহে। সন্দেহ নাই রামেসেস এসব কাজে স্থানীয় লোকদের বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতেন।

দ্বিতীয় রামেসেসের দীর্ঘ রাজত্বকাল মিশরবাসীর জন্য কল্যাণকর ছিলনা, যেমনটা ছিলনা দ্বিতীয় পেপির রাজত্বকাল। সমৃদ্ধ স্বস্তিকর নগরজীবনে থেকে মিশরবাসীরা বিপজ্জনক সৈনিক জীবনে যেতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলনা যেখানে অর্থের বিনিময়ে বহিরাগতদের সৈনিক হিসাবে পাওয়া সহজ ছিল। শাসকদের কাছেও স্বদেশীদের চাইতে ভাড়াটিয়া সৈন্যই বেশি পছন্দনীয় ছিল, কারণ স্বদেশী সৈন্যরা বিদেশে যুদ্ধে যাওয়ার চাইতে দেশের অভ্যন্তরে অসন্তোষ দমনেই বেশি উৎসাহ দেখাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে দুটি বড় প্রতিবন্ধকতা অনেক সুবিধাকেই ম্লান করে দেয়। প্রথমত যদি কখনো দেশ সংকটে পড়ে আর ভাড়াটিয়া সৈন্যদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সেই সৈন্যরা মহা আনন্দে হাতের কাছে যা পাবে তাই লুটপাট করে নেবে, আর তখন তারাই দেশবাসীর কাছে বিদেশি আক্রমণকারীদের চাইতে বড় বিপদ হয়ে দেখা দেবে। দ্বিতীয়ত শাসক যখন যুদ্ধ পরিচালনা ও নিজের সুরক্ষার জন্য ভাড়াটিয়া সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তখন তিনি সেসব সৈন্যদের হাতের পুতুলে পরিণত হন, আর তখন তিনি এক মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নন। ইতিহাসে এমনটা বারবার ঘটেছে।

গৌরবের সমাপ্তি

১২২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় রামেসেসের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে, মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল প্রায় ৯০ বছর। একটা উপযুক্ত সময়েই তার মৃত্যু। তার রাজত্বের বিস্তৃতি সর্বকালের সর্ববৃহৎ, আর তার সবচেয়ে বড় শত্রু দৈবক্রমে দুর্বল অবস্থায় ছিল। এটা মিশরের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় ঘটেনি, বরং অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর গৃহযুদ্ধের ফসল। সে সময় মিশর সমৃদ্ধ, সম্পদশালী আর শান্তিময়। অগণিত পত্নী আর উপপত্নীর এক দঙ্গল পুত্রকন্যা রেখে যান তিনি।

রামেসেসের ত্রয়োদশ পুত্র মার্নেপ্টা তার উত্তরাধিকার লাভ করেন। ইতিমধ্যেই মার্নেপ্টার বয়স ষাট বছরে পৌছে গেছে, আর তিনি তার পিতার নিয়মনীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। তিনি মিশরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিরীয় অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। আর সেটা করতে গিয়ে প্রথমবারের মতো ইতিহাসে ইসরাইল নামটা উঠে আসে।

স্পষ্টতই, ইখনাতনের শাসনকালের মতো পূর্বদিকের কেনানীয় শহর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মরু যাযাবররা ছুটে আসতে থাকে। এই জাতিগুলিই ইতিহাসে ইসরায়েলি নামে অভিহিত। তারা দেখেছিল কেনানীয় শহরগুলি মোয়াব, এদন ও আমন রাজ্য পরিবেষ্টিত, ইখনাতনের আমলে যারা ইসরায়েলিদের সমগোত্রীয় ছিল। প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলি নবাগতদের বিরোধীতা করে। আপাতদৃষ্টিতে মার্নেপ্টার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে অংশ নেয় এবং বিজয় লাভ করে। মার্নেপ্টার লিপিতে এই নিয়ে গর্ব করা হয় যে "ইসরাইলিদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয় আর তাদের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হয়"। অবশ্য এই কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, আর মিশরীয় লিপিতে এধরনের অতিরঞ্জন অস্বাভাবিক নয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় লিডিয়াতে মার্নেপ্টার অভিযান সফল হয়েছিল– তবে বজ্রাঘাত নেমে এল অপ্রত্যাশিত এক দিক থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয়রা যে দিকটাকে সুরক্ষিত ভেবেছিল সেই সমুদ্রের দিক থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

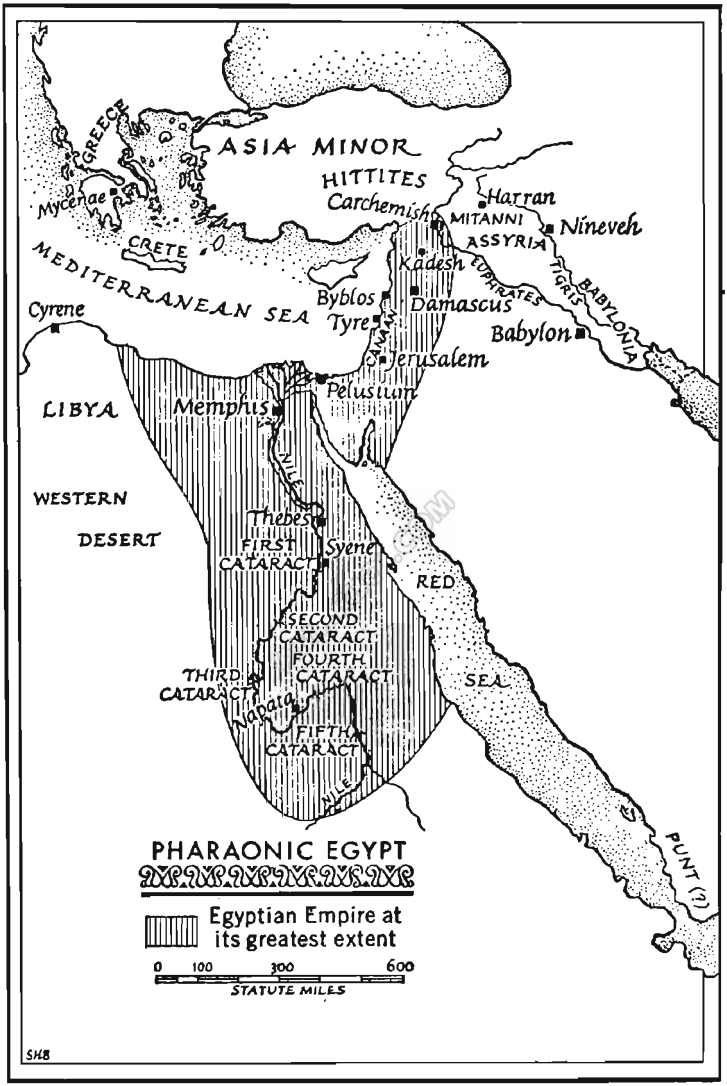

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরীয়রা কখনোই সমুদ্রগামি জাতি ছিলনা, আর সমুদ্রগামি ক্রিটীয়দের তরফ থেকে কখনোই অশঙ্কা দেখা দেয়নি। ক্রিটীয় সভ্যতার দ্যুতি সর্বদা উত্তরে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দিকে প্রতিফলিত হয়, ইউরোপের সেই অঞ্চলে এখন যেখানে গ্রীস। মিশরে হিক্সস আধিপত্যের সময়ে গ্রিক্ ভাষাভাষী জনগণ মূল ভূখণ্ডে নিজেদের সুন্দর উন্নত শহর নির্মাণ করেছিল, আর সেক্ষেত্রে তারা ক্রিটীয় ধারা অনুসরণ করেছিল।

যেখানে ক্রিটীয়রা সবসময় সমুদ্রনির্ভর বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল এবং শান্তির পথ অনুসরণ করেছিল, মূল ভূখণ্ডে গ্রিকরা ছিল তার বিপরীত। তারা যেমন প্রায়ই তীব্র লড়াইয়ে নিয়োজিত ছিল তেমনি উত্তর থেকে লড়াকু জাতির আক্রমণের আতঙ্কে থাকত। তাদের শহরের চারদিকে থাকত অত্যন্ত পুরু দেয়ালের প্রাচীর যাকে বলা হতো "মাইসেনি"। তাই গ্রিক সভ্যতার আদি পর্বকে বলা হতো মাইসেনীয় যুগ।

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত থাকার কারণে মাইসেনীয়রা উচ্চমাত্রার সামরিক কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিল, আর জাহাজ নির্মাণ করে সমুদ্রে প্রবেশাধিকার অর্জনের পর, ক্রীটবাসীরা আর তাদের মোকাবেলা করতে পারেনি, আর মিশর যখন অষ্টাদশ রাজবংশের অধীনে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে, তখন মাইসেনীয় জলদস্যুরা ক্রীট আক্রমণ করে দখল করে নেয়।

তবে এসব অনেক দূরের ঘটনা, আর লবণ সমুদ্র পার হয়ে তাদের মিশরে পৌছানো দূরাগত সম্ভাবনা। মিশরীয় সাম্রাজ্যের সোনালি দিনগুলিতে তাদের নিয়ে কেউই তেমন চিন্তিত ছিলনা, মাইসেনীয়দের ক্রীট দখলের দুই শতাব্দী পরেও মিশর নিরাপদেই ছিল। এই পরিস্থিতি আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত, তবে মাইসেনীয়রা নিজেরাই উত্তরের দিক থেকে চাপের মুখে ছিল। আরও উত্তরের গ্রিক ভাষাভাষী উপজাতীয় লোকেরা ক্রিটীয় সভ্যতার কোমল মনোভাব আয়ত্ত করতে পারেনি। আর তাদের শক্ত মনোভাবের প্রধান উপাদান ছিল লৌহ।

বিগত দু'হাজার বছর ধরে অস্ত্র বানাবার উপাদান ছিল ব্রোঞ্জ, যদিও শক্ত বর্ম বানাতে লোহা ব্যবহার করা হতো। তবে সমস্যা লোহা ছিল এক দুষ্প্রাপ্য ধাতু, যা শুধু হঠাৎ উল্কাপাতের মাধ্যমেই লাভ করা যেত। আর এটা মোটেই সহজলভ্য ছিলনা। এর জন্য প্রয়োজন হতো অনেক বেশি তাপমাত্রার অগ্নিশিখা আর উন্নত কৃৎকৌশল।

মাইসেনীয়দের জন্য যখন উত্তরের আগ্রাসকদের সামাল দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল, তখন তারা দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করল। ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মেনেন্টার রাজত্বকালে, অথবা তার সামান্য কিছু পরে, যা মাইসেনীয়দের পূর্বদিকে হটিয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছিল। অন্যান্য জলদস্যুরা দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি দিয়ে লিবীয় উপকূলে অবতরণ করেছিল। লিবীয় উপজাতিগোষ্ঠীর অত্যুৎসাহী সহায়তায় তারা মিশরীয় ভূমির দিকে অভিযান চালাতে শুরু করে। গ্রিক কল্পকথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায় স্পার্টার রাজা মেনিলাউস, ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে কিছুদিন মিশরে অবস্থান করেছিলেন– এটা মিশর উপকূলে বিদেশি শোষণের একটা ধূসর স্মৃতি

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল তখন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। হিট্টাইটরা যখন আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে মগ্ন তখন পশ্চিম এশিয়ার একটি জাতি ফ্রিজিয়ানরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিয়ৎকালের জন্য সভ্যতার দৌড়ে হিট্টাইটরা মিশরীয়দের সাথে পাল্লা দিচ্ছিল, এবার তারা ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল (তবে একটি হিট্টাইট শহর দুই শতাব্দী পরেও টিকে ছিল সিরিয়ায়, আর ইসরাইলের রাজা ডেভিডের এক সেনাপতি হিট্টাইট উরিয়াকে, সেখানে দেখা যায়)।

সমুদ্রচারী এসব জাতির আক্রমণে মিশর লণ্ডভন্ড। তবে হিট্টাইটদের মতো মিশরীয়রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি কিন্তু এদের বিতাড়িত করতে গিয়ে এতই শক্তিক্ষয় হয়েছিল যে তাদের চরণ টলোমলো আর চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তারা আর কখনোই পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে মার্নেপ্টাই "এক্সোডাসের ফারাও, " মুসা নবীর অভিশাপে যার উপরে প্লেগ অবতীর্ণ হয়, আর যিনি লোহিত সাগরে ডুবে মরেন। এটা সত্য হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সমুদ্রচারীদের দিক থেকে একটা বিপর্যয় অবশ্যই নেমে এসেছিল।

প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলার সময়ে এশীয় আক্রামকরা সেই সুযোগ নিয়ে থাকতে পারে। তবে বাইবেলীয় কাহিনীকে অনেকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেও প্রাচীন মিশরীয় এমন কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়নি যেখানে দাসত্বপ্রাপ্ত কোনো ইসরাইলিদের বিবরণ পাওয়া যায়, অথবা মুসার আমলের কোনো প্লেগের বিবরণ। কোনো ফারাও সমুদ্রে ডোবার কথাও দেখা যায়না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. বিদেশি আধিপত্য

লিবীয়গণ

১১৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় রামেসেস মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরাধিকারী (শিথিল রাজকীয় বংশধারার) চতুর্থ থেকে একাদশ রামেসেসের সবাই ছিল দুর্বল, গুরুত্বহীন। রামেসেস উত্তরাধিকারীদের আশি বছরের (১১৫৮-১০৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) শাসনামলে একটি ব্যতিত থিবিসের প্রায় সবগুলি কবর লুণ্ঠিত হয়ে যায় এমনকি দ্বিতীয় রামেসেসের সমাধির মূল্যবান সম্পদগুলিও চুরি হয়ে যায়। ১১৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ষষ্ঠ রামেসেসকে কবরস্থ করার সময় উৎক্ষিপ্ত আবর্জনার নিচে কাকতালীয়ভাবে দুই শতাব্দী পূর্বে টুতেনখামেনের সমাধিটি ঢাকা পড়ে যায় এবং আধুনিককাল পর্যন্ত অবিকৃতভাবে টিকে থাকে।

ফারাওদের ক্ষমতার অবনতি ঘটার সাথে সাথে পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছিল। ইখনাতনের উপর পুরোহিতদের কর্তৃত্বলাভ মিশরীয় রাজমুকুটকে ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলে। এমনকি দ্বিতীয় রামেসেসকেও সতর্কভাবে পুরোহিতদের অধিকারকে সম্মান দেখাতে হয়েছিল। নবম এবং দশম রাজবংশের শাসনকালে অধিকহারে কৃষিভূমি, কৃষক এবং সম্পদ ফারাওদের আয়ত্তে এসেছিল। পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ধর্ম অধিকতর অনমনীয় ও রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। এটা জাতির জন্যে মোটেই হিতকর ছিলনা।

রামেসেস বংশের শাসকরা পুরোহিতদের হাতের পুতুল ছিল। তাদের হয়তো স্মরণ ছিল হিক্সসদের আধিপত্যের সময় আমেনের পুরোহিতরা উজান মিশরের থিবিস শাসন করত। শেষ পর্যন্ত ১০৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন একাদশ রামেসেসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু হয় তখন সিংহাসনে আরোহণের জন্য তার কোনো প্রত্যক্ষ উত্তোরাধিকরী ছিল না। তৎপরিবর্তে আমেনের প্রধান পুরোহিত যিনি সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন, তিনি নিজেকে মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। অবশ্য তিনি অখণ্ড মিশরের শাসক হতে পারেননি।

ব-দ্বীপ অঞ্চলে দ্বিতীয় একপ্রস্ত শাসকের উত্থান ঘটে যাদের রাজধানী ছিল দ্বিতীয় রামেসেসের নিজ শহর তানিসে। মানেথো তাদের *তানিও* বংশ বলে উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে একবিংশ রাজবংশের মর্যাদা দেন। এ সময় মিশর পূর্বের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ে কারণ মিশর ছিল বিভক্ত। আর এক হাজার বছর পূর্বে মেনেসের প্রচেষ্টা বিফলে পরিণত হয়।

একবিংশ রাজবংশের শাসনামলে সিরিয়ার সাথে রশি টানাটানি শেষ হয়। ইসরাইলিরা জুডীয় যোদ্ধা ডেভিডের মধ্যে তাদের নেতাকে খুঁজে পায় আর তার নেতৃত্বে ফিলিস্তিনিরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং আশেপাশের ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠীগুলি তাদের পদানত হয়। এটা ইতিহাসের এমন এক মুহূর্ত যখন নীল ও ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস উভয় এলাকায় দুর্বল সময় অতিক্রম করছিল। কাজেই ডেভিড এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং তিনি এক ইসরাইলি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন যা সিনাই উপদ্বীপ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। এমনকি উপকূলবর্তী কেনানিও নগরসমূহ, যদিও তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করছিল তারা সতর্কভাবে ডেভিড এবং তদীয়পুত্র সলোমনের অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিল।

ডেভিড ও সলোমনের রাজত্বকালে একবিংশ সম্রাটদের শাসনে খণ্ডিত মিশর অপেক্ষা ইসরায়েল অধিকতর শক্তিশালী ছিল। মিশর ইসরায়েলের সাথে মিত্রতা করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং ফারাও তার এক কন্যাকে সলোমনের হারেমে পাঠিয়ে দেন। এই ফারাওটির নাম বাইবেলে উল্লেখ নাই, তবে যেহেতু ৯৭৩-৯৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সলোমনের রাজত্বকাল সেহেতু অনুমান করা যায় ফারাওটি ছিলেন দ্বিতীয় সুসেনিস, যিনি এই রাজবংশের সর্বশেষ রাজা।

দ্বিতীয় সুসেনিসের অনেক সমস্যা ছিল। বংশ পরম্পরায় মিশরীয় সৈন্যদের দুর্বলতা অত্যধিক ভাড়াটিয়া নির্ভরতা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে লিবীয় দলপতিদের অধীনে। এটি একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার যে ভাড়াটিয়া সৈন্যদের আধিক্য তাদের দলপতিদের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয় এবং মাঝে মাঝে এই ভাড়াটিয়া সেনাধ্যক্ষরা সরকারের উপর প্রভাব খাটায় এবং অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় সুসেনিসের আমলে লিবীয় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন *শেশংক*। তার সমর্থন সুসেনিসের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। শেশংক রাজ-পরিবারকে বাধ্য করেন তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে। শেশংকের পুত্রের সাথে ফারাও-এর কন্যার বিবাহ হয়। এটা ছিল এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এতে করে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেনাধ্যক্ষটির সিংহাসন অধিকারের একটি মতলব ছিল। সম্ভবত সুসেনিস তার আরও এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যাকে সলোমনের হাতে দিয়েছিলেন এই আশায় যে, ইসরাইলিদের সমর্থনে জেনারেলের বাড়াবাড়ি রোধ করা যাবে। এক্ষেত্রে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। ৯৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন দ্বিতীয় সুসেনিসের মৃত্যু হয় তখন শেশংক অবাধে সিংহাসন দখল করে নিল। কে তাকে বাধা দেয়?

নতুন ফারাও প্রথম শেশংক হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাকে দ্বাবিংশ রাজবংশের প্রথম সম্রাট বলে গণ্য করা হয়। মাঝে মাঝে এই রাজবংশকে লিবীয় রাজবংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সত্যিকারভাবে লিবীয়রা কখনোই মিশর জয় করতে পারেনি। আর যে সব লিবীয় সৈন্য মিশর অধিকার করেছিল তারা প্রকৃতপক্ষে মিশরীয় হয়ে গিয়েছিল। শেশংক তার রাজধানী স্থাপন করেন তানিসের পঁয়ত্রিশ মাইল উজানে *বুবাস্তিস* নামক স্থানে। তিনি পুনর্বার থিবিস দখল করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনেন। একশ পঁচিশ বছর পরে মিশর আবার অখণ্ড শক্তিতে পরিণত হল। শেশংক থিবিসকে নীল উপত্যকার সাথে যুক্ত করার জন্য তার নিজ পুত্রকে আমেনের পুরোহিত নিযুক্ত করেন।

এরপর তিনি ইসরাইলের দিকে দৃষ্টি দেন। সম্ভবত ইসরাইলের সাথে তার পূর্বসূরির মিত্রতা তিনি ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি। প্রথমেই তিনি আক্রমণ না করে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন। উত্তর ইসরাইলিরা জুডিও বংশের শাসন পছন্দ করত না এবং তারা বিদ্রোহের চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। তবে এর নেতা *জেরোবোয়াম* শেশংকের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ৯৩৩ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে সলোমনের মৃত্যুর পর শেশংক জেরোবোয়ামকে ইসরাইলে ফেরত পাঠান এবং নতুন করে একটি বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে।

ডেভিড ও সলোমনের স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্য চিরতরে ভেঙ্গে পড়ে। বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতর উত্তর অংশ ইসরায়েল নামটি ধরে রাখে। তবে যিনি এর রাজা হন তিনি ডেভিডের বংশধর ছিলেন না। যেরুজালেমকে কেন্দ্র করে দক্ষিণের ক্ষুদ্রতর রাজ্যটি ছিল জুডা। যেখানে ডেভিডের বংশধর পরবর্তী তিন শতাব্দী যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

শেশংক তার সামনে দেখতে পেলেন সংকুচিত এক জুডা বিদ্রোহের কবলে বিপর্যস্ত। আর তিনি এক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। তৃতীয় থুতমস এবং দ্বিতীয় রামেসেসের মতো তিনি সিনাই থেকে অভিযান শুরু করলেন। তবে এবার শক্তিশালী মিত্তানী বা হিট্টাইটের মতো শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়নি। ইতিহাসের এই পর্যায়ে মিশরের তেমন সাহস ছিল না। জুডার মতো একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকেই তিনি সামাল দিতে পেরেছিলেন। ৯২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শেশংক জুডা আক্রমণ করলেন যার ফলাফল বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে (শেশংককে এখানে *শিশাক* নামে অভিহিত করা হয়)। তিনি যেরুজালেম অধিকার করেন, সেখানকার মন্দির লুটপাট করেন এবং কিছুকালের জন্য জুডাকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নিজেকে বিজয়ী বলে অনুভব করে থিবিসে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। যেখানে তার বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি কার্মাকের মন্দিরও সম্প্রসারিত করেন এবং সেখানে তার সাম্রাজ্যের সাফল্যের কথা খোদাই করান।

শেশংক শুধু তার বংশের প্রথম রাজাই ছিলেন না একমাত্র তিনিই প্রকৃত সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। তার উত্তরাধিকারী প্রথম *অর্সকন* ৯১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি মিশরকে যথেষ্ট সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ দেখতে পান। তবে তিনি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ধরে রাখতে পারেননি। ৮৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যুর পর অবসম্ভাবী অধঃপতনের শুরু হয়।

সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আর এর সেনাধ্যক্ষরা হাতের কাছে যা পায় লুট করে নেয়। ৭৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে থিবিস বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানেথ এখানকার রাজাকে ত্রয়োবিংশ রাজবংশ বলে উল্লেখ করেন। এই ছিল তৎকালে মিশরের দুরবস্থা।

নুবীয়গণ

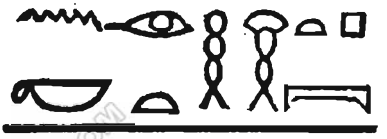

নতুন সাম্রাজ্যের অধীনে নুবিয়া প্রকৃতপক্ষে ছিল মিশরের একটি দক্ষিণ সম্প্রসারণ। সে যুগের সকল পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় তা ছিল সম্পূর্ণরূপে মিশরীয় চরিত্রের। এর কয়েক শতাব্দী পর মিশরের অবক্ষয়ের সময় নুবিয়া সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে বহুধাবিভক্ত মিশর এবং বিবদমান থিবিস প্রথম প্রপাতের ওপারে মিশরকে ধরে রাখতে পারেনি। এতে করে নুবিয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির অধিকারে চলে যায়।

দৃশ্যত তারা চতুর্থ প্রপাতের সামান্য নিচে *নাপ্টাকে* তাদের ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করে। এই শহরটি প্রকৃতপক্ষে মিশরীয় শক্তির সীমা নির্দেশ করে (তৃতীয় থুতমস সেখানে একটি শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন)। মিশরীয় প্রভাবের নমনীয়তা সত্ত্বেও এত দূরের অঞ্চলকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

তবে নুবিয়াতে মিশরীয় সংস্কৃতি টিকে ছিল। যখন শেশংক থিবিস অধিকার করেছিলেন তখন আমেনের একদল পুরোহিত নাপ্টায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে তাদের স্বাগত জানানো হয়েছিল। সন্দেহ নাই তারা সেখানে নির্বাসিত সরকারের মতো কাজ করেছিল এবং নুবীয় রাজাদের মিশর আক্রমণে তাগিদ দিত, যাতে তাদের রাজকীয় পৌরহিত্যের অধিকার বজায় থাকে।

প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের প্রভাবেই ধর্মীয় দিক দিয়ে নুবিয়া মিশরের চাইতে অধিক মিশরীয় হয়ে দাঁড়ায়, আমেন পূজায় অধিকতর রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। বিজয়ের মধ্যদিয়ে গৌরব অর্জন স্থানীয় রাজাদের একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরব অর্জনের মাধ্যমে ধর্মকেও সুরক্ষিত করা যাবে। ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ নুবীয়রা উত্তরদিকে অভিযান শুরু করে।

বিজয় অর্জন তেমন কঠিন ছিল না। কারণ বহুধাবিভক্ত মিশর সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। নুবীয় শাসক *কাশ্‌তা* অনায়াসেই থিবিস দখল করে নেন এবং নির্বাসিত পুরোহিত বংশধরদের সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়। কাশ্‌তার উত্তরাধিকারী *পিয়াংখি* ৭৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হন, একেবারে ব-দ্বীপের অভ্যন্তরে। তাকে নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা হিসাবে গণ্য করা হয় (তার নিজের দেশ ইথিওপিয়ার নাম অনুসারে ইথিওপীয় বংশ)। কিছুদিনের জন্য জনাদুয়েক মিশরীয় শাসক ব-দ্বীপের একাংশে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। মানেথো এই মিশরীয়দের চতুর্বিংশ এবং নুবীয় বিজয়ীদের পঞ্চবিংশ রাজবংশরূপে গণ্য করেন।

পিয়াংখির ভাই শাবাখা ৭১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং নাপ্টা থেকে অধিকতর গৌরবময় থিবিস নগরে তার রাজধাণী স্থানান্তর করেন।

ইথিওপীয় রাজবংশকে বহিরাগত মনে করা ঠিক হবে না। নিশ্চিত করে বলা যায় এ বংশের রাজারা মিশরের মূল ভূখণ্ডের বাহিরের তবে লিবীয় রাজবংশের মতোই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পুরোপুরি মিশরীয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় একটি নতুন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটছিল যা প্রাচীন মিত্তানী ও হিট্টাইটদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল এবং নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে নজির স্থাপন করেছিল।

AMARBOI.COM

এসিরীয়গণ

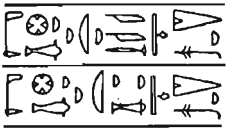

সাম্রাজ্যটি ছিল এসিরীয়া। মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের সময়ই তাইগ্রিস নদীর উজান এলাকায় এসিরীয় শক্তির উত্থান ঘটে। এটি ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস এলাকার নগর-রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ধার করে একটি নতুন সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক জাতির জন্ম দেয়।

কয়েক শতাব্দী ধরে তারা সামরিক দিক দিয়ে অগ্রসর প্রতিবেশী জাতির অধীনে ছিল। উদাহরণস্বরূপ এটি ছিল মিত্তানী অধীনস্থ রাজ্য এবং তৃতীয় থুতমসের আক্রমণে বিপর্যস্ত মিত্তানীর অংশীদার ছিল। এক শতাব্দী পরে এটি হিট্টাইটদের অধীনে চলে যায়। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিট্টাইটদের পতনের পর একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সুযোগে সমুদ্রচারী কিছু জাতির আগমনে একটি অন্ধকার যুগের সূচনা হয় যা সমগ্র পশ্চিম এশিয়াকে প্রভাবিত করে।

তবে অদ্ভুত এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এসিরীয়রা হিট্টাইটদের কাছ থেকে লোহা গলানোর পদ্ধতি শিখে নেয়। যেমনটা সে সময়ের অনেক জাতি শিখেছিল। তবে তারাই সর্বপ্রথম এই ধাতুটির ব্যবহারিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে লোহার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে পেরেছিল। যেমনটা করেছিল গ্রীস আক্রমণের সময় ডরিয়ানরা। এসিরীয়রা ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ লৌহাস্ত্র-সজ্জিত সেনাবাহিনী গঠন করে। এটি ছিল এক গোপন অস্ত্র। এক হাজার বছর পূর্বে যেমনটি ছিল অশ্ব ও রথ।

এসিরীয়গণ প্রাথমিক যুদ্ধজয়ের আস্বাদ পেয়েছিল যখন তাদের রাজা প্রথম তিগলাথ-পিলেসার ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের দিকে অভিযান চালিয়েছিল যখন রামেসেস বংশধরেরা মিশরে ক্ষমতাসীন। তবে এসিরীয়গণ পিছু হটে আসে যখন নতুন যাযাবররা পশ্চিম এশিয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এবার এই যাযাবর জাতিটি ছিল আর্মেনীয় যারা ইসরায়েল ও জুডার উত্তরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসরাইলিদের কাছে এবং তাদের নিজেদের কাছেও রাজ্যটির নাম ছিল *আরাম*। তবে বাইবেলে কিং জেম্‌স-এর ভাষ্যমতে গ্রিক ভাষায় দেশটির নাম ছিল সিরিয়া।

যে সময় লিবীয় বংশ মিশর শাসন করছিল এসিরীয়ার তখন পুণরুত্থান ঘটে। এর সৈন্যবাহিনী অভূতপূর্ব যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিল, যেমন ভারী দেওয়াল ভাঙ্গার উপকরণ, যা দিয়ে সুরক্ষিত নগরপ্রাকার ভেঙ্গে ফেলা যায়। ৮৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এসিরীয় বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করেছিল এবং কিছু সময়ের জন্য সিরীয়-ইসরাইলি যৌথ বাহিনী তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। তবে ডেভিড ও সলোমনের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল আর শীঘ্রই ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের এই ছোট্ট রাজ্যটির পতন হয়েছিল।

৭৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন নুবীয়রা মিশর অধিকারে ব্যস্ত তখন এসিরীয় রাজা তৃতীয় তিগলাথ– পিলেসার সিরিয়া রাজ্য ধ্বংস করে এর রাজধানী দামাস্কাস দখল করে নেয়। দশ বছর পরে তার একজন উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সার্গন ইসরায়েল ধ্বংস করে এর রাজধানী সামারিয়া দখল করে নেন। ৭০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সার্গনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সেনাকেরিব যেরুজালেম অবরোধ করেন।

ব-দ্বীপ অঞ্চলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নুবীয় ফারাওগণ এসিরীয় ভীতি দূর করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। হিক্সসদের পর থেকে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি মিত্তানী-হিট্টাইট বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থান করছিল। তবে এসিরীয়রা সরাসরি মিশর সীমান্তে চলে এল। তার চেয়েও বড় কথা, তারা ইচ্ছাকৃত এক নিষ্ঠুর যুদ্ধের অবতারণা করেছিল যার ফলে মিশরীয়দের মনোবল সম্পূর্ণ ধসে পড়ে।

মিশরীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে ভয়ংকর লৌহ বর্মে সজ্জিত এসিরীয় বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই নুবীয় ফারাও চেষ্টা করেছিলেন সিরিয়, ইসরাইলি, জুডীয় এবং ফিনিসীয়গণকে এগিয়ে আনতে। তার গুপ্তচরগণ অর্থ এবং মিষ্টবাক্য ছড়িয়েছিল যেখানে যেমন প্রয়োজন এবং এসিরীয় আক্রমণের বিপদ সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে চেয়েছিল। মিশর সতর্কতার সাথে তার শক্তি সংহত করেছিল এই আশায় যে যেভাবেই হোক এসিরীয় বিপর্যয় থেকে বাঁচা যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে এসিরীয় বাহিনী যখন যেরুজালেম অবরোধ করে তখন সবার চৈতন্যোদয় হলো যে এবার যুদ্ধে নামতে হবে এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র *তাহার্কার অধীনে* মিশরীয় বাহিনীকে প্রেরণ করেন সেনাকেরিবের মোকাবেলা করতে। মিশরীয়রা পরাজিত হয়েছিল তবে সে ছিল এক কঠিন সংগ্রাম এবং সেনাকেরিবকে আপাতদৃষ্টিতে একটি দুর্বল বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। তবে তার নিজ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের সংবাদ শুনে সাময়িকভাবে তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। মিশর রক্ষা পেয়েছিল এবং যেরুজালেমেও আনন্দ উল্লাস চলছিল যেহেতু তারা আরও এক শতাব্দীর জীবন ফিরে পায়।

এসিরীয় সাম্রাজ্যে সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা দূর করে যখন সাম্রাজ্যকে ভীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত করতে সক্ষম হলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ৬৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনাকেরিবকে হত্যা করা হয় এবং এসিরীয় সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের শুরু হয়।

তার পুত্র এসাহার্ডন আবার বাইরে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হলেন। মিশর সম্বন্ধে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। মিশর যখন এসিরীয় ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত তখন এসিরীয়া নিজ দেশে একের পর এক বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত। ইতিমধ্যে তাহার্কা ফারাও হিসাবে মিশরের সিংহাসনে আসীন এবং এসহার্ডন মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

তাহার্কা এবং তার মিশরীয় বাহিনী মরিয়া হয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ৬৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা একটি যুদ্ধে এসিরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। তবে এতে চূড়ান্ত পতন শুধু কিছুদিনের জন্য বিলম্বিত হয়েছিল। ৬৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এসাহার্ডন অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধে ফিরে আসেন। তিনি মেম্ফিস এবং ব-দ্বীপ অধিকার করেন এবং তাহার্কাকে দক্ষিণে হটে যেতে বাধ্য করেন।

তবে তাহার্কা হাল ছেড়ে দেননি, তিনি একটি প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং ভাটির দিকের আক্রমণে সাফল্য লাভ করলেন। ৬৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর একটি আক্রমণের আয়োজন করার পূর্বেই এসহার্ডন মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার পুত্র আসুরবানিপাল পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি যে শুধু মেম্ফিস পুনর্দখল করেছিলেন তাই নয়, তিনি এমন একটা কিছু করেছিলেন যা ইতিপূর্বে হিক্সসরাও করতে পারেনি। তিনি থিবিসে আশ্রয় নেয়া তাহার্কার পশ্চাদ্ধাবন করেন।

৬৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি থিবিস দখল করে ধ্বংস করে দেন এবং নুবীয় ফারাও বংশের সমাপ্তি টানেন। নুবিয়াতে তারা আরও এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিল তবে তাদের সভ্যতার অধঃপতন ঘটে এবং এক শতাব্দীর স্বল্পস্থায়ী গৌরবের চির অবসান ঘটে।

আইজাক আসিমভ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

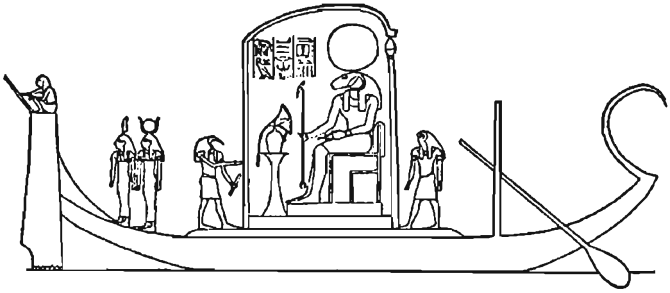

৮. সাইটীয় মিশর

গ্রিকগণ

মিশরে দ্বিতীয়বারের মতো সেমিটিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিক্সসদের এক হাজার বছর পরে এসিরীয়দের দ্বারা। এসিরীয় আক্রমণ আরও অভ্যন্তরে থিবিস পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তবে এটি তেমন প্রবল আক্রমণ ছিল না। যেসব মিশরীয় নুবীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল তাদেরকে ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ করে এসিরীয়রা দেশ শাসন করেছিল। নিম্ন মিশরে তারা *নেকো* নামে এক মিশরীয় রাজপুত্রকে ডেপুটি নির্বাচন করেছিল। এই রাজপুত্রটি দীর্ঘদিন এসিরীয়দের হাতে বন্দী থেকে বুঝতে পেরেছিল তার প্রভুরা কোন্ চরিত্রের। তাই তিনি মিশরীয় রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন। এই কাজটি তিনি বেশ আনুগত্যের সাথে নির্বাহ করেছিলেন। অবশেষে আসুরবানিপালের পক্ষ নিয়ে নুবীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান। তদীয়পুত্র সামটিক, যাকে গ্রিকরা বলত সামেটিকোস, তিনি উত্তরাধিকার লাভ করেন।

তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন এসিরীয়দের কবলমুক্ত হওয়া যায়। কারণ তাদের গৌরবের দিনগুলি ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিল। আসুরবানিপাল বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। বেবিলনীয়ায় অবিরাম বিদ্রোহ ঘটছিল। বেবিলনীয়ার পূর্বে অবস্থিত *এলাম* নামে একটি স্বাধীন জাতি এসিরীয়ার বিরুদ্ধে নাছোড়বান্দা হয়ে যুদ্ধ করছিল। কৃষ্ণসাগরের উত্তর থেকে *সিমেরীয়* নামে একটি যাযাবর জাতি স্রোতের মতো এশিয়া মাইনরের দিকে ধেয়ে আসছিল এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দেশটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিল। আসুরবানিপাল সক্ষমতার সাথে বিষয়টির মোকাবেলা করছিলেন। দুইটি অভিযানে তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন এবং বিশ শতাব্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো একটি রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, যার কোনো নিশানা আজ আর টিকে নাই।

সামটিক খুব সর্তকতার সাথে এই বিজয়ীর থেকে দূরে সরে রইলেন। তিনি ভূমধ্যসাগরের ওপারে এশিয়া মাইনরের একটি রাজ্য লিডিয়া থেকে ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন। মিশরের মতো লিডিয়াও ছিল এসিরীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে এবং সে-ও স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল।

লিডীয় ভাড়াটিয়া সৈন্যরা সামটিকের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিল এবং ৬৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ থিবিসের পতনের মাত্র নয় বছর পর মিশর থেকে এসিরীয় সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এসিরীয় অধ্যায় স্থায়ী হয় মাত্র বিশ বছর। মোটের উপর মিশর সব সময় বহিঃশত্রুর বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং সামটিক, প্রথম সামটিক উপাধি ধারণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন। এবার মিশর সত্যিকারের একজন স্বদেশীয়কে ফারাও হিসাবে পেল।

মানেথোর মতে সামটিক ষড়বিংশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সমুদ্র থেকে ত্রিশ মাইল দূরে নীল নদের পশ্চিমের এক শাখানদীর পাশে *সাইস* নামে এক স্থানে তিনি তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে এই বংশকে বলা হয় সাইটিক রাজবংশ এবং এই যুগের মিশরকে বলা হয় "সাইটিক" মিশর।

সামটিক ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। তার অধীনে মিশর যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিল তাই নয়, তিনি শিল্পেরও পুনর্জীবন ঘটিয়েছিলেন। সুচিন্তিতভাবে অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া হয়, যেন মিশর তার গা থেকে সব ধূলি ময়লা ঝেড়ে ফেলতে চায়। তারা সেই সোনালি যুগে ফিরে যেতে চায়, যে যুগে শুধু মিশর সভ্যতাই বর্তমান ছিল এবং অবশিষ্ট পৃথিবীকে অবহেলার চোখে দেখা হতো।

পিরামিড নির্মাণের সময়কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল এবং প্রাচীনকালের সমাধিতে যে সব মন্ত্রতন্ত্র ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলি আবার পাঠ করা শুরু হল। মধ্য রাজবংশের ধ্রুপদী সাহিত্য পুনর্জীবিত হল। এসিরীয়দের দ্বারা থিবিসের যে ক্ষতিসাধন হয়েছিল, তা মেরামত করা হয়। এসব কাজে সাইটিক বংশ নুবীয় ফারাওদের পথ অনুসরণ করেছিল। তবে সমসাময়িক পৃথিবীকেও অবহেলা করা সম্ভব হয়নি। যদি সামটিককে মিশর সুরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে বর্তমানের কিছু রীতিনীতিকেও মান্য করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক অনুষঙ্গ ছিল গ্রিক ধারার। গ্রিকদের অন্ধকার যুগ অতিক্রম করতে হয়েছিল ট্রয়ের যুদ্ধের পরে এবং তারপর তারা এক গৌরবের যুগে প্রবেশ করে। তারা ক্ষমতা ও সংস্কৃতিতে ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চার করে। তারা উত্তরাধিকার লাভ করেছিল পূর্বসূরি মাইসেনীয় ও ক্রিটীয়দের থেকে। মিশরীয়রা যাকে অত্যন্ত মূল্যবান হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম এবং নিজেদের মধ্যে বিরোধ গ্রিকদের অনেক অতুলনীয় সামরিক কৌশল শিখিয়েছিল। তখন এবং পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীব্যাপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে গ্রীসের বাইরের সেনাবাহিনীকে সেবা প্রদান করেছিল। গ্রিকরা পদাতিক বাহিনীর জন্য বিশেষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেছিল যা মিশরীয় এবং এশীয় বাহিনীর তুলনায় চলমান ট্যাংকের মতো মনে হতো।

দ্বিতীয়ত গ্রিকরা ছিল সমুদ্রচারী। তাদের সমুদ্রগামিতা শুধু ফিনিসীয় ছাড়া আর সবাইকে অতিক্রম করেছিল। গ্রীসের অন্ধকার যুগে গ্রিকরা ঈজিয়ান সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এশিয়া মাইনরে যেত। তারপর খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে যখন মিশরে অবক্ষয় চলছে তখন গ্রিক নাবিকরা কৃষ্ণসাগর দিয়ে সিসিলি এবং ইতালিতে যাতায়াত করত।

সামটিক এ সব কিছুই জানতেন এবং তিনি তার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। তিনি ইখনাতনের মতো জানতেন কী করা সম্ভব আর কী করা সম্ভব নয়। তিনি তার সেনাবাহিনীতে গ্রিক ভাড়াটিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং ব-দ্বীপের পূর্বভাগে তাদের জন্য একটি শক্তিশালী সেনানিবাস স্থাপন করেছিলেন যাতে করে পূর্বদিক থেকে আগত যে কোনো অভিযান প্রতিরোধ করা যায়। তবে এটি ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা। গ্রিক প্রতিভাকে কেন যুদ্ধ ও শান্তি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না? মিশরীয়রাও গ্রিকদের মতো বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, তবে তাদের কোনো সমুদ্রগামি জাহাজ ছিল না। ৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সামটিক গ্রিকদের উৎসাহ দেন মিশরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার (সন্দেহ নাই এতে করে মিশরীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, যারা সব সময়ই বিদেশিদের সন্দেহের চোখে দেখত)।

সাইসের মাত্র দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রিকদের একটি সামুদ্রিক বাণিজ্য ঘাটি গড়ে উঠেছিল। তারা সেখানে *নক্রেটিস* (সমুদ্রের শাসক) নামে একটি সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ৬৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গ্রিকরা লিবীয় উপকূলে একটি কলোনী গড়ে তোলে। মিশরীয় প্রভাবের বাইরে সাইসের প্রায় পাঁচশত মাইল পশ্চিমে গ্রিকরা সাইরেনি নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে যা একটি উন্নত গ্রিক ভাষাভাষী অঞ্চল রূপে বহু শতাব্দীব্যাপী টিকে ছিল। চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করার পর ৬১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরেনির মৃত্যু হয়। ছয় শতাব্দী পূর্বে দ্বিতীয় রামেসেসের পর এটাই মিশরে দীর্ঘতম ও সফলতম একক ব্যক্তির রাজত্ব। সামটিকের জীবৎকালে তিনি এসিরীয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন দেখে যেতে পেরেছিলেন। তবে তার রাজত্বের শেষ দিকে এক অন্ধকার কালো মেঘ নেমে এসেছিল।

ক্যালদীয়গণ

আসুরবানিপাল, যিনি স্বল্পকালের জন্য মিশরে আধিপত্য করতে পেরেছিলেন, ৬২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং একশত পঁচিশ বছরে প্রথমবারের মতো এসিরীয়ায় একজন শক্তিশালী রাজার অভাব হল। বেবিলনীয়া তখনও নিঃশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায়নি আর এসিরীয়ার দুর্বলতাকে তারা কাজে লাগায়। নগরটি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ছিল একটি সেমিটিক গোত্র ক্যালদীয়দের অধীনে যারা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আসুরবানিপালের শেষ বছরগুলিতে ক্যালদীয় রাজা *নাবোপোলেসার* এসিরীয় রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে বেবিলনীয়া শাসন করত। এসিরীয় শক্তি যখন অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন সামটিকের মতো তিনিও আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এ জন্য তিনি বিদেশি মিত্রদের সহায়তা কামনা করেন।

নাবপোলেসার মেডীয়দের কাছ থেকে এ সহায়তা পেলেন। মেডীয় জাতির লোকেরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। যারা ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এসিরীয়ার পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এসিরীয়া যখন ক্ষমতার শীর্ষে মেডীয়া তখন করদ রাজ্যরূপে রয়ে গিয়েছিল।

তবে আসুরবানিপালের মৃত্যুর সময় *সাইয়াক্সারেস* নামে একজন মেডীয় দলপতি কিছু উপজাতীয় লোকজনকে তার অধীনে সংঘবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সাইয়াক্সারেস নাবোপোলেসারের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এসিরীয়া পূর্ব দিকে মেডীস এবং দক্ষিণ দিকে বেবিলনীয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসিরীয় বাহিনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে বিগত দুই শতাব্দী ধরে তাদের অনেক শক্তি ক্ষয় হয়েছিল। তারা বিধ্বস্ত হয়ে দেশের অভ্যন্ত রভাগে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এসিরীয় রাজধানী *নিনেভ* দখল হয়ে যায় এবং এর অধিবাসীদের কণ্ঠে উল্লাসধ্বনি শোনা যায়, যারা দীর্ঘদিন এসিরীয় দুঃশাসনে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল (বাইবেলে উল্লিখিত জুডীয় নবী *নাহুম-এর* কণ্ঠেও এই উল্লাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়)।

এই চূড়ান্ত ঘটনার দুই বছর পর প্রথম নেকো তার পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নেকো দেখতে পেলেন তার সামনে পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্বল এসিরীয়া মিশরের জন্য সুবিধাজনক। সেখানে যদি নতুন কোনো শক্তিশালী সাম্রাজ্য-পিপাসু শক্তির আবির্ভাব হয় তাহলে সেটা মিশরের দুর্ভাগ্য।

তবে নেকোর মনে হয়েছিল সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। এমনকি নিনেভের পতনের পরও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু এসিরীয় সৈন্য যুদ্ধ করে চলেছিল। একজন এসিরীয় সেনাপতি নিনেভের দুইশত পঁচিশ মাইল পশ্চিমে *হারানে* ফিরে এলেন এবং সেখানে বেশ কয়েক বছর ক্ষমতা ধরে রাখলেন।

নেকো স্থির করলেন এ ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। মহান তৃতীয় থুতমসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল ধরে তিনি এগিয়ে যেতে পারেন। তার মনে হয়েছিল এটাই সর্বোত্তম পলিসি। যদি তিনি হারান উদ্ধার না-ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারেন তাহলেও তিনি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল সুরক্ষিত রাখতে পারবেন এবং ক্যালদীয়দেরকে মিশর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন।

নেকোর যাত্রাপথ ছিল সংকীর্ণ রাষ্ট্র জুডার মধ্যদিয়ে। ডেভিডের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চারশ বছর পার হয়ে গেছে। তার অবশেষ জুডা তখনও বর্তমান এবং তার এক বংশধর *যশিয়া* তখনও সেখানকার শাসক। উত্তরের রাজ্য ইসরায়েলের পতনের পরও জুডা টিকে ছিল এবং তারা সেনাকেরিবের সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

এবার তারা নেকোর সম্মুখীন হল। যশিয়া নেকোকে নির্বিরোধে জুডার উপর দিয়ে যেতে দিতে পারেন না। সে সময় যদি নেকো জয়ী হতেন তাহলে তিনি জুডার উপর কর্তৃত্ব করতেন আর যদি পরাজিত হতেন তাহলে ক্যালদীয়রা প্রতিশোধ নিতে দক্ষিণ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাজেই যশিয়া তার ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নেকো জুডাকে নিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তবে তার গত্যন্তরও ছিল না। ৬০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নেকো মেগিডোর যুদ্ধে যশিয়ার সম্মুখীন হলেন। পনেরো শতাব্দী পূর্বে তৃতীয় থুতমস এখানেই কেনানীয়দের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এবারও মিশরের জয় হল এবং জুডার রাজাকে হত্যা করা হল। ছয় শতাব্দী পরে সিরিয়া আবার মিশরীয় কর্তৃত্বে এসে গেল।

তবে ক্যালদীয়রাও এগিয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে তারা ইউফ্রেতিস টাইগ্রিসের সমগ্র এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। নেবুপোলেসার বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তবে তার সুযোগ্য পুত্র *নেবুচাদ্রেজার* ক্যালদীয় সেনাবাহিনীকে পশ্চিম দিকে পরিচালিত করেন। যশিয়া নেকো কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি মিশরীয় সৈন্যকে ততদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন যতদিন না নেবুচাদ্রেজার *রাহান* অবরোধ করতে পারেন। ৬০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নেবুচাদ্রেজার শহরটি দখল করে নেন এবং এসিরীয় শক্তির শেষ চিহ্ন মুছে ফেলেন। এসিরীয়া ইতিহাস থেকে মুছে গেল।

এবার ক্যালদীয় ও মিশরীয়রা পরস্পরের মুখোমুখি হলো ইউফ্রেটিসের তীরে *কার্কেমিশ* নামক স্থানে, যেখানে প্রথম থুতমসের নেতৃত্বে মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো উপস্থিত হয়েছিল। ফলত এই স্থানটিতে যদি কোনো যাদুকরী শক্তি থেকে থাকে তা মিশরের অনুকূলে ছিল না। নেকো জুডার ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিকই তবে নেবুচাদ্রেজারের বিশাল বাহিনী অন্যরকম ছিল। মিশরীয়রা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল আর নেকো যে গতিতে এশিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন তার চেয়ে দ্রুতগতিতে এশিয়া থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিন বছরের মধ্যেই মিশরের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল এবং তারপর তিনি আর এ চেষ্টা করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে এ সময় যদি নেবুপোলেসারের মৃত্যু না হতো এবং নেবুচাদ্রেজারকে তার উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বেবিলনে ফিরে না যেতে হতো, তাহলে হয়তো তিনি মিশর আক্রমণ করে বসতেন।

ভাগ্যবলে মিশর এবার বেঁচে যায়। মিশর তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সুদৃঢ় করতে মনোনিবেশ করে। নেকো জলপথ উন্নত করতে আত্মনিয়োগ করেন। মিশর নদীমাতৃক দেশ এবং তার রয়েছে হাজার হাজার খাল তবে তার দুই পাশে দুই সমুদ্র, ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর। দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সমুদ্রের উপকূল ধরে খুব সতর্কতার সাথে মিশরীয় জাহাজ চলাচল করত *ফিনিসিয়া* এবং *পান্টের* দিকে। মিশরীয় সম্রাটদের প্রায়ই মনে হতো যে, নীল নদ থেকে একটি খাল খুঁড়ে যদি লোহিতসাগরের সাথে সংযুক্ত করা যায় তাহলে বাণিজ্যিকভাবে অনেক লাভবান হওয়া যাবে।

মিশরীয় ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগকারী ক্যানাল পরবর্তী যে কোনো সময়ের চাইতে অধিকতর জল ধারণ করত এবং সিনাই সীমান্তে কিছু হ্রদ অবস্থিত ছিল যেটি এখন আর নেই। সম্ভবত একটি খালের মাধ্যমে এই হ্রদের পানি ব্যবহার করা হতো। যে খালটি প্রাচীন ও মধ্য সাম্রাজ্যের আমলে বর্তমান ছিল, তবে সর্বদাই এটির যত্ন নিতে হতো। ক্রমবর্ধমানভাবে জলবায়ু অধিকতর শুষ্ক হওয়ার কারণে এটির পুনরুদ্ধার করা কষ্টসাধ্য ছিল।

দ্বিতীয় রামেসেস এটি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সম্ভবত এ কারণে যে নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তার অধিক শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। নেকোও এই চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও ব্যর্থ হন। হয়তো এ কারণে যে এশিয়া অভিযানে তাকে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়।

দৃশ্যত তার অন্য একটি অভিপ্রায় ছিল। যদি ভূমধ্যসাগর এবং লোহিতসাগরকে একটি কৃত্রিম জলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা না যায় তাহলে সম্ভবত প্রাকৃতিক জল পথেই সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব। হেরোডোটাসের ধারণা নেকো সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যদি কেউ ভূমধ্যসাগর থেকে আফ্রিকা পরিক্রমা করে লোহিতসাগরে পৌঁছাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফিনিসীয় নাবিকদের সাহায্য নিয়েছিলেন (এ সময় নৌবিদ্যায় তারাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ)। এ ব্যাপারে তারা সাফল্য লাভ করেছিল এবং এই সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করতে তাদের তিন বছর সময় লাগে। অবশ্য হেরোডোটাসের বিবরণ কতটা সত্য তা বলা যাবে না।

অবশ্য হেরোডোটাস নিজেই উল্লেখ করেছেন তিনি এটা বিশ্বাস করেননি। তার সন্দেহের মূল কারণ মনে করা হয় ফিনিসীয় নাবিকগণ যখন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণ বিন্দু অতিক্রম করছিল তখন মধ্যাহ্ন সূর্যকে তারা খমধ্যরেখার উত্তরে দেখেছিলেন। হেরোডোটাসের মতে এটা অসম্ভব কারণ সে কালে পরিচিত সমস্ত পৃথিবীতেই মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে খমধ্যরেখার দক্ষিণে দেখার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে হেরোডোটাসের ধারণা ভ্রান্ত ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায় উত্তরের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মধ্যাহ্ন সূর্য সর্বদাই খমধ্যরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। কাজেই ফিনিসীয় নাবিকগণ মধ্যাহ্ন সূর্যকে খমধ্যরেখার উত্তরে দেখবে এবং তারা যে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করেছিল সেটা সত্য বলেই মনে হয়।

তৎসত্ত্বেও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ সফল হয়ে থাকলেও সেটা ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান। বাণিজ্য পথ হিসাবে এটির গুরুত্ব ছিল না কারণ এই যাত্রাপথটি ছিল অতি দীর্ঘ। বাস্তবিক পক্ষে এর দুই হাজার বছর পরেই সত্যিকারভাবে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ সম্ভব হয়েছিল।

ইহুদিগণ

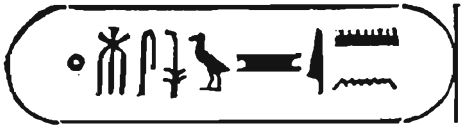

নেবুচাদ্রেজারের চল্লিশ বছরের শাসনকালে মিশর সব সময় আতঙ্কে ছিল। কার্কেমিশের পর মিশরীয়রা কখনোই আর তাকে ঘাটাতে সাহস করেনি। তৎপরিবর্তে নেকো এবং তার উত্তরাধিকারীরা নুবীয় ফারাওদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এসিরীয়ার দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। অর্থ ও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা তারা সব সময় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে উস্কানি দিত যাতে ক্যালদীয়দের ভারসাম্য নষ্ট করা যায়।

এক শতাব্দী পূর্বে এই পলিসি মিশরীয়দের শান্তিতে থাকতে সাহায্য করেছিল। তবে সিরিয়া এবং ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যে জুডা এসিরীয় সাম্রাজ্যের সময়ও টিকে ছিল, তারা উত্তরের প্রতিবেশীদের দুর্ভাগ্য থেকে শিক্ষা নিতে পারেনি। শক্তিশালী ক্যালদীয়র পরিবর্তে দুর্বল মিশরকে বেছে নিয়ে এবং মিশরীয়দের কূটকৌশলে ক্যালদীয়দের জালে ফেঁসে গিয়েছিল।

৫৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুডা নেবুচাদ্রেজারকে কর দিতে অস্বীকার করে, যে কারণে যেরুজালেমকে অবরুদ্ধ করা হয় এবং এখানকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যার মধ্যে রাজাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদেরকে বেবিলনে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

প্রফেট *জেরেমীয়ার* সর্নিবন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও নতুন রাজার আমলে এই পুরাতন খেলাটি চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জেরেমীয়া অনুরোধ করেছিলেন মিশরের সঙ্গ ছেড়ে ক্যালদীয়দের আপোসরফায় আসতে। এক দশক পরে জুডা আবার বিদ্রোহ করে এবং এবার নেবুচাদ্রেজার যেরুজালেম দখল করে নেন এবং সেখানকার মন্দির ধ্বংস করে ফেলেন এবং প্রকৃতপক্ষে সকল অভিজাতকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এভাবেই জুডীয় রাজবংশের অবসান ঘটে সেই সাথে ডেভিডের বংশেরও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরেও নেবুচাদ্রেজার মিশর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেননি। ফিনিসীয় নগরী *টায়ার* তখনও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং একটি শক্তিশালী শত্রুকে রেখে তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেননি।

ইহুদি নবী *ইজেকিয়েল*, যিনি তখন বেবিলনীয়ায় নির্বাসনে ছিলেন, তিনি আস্থার সঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে টায়ার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মিশর মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (বাইবেলে এ সব কথা আছে)। তবে নবীজির ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়নি।

ফিনিসীয় উপকূলে টায়ার নগরীটি একটি পাহাড়ী দ্বীপে অবস্থিত। যেখানে জাহাজে করে খাদ্যসামগ্রী আনা হতো। আর সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর স্বভাব অনুযায়ী এখানকার জনগণ মরণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকত। তারা নেবুচাদ্রেজারকে তেরো বছর ঠেকিয়ে রেখেছিল। নেবুচাদ্রেজারও মরিয়া হয়ে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারও মধ্যে ছিল সেমিটিক জাতির একগুয়েমি। তবে তিনি সফল হননি। শেষ পর্যন্ত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হন এবং শর্ত থাকে যে, টায়ার তার ক্যালদীয় বিরোধী-নীতি থেকে সরে আসবে এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করবে। নেবুচাদ্রেজারও যুদ্ধ করে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছিলেন।

নেবুচাদ্রেজারের রাজত্বের শেষার্ধ সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানতে পারি এবং তিনি মিশরে একটি খাপছাড়া ধরনের আক্রমণ চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মিশরের কৌশল তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল, তবে সে জন্য যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়।

৫৯৫ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে নেকোর মৃত্যুর পরও যেরুজালেমের অস্তিত্ব বজায় ছিল। তার পুত্র দ্বিতীয় সামটিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। নেবুচাদ্রেজার জুডার সাথে জড়িয়ে পড়ায় সামটিকের সুবিধা হয়েছিল আর একদিকে দৃষ্টি দেওয়ার, দক্ষিণ দিকে। নাপ্টায় তখনও নুবীয় রাজার শাসন চলছে এবং তারা কখনো ভুলতে পারেনি যে তাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় মিশর শাসন করত এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার তাগিদ বোধ করে। তাছাড়া রয়েছে মিশরীয় অহঙ্কারের প্রশ্ন। তাদের পূর্বানুমানের জন্য নুবীয়ানদের প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া।

কাজেই দ্বিতীয় সামটিক দক্ষিণে নুবীয়ার দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন এবং তারা সাফল্যের সাথে নাপ্টায় গিয়ে পৌঁছাল। যদিও সেখানে তাদের থাকার ইচ্ছা ছিল না। মিশরে ষড়বিংশ রাজবংশ নতুন রাজত্বের মতো ছিল না। অভিযানটি যথেষ্ট ছিল, এবং নুবীয় রাজারা কিছুটা অপমানজনকভাবে শান্তির প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

এই অভিযানটির কথা আমাদের মনে থাকবে বিশেষ একটি মানবিক ঘটনার জন্য যা ঘটেছিল তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময়। এই অভিযানে মিশরীয় সৈন্যদলে বহুসংখ্যক গ্রিক ভাড়াটিয়া ছিল। ফিরতি পথে ভাড়াটিয়া সৈন্যরা *আবু সিম্বেলের* নিকটে তাবু খাটায়। সাড়ে ছয় শতাব্দী পূর্বে এখানেই দ্বিতীয় রামেসেস তার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সূর্যদেবতার মন্দির স্থাপন করেছিলেন, সেই সাথে ছিল চারটি উপবেশনরত মূর্তি।

গ্রিকদের এসব অতীত স্মৃতির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না এবং কিছুসংখক সৈন্য গ্রিক লিপিতে স্তম্ভের গায়ে নিজেদের নাম খোদাই করে দেন। আধুনিক পুরাতাত্ত্বিকগণ এসব লিপিতে প্রাচীন গ্রিক বর্ণমালার সন্ধান পান। এতে আরও প্রমাণিত হয় অতীত এবং বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে একই ধরনের বালখিল্যতা রয়েছে। দ্বিতীয় সামটিককে সব সময় সতর্ক থাকতে হতো পাছে নুবীয়রা প্রতিশোধ মূলক কোনো আক্রমণ করে না বসে। পথে ছিল প্রথম প্রপাতের দুরূহতা, তবে এসব অসুবিধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল না। ভাটির দিকে নীলনদের একটি দ্বীপে মিশরীয় সেনানিবাস বর্তমান ছিল। এটাই মিশরের সর্ব দক্ষিণের প্রতিরক্ষা লাইন।

এলিফ্যান্টাইন দ্বীপের এই সেনানিবাসটির অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ইহুদি ভাড়াটিয়া। নেবুচাদ্রেজারের বিরুদ্ধে জুডার নিষ্ফল অভিযানে পরাজিত ইহুদিরা মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ছিল প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এবং তাদেরকে নিয়োজিত করতে পেরে সামটিক খুশি ছিলেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এলিফ্যান্টাইন দ্বীপে কিছু দলিলপত্রের একটি ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। এই সেনানিবাসটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুই শতাব্দী ধরে ইহুদিদের জীবন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে যেসব ইহুদি বেবিলনে নির্বাসনে গিয়েছিল তারা বিভিন্ন পর্যায়ে জুডায় প্রত্যাবর্তন শুরু করে। ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। এলিফ্যান্টাইনের ইহুদিরা এসব কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিল না। বেবিলনিয়ার ইহুদিদের দ্বারাই আধুনিক ইহুদিবাদের গোড়াপত্তন হয় এবং এই নতুন মন্দিরে এই ধারাটি শিকড় গাড়ে এবং গোড়া ইহুদিবাদের সূচনা করে। এই জীবনধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে এলিফ্যান্টাইনের ইহুদিরা অস্বাভাবিক একটি ধর্মীয় পদ্ধতি শুরু করেছিল যা যেরুজালেম মন্দিরের পুরোহিতরা ঘোর বিরোধীতা করত।

৫৮৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় সামটিকের পুত্র *আপ্রাইজ* সিংহাসনে আরোহণ করেন (বাইবেলে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে *ফারাও হর্ফা* নামে)। আপ্রাইজের রাজত্বকালে যেরুজালেমের পতন ঘটে এবং তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অনেক ইহুদি শরণার্থীকে এ সময় মিশরে স্বাগত জানানো হয়। এরাই ছিল পরবর্তী সাত শতাব্দী ধরে মিশরে ইহুদিগোষ্ঠী। তারা মিশরীয় জীবনযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আপ্রাইজের রাজত্বকালের প্রায় পুরো সময়টাতেই নেবুচাদ্রেজারের টায়ার অবরোধ বজায় ছিল। আপ্রাইজ টায়ারকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন তবে তা বিশেষ কাজে লাগেনি। তবে মিশর অন্যত্র তার দৃষ্টি দিতে পেরেছিল। টায়ারীয়দের সাহায্যেই ক্যালদীয় নেকড়েকে মিশর থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিক ভাড়াটিয়াদের ব্যাপারে আপ্রাইজ তার বংশের পূর্বসূরিদের নীতির অনুসরণ করেছিলেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মিশর একটি নৌবহর নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছিল। আপ্রাইজ তার নৌবহরে অভিজ্ঞ গ্রিকদের নাবিক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং তাদের সাহায্যে ব-দ্বীপের দুইশত পঞ্চশ মাইল উত্তরে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে নেন। এটা শুধু মিথ্যা অহঙ্কার ছিল না। এই দ্বীপে একটি শক্তিশালী নৌবহর নেবুচাদ্রেজারের মিশরকে নিরাপদ রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। ক্যালদীয়দের আক্রমণের আশঙ্কাও এর দ্বারা দূরীভূত হয়েছিল।

লিবীয় গোত্রের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়ে সাইরেনীতে প্রতিষ্ঠিত গ্রিক কলোনী সম্প্রসারিত হচ্ছিল আর সাইরেনীয়রা তাদের নিরাপত্তার জন্য ফারাওকে অনুরোধ করেছিল। সাইরেনী পশ্চিমে অবস্থিত গোত্রগুলিকে অস্থির ও প্রতিশোধপরায়ণ রাখতে চায়নি কারণ সে ক্ষেত্রে পূর্ব দিকে ক্যালদীয়দের সাথে সংগ্রামে হয়তো তারা মিশরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি সাইরেনীর বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তিনি একটি উভয়সংকটে পতিত হলেন। তার সেনাবাহিনীর মূল শক্তিই ছিল গ্রিক ভাড়াটিয়ারা। তাই গ্রিক নগরীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে পাঠানো বোকামি হতো। সাধারণত ভাড়াটিয়ারা অর্থের বিনিময়ে যে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকত তবে অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। আপ্রাইজ ভয় করেছিলেন কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে হয়তো তার ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের একটি অংশ হঠাৎ দলত্যাগ করে গ্রিকপক্ষে যোগ দিয়ে তার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি গ্রিকদের স্বদেশে রেখে দিয়ে শুধু মিশরীয় সৈন্যদেরকেই সাইরেনীতে প্রেরণ করলেন।

তবে মিশরীয় সৈন্যরা গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সন্ত্রস্ত ছিল। অনেক বছর ধরে নিঃসন্দেহে বিদেশিদের প্রতি মিশরীয়দের একটা আক্ষেপ ছিল। তাদের প্রধান ক্ষোভ স্বদেশীয় সৈন্যদের চাইতে গ্রিক ভাড়াটিয়াদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখানো হতো। তারা অক্ষেপের সাথে লক্ষ করত সেনাবাহিনীতে বিদেশিদের উচ্চপদ দেওয়া হতো, অধিকহারে বেতন দেওয়া হতো এবং সম্মান প্রদর্শন করা হতো (তবে এসব আপত্তিকারীরা মোটেই লক্ষ করত না গ্রিক ভাড়াটিয়ারা কতটা আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করত)।

তাই মিশরীয় জাতীয়তাবাদী মুখপাত্ররা বক্তৃতা দিত যে, সাইরেনীর বিরুদ্ধে বেছে বেছে মিশরীয় সৈন্যদের পাঠানো হচ্ছে যাতে করে গ্রিকরা তাদের হত্যা করতে পারে এবং তখন সম্রাট শুধু গ্রিক সৈন্যদের নিয়েই তার সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবেন।

সৈন্যরা বিদ্রোহ করল এবং আপ্রাইজ তাদের শান্ত করার জন্য তার একজন অফিসার স্বদেশী মিশরীয় *আমহোসকে* পাঠালেন যিনি সৈন্যদের নিকট জনপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তবে আমহোস সৈন্যদের নিকট অত্যন্ত বেশি জনপ্রিয় ছিলেন এবং সৈন্যরা চিৎকার শুরু করে দিল যে তাকেই নতুন ফারাও হতে হবে।

আমহোস বিষয়টি ভেবে দেখলেন আর সিদ্ধান্ত নিলেন ফারাও হওয়াটা খারাপ কিছু না এবং তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তারা মহা উৎসাহে ব-দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু করল এবং উৎসাহের আতিশয্যে একটি গ্রিক ভাড়াটিয়া সৈন্যদলকে পরাস্ত করল (এই ভাড়াটিয়া সৈন্যদলটি মিশরীয় সৈন্যদের চাইতে সংখ্যায় অনেক কম ছিল)।

ঘটনাচক্রে ৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আপ্রাইজকে হত্যা করা হল। দ্বিতীয় আমহোস নিজেকে মিশরের ফারাও ঘোষণা করলেন। তিনি দ্বিতীয় সামটিকের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন (এই কন্যাটি পদচ্যুত আপ্রাইজের সৎ বোন), এভাবেই তিনি তার সিংহাসন আরোহণকে বৈধতা দিলেন এবং মানেথো তাকে ষড়বিংশ রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রিক ভার্সনে তিনি *আমেসিস* নামে অধিক পরিচিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

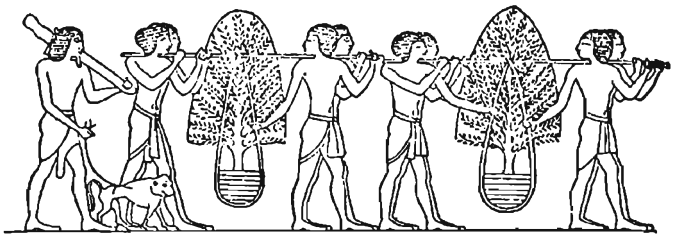

৯. পারসিক মিশর

পারসিকগণ

যদিও গ্রিকবিরোধী প্রতিক্রিয়ার ফলেই *আমেসিসের* সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটেছিল, তবু তিনি জীবনের সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। গ্রিক ভাড়াটিয়াদের তার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তিনি সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি নক্রেটিসকে শুধু যে ব্যবসাকেন্দ্র থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ নগরের রূপ দান করেন তাই নয়, তার প্রয়োজন ছিল গ্রিক মিত্রদের কাছ থেকে সুরক্ষার অঙ্গীকার।

তিনি এশিয়া মাইনরের উপকূলে ঈজিয়ান সাগরে গ্রিক দ্বীপ *সামুসের* সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বীপটি ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু আমেসিসের রাজত্বকালে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে এটি সর্ববৃহৎ নৌবন্দর রূপে গড়ে উঠেছিল। সাইপ্রাস দ্বীপ তখনও আমেসিসের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তার নৌবহর এটাকে ব্যবহার করতে পারত। তিনি এমনকি সাইরেনী নগরের এক গ্রিক মহিলাকে বিবাহও করেছিলেন।

গ্রিকদের প্রতি তার অতি উৎসাহের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব দিক থেকে তার একটি ভয়ের কারণ ছিল। যদিও আমেসিসের রাজত্বের শুরুর দিকে সেই ভীতি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ক্লান্ত, বৃদ্ধ নেবুচাদ্রেজার ৫৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার উত্তরাধিকারীরা ছিল দুর্বল ও শান্তিকামী। পঁচিশ বছর ধরে ক্যালদিয়া মিশরের জন্যে কোনো সমস্যা ছিল না।

ক্ষয়িষ্ণু প্রতিবেশীর চাইতে নিরাপদ আর কিছুই হতে পারে না এবং যে জাতি তার নিজের ভালো বোঝে সে এরূপ প্রতিবেশীকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। ইতিপূর্বে নেকো মুমূর্ষু এসিরীয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এবার আমেসিসও ক্যালদিয়ার সেবা লাভ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

মাত্র অর্ধশত বৎসর পূর্বে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পর ক্যালদিয়া তখন মৃতপ্রায়। এসিরীয়া পতনের সময় দুই বিজেতা ক্যালদিয়া এবং মেডিয়া লুটের মাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ক্যালদিয়ার ভাগে পড়ে সমৃদ্ধ ইউফ্রেটিস তাইগ্রিস উপত্যকা এবং তার পশ্চিমের সমগ্র এলাকা। মেডিয়াকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় বৃহত্তর কিন্তু কম উন্নত ক্যালদিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চল। পঁচাত্তর বছর ধরে মেডিয়া শান্তি এবং অম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণ করেছিল।

বেবিলনীয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেডিয়ার একটি প্রদেশ ছিল যা গ্রিকদের নিকট পরিচিত ছিল *পার্সিস* এবং আমাদের কাছে যার পরিচয় পারস্য নামে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে পারসিকগণ মেডীয়দের কাছাকাছি ছিল।

৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সক্ষম একজন পারসিক দলপতি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে থাকেন যার নাম ছিল *সাইরাস*। সাইরাসের দৃষ্টি ছিল মেডিয়ার সিংহাসনের দিকে আর এ ব্যাপারে তিনি ক্যালদীয় রাজা *নেবুনিডাসের* সহায়তা লাভ করেছিলেন, যার লক্ষ ছিল উত্তরের প্রতিবেশীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ উস্কে দেওয়া। ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরাস মেডীয় রাজধানীর দিকে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন এবং প্রথম অভিযানেই তা দখল করে নেন। তিনি মেডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তার রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হয়।

নেবুনিডাস অনেক দেরিতে বুঝতে পারলেন তিনি সাইরাসকে সাহায্য করে ভুল কাজ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন (এই পরিস্থিতিতে সবাই যা চায়) যে দীর্ঘকাল ব্যাপী গৃহযুদ্ধ বজায় থাকবে এবং উভয়পক্ষই পুরুষানুক্রমে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় চলে যাবে। তবে সাইরাসের বিজয়ে দেশটি দুর্বল ও স্থবির রাজার বদলে একজন তেজস্বী যোদ্ধাকে খুঁজে পেল। এবার নেবুনিডাস যে কারও সাহায্য নিতে প্রস্তুত, যে সাইরাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। তবে অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে।

৫৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরাস পশ্চিম এশিয়া মাইনরে লিডীয়দের পরাজিত করেন এবং সমগ্র উপদ্বীপ তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, এমনকি উপকূলবর্তী গ্রিক শহরগুলিও।

৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরাস খোদ ক্যালদিয়ার দিকে নজর দিলেন এবং তার বিজয় অভিযাত্রা অব্যাহত রইল এবং এক বছরের মধ্যে তিনি বেবিলনীয়া দখল করে ক্যালদিয়া সাম্রাজ্যের ইতি টানলেন। ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে সাইরাস নিহত হন। মাঝে মাঝে তাকে অভিহিত করা হয় *সাইরাস দ্য গ্রেট* নামে। এই নামটি তার উপযুক্ত ছিল, কারণ তিনি শুধু একজন বিজেতা ছিলেন না, তিনি বিজিতদের প্রতি সহনশীল মানবিক আচরণ করতেন।

সাইরাসের মৃত্যুকালে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত বিখ্যাত সভ্যতা এবং অধিকাংশ যাযাবর এলাকা তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার সাম্রাজ্যই ছিল সর্ববৃহৎ।

মিশরে আমেসিস এসব কর্মকাণ্ড ভয়ের সাথে লক্ষ করছিলেন। এই বিশাল অভ্যুদয়ের তুলনায় এসিরীয় ও ক্যালদীয় স্মৃতি ছিল নেহায়েত অকিঞ্চিৎকর। আমেসিস সাইরাসের ক্রমবৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য তার সব শত্রুকে সহায়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হন। এবার মিশর পারস্যের পথে একা দাঁড়িয়ে রইল। যে দেশ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, পারস্য নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবে না।

তবে আমেসিসের ভাগ্য ভালো, কারণ তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর সমৃদ্ধ মিশরে রাজত্ব করেছেন এবং তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন। পারস্য আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত এবং মিশর ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল। আঘাত আসার পূর্বেই ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আমেসিসের মৃত্যু হয়। তার পুত্র যিনি তৃতীয় সামটিক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন তার উপরই দায়িত্ব পড়ে পারস্যের মোকাবেলা করার।

সাইরাসের পুত্র *ক্যাম্বিসেস* পারস্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন পোড়-খাওয়া শাসক। যিনি তার পিতার অভিযান চলাকালে বেবিলনের শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। এবার তিনি পারস্য সম্প্রসারণের যৌক্তিক দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং তা ছিল মিশর অভিমুখে।

নীল ব-দ্বীপের সামান্য পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে একটি দুর্গে মিশরীয় সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল। এই দুর্গকে তারা বলত পার-আমেন (আমেনের গৃহ)। তবে আমাদের কাছে এর পরিচয় গ্রিক শব্দ পেলুসিয়াম নামে। যার অর্থ *কাদার শহর*। এটাই সেই জায়গা যেখানে একদা সেনাকেরিবের এসিরীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এবারই পেলুসিয়াম সত্যিকারের যুদ্ধ দেখতে পেল এবং তা ছিল মিশরের জন্য দুর্ভাগ্যের। কেম্বিসেস মিশরীয় সৈন্যদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং শীঘ্রই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। তিনি টলায়মান মেম্ফিসের দিকে অগ্রসর হলেন, মিশর আরও একবার বিদেশিদের অধিকারে চলে গেল।

কেম্বিসেসের মিশরে অবস্থান সম্পর্কে হেরোডোটাস যা বলেছেন তার চাইতে বেশি কিছু আমরা জানি না (এই ঘটনার এক শতাব্দী পরে হেরোডোটাস এখানে এসেছিলেন)। তিনি একজন জাতীয়তাবাদী মিশরীয় পুরোহিতের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যে ছিল তীব্র পারস্য-বিরোধী। তার কাছ থেকে কেম্বিসেসের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি ছিল। তার মতে কেম্বিসেস ছিলেন নিষ্ঠুর, অর্ধোন্মাদ, স্বেচ্ছাচারী। যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মিশরের পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র করেছিলেন এবং মিশরীয় রীতি-রেওয়াজকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, কেম্বিসেস যখন মিশরে ছিলেন তখন মিশরীয়রা "এপিস" নামে এক *ষণ্ডদেবতার* পূজা করত, যিনি মিশরীয়দের ইচ্ছা পূরণ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন দেবতা *অসিরিসের* পার্থিব অবতার। ষাড় ছিল উর্বরতার প্রতীক তারা বিশ্বাস করত, এপিস সন্তুষ্ট থাকলে ভালো ফসল পাওয়া যায় এবং সুসময় আসে। মিশরীয়রা এপিসকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

হেরোডোটাসের মতে একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিযান থেকে ফিরে এসে মিশরীয়রা তার পরাজয়কে মহা আনন্দে উদ্‌যাপন করছিল এবং এপিসের সম্মানে তাকে পূজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কেম্বিসেস তার তরবারি নিষ্কাশণ করে এপিসের মূর্তিকে আঘাত করেছিলেন।

কেম্বিসেস মিশরেই থেমে থাকতে চাননি। নীলের পশ্চিমে তিনি লিবীয়া এবং গ্রিক নগর সাইরেনি অধিকার করেন। এরপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দক্ষিণে নুবিয়ার উপর, এমনকি অনেক পশ্চিমে ফিনিসীয় উপনিবেশ কার্থেজের দিকে। তিনি নুবিয়ার দিকে যাত্রা করেন এবং পথে থিবিস অধিকার করে লুটপাট চালান (অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আসুরবনিপাল এই কাজটি করেছিলেন)। তিনি নুবিয়ার উত্তর অংশ দখল করতে সক্ষম হন এবং আরও রসদ এবং সৈন্য সরবরাহের জন্য ফিরে আসেন (বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণে হেরোডোটাস এটাকে অবমাননাকর পরাজয় হিসাবে গণ্য করে এবং দেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কেম্বিসেস আত্মহত্যা করেন)।

পারসিক রাজাদের মিশরের সপ্তবিংশ রাজবংশ হিসাবে গণ্য করা হয় আর পারসিকরাই ছিল প্রকৃত বৈদেশিক রাজবংশ। এটা লিবীয় বা নুবীয় রাজবংশের মতো ছিল না, যারা শুধু বংশধারা বাদ দিলে পরিপূর্ণ মিশরীয় ছিল। হিক্সসদের মতোও নয় যারা মিশরীয় হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পার্সিকরা সত্যিকারের বৈদেশিক রাজবংশরূপে শক্ত হাতে মিশর শাসন করেছিল।

AMARBOI.COM

এথেনীয়গণ

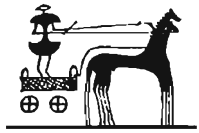

নিশ্চিতভাবে বলা যায় কোনো কোনো দিক দিয়ে পারসিক শাসন হিতকর ছিল। কেম্বিসেসের মৃত্যুর পর কয়েক মাসের গোলযোগ চলেছিল। রাজকীয় পরিবারের একজন সদস্য প্রথম দারায়ুস ক্ষমতা দখল করেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর দেশ শাসন করেন (৫২১-৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। প্রশ্নাতীতভাবে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সক্ষম পারসিক সম্রাট। মাঝে মাঝে তাকে বলা হয় "দারায়ুস দ্য গ্রেট"।

তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তার বিশাল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করেন এবং দৃঢ়ভাবে মিশর শাসন করেন। তিনি নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন সম্পন্ন করেন যা শুরু হয়েছিল নেকোর আমলে। এর ফলে মিশরীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে দারায়ুসের আমলে সকল মিশরীয় প্রাচীন রীতিনীতি বহাল থাকে এবং আমেসিসের আমলে মিশর যেমন সমৃদ্ধ ছিল তেমন সমৃদ্ধি লাভ করে। মিশরীয়দেরকে যে কর দিতে হতো তা খুব নিপীড়নমূলক ছিল না। তাহলে তার বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ থাকতে পারে?

তথাপি মিশরীয়দের পশ্চাতে ছিল তিন হাজার বছরের উন্নত ইতিহাস এবং তারা বিদেশি শাসনে নিষ্পেষিত বোধ করত, অন্য কোনো কারণ না থাকলেও তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি শুধু এই কারণে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। তারা আশা করে কোনো এক প্রান্ত থেকে পারস্যের উপর আক্রমণ নেমে আসবে এবং মিশরীয়রা সেই সুযোগ গ্রহণ করবে। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দারায়ুস ইউরোপে প্রবেশ করেন এবং দানিয়ুব নদী পর্যন্ত উত্তর গ্রীসের একাংশ দখল করেন।

গ্রীসের স্বাধীন নগররাজ্যসমূহ দারুণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার্থে যে কোনো ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত হয়। ৪৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন এশিয়া মাইনরের কিছু গ্রিক নগর যা পারস্যের শাসনাধীন ছিল, সেখানে বিদ্রোহ হয়। তাদের সাহায্যার্থে গ্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্স থেকে নৌবহর পাঠানো হয়। ক্ষুব্ধ দারায়ুস বিদ্রোহ দমন করেন এবং অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্য এথেন্সকে শাস্তি দিতে সংকল্প করেন।

৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি একটি ক্ষুদ্র পারস্য বাহিনীকে এথেন্সে প্রেরণ করেন। তবে সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক এথেনীয় বাহিনী ম্যারাথনের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীকে পরাস্ত করে। দারায়ুস আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে বৃহত্তর এক সেনাবাহিনী পাঠাবার পরিকল্পনা করেন।

মিশরীয়রা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এসব ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। এশিয়া মাইনরের যেসব গ্রিক নগর পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস দেখায়, নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তবে এথেনীয়গণ মিশরকে ঠেকিয়ে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারস্যকে যথেষ্ট শক্তিক্ষয় করতে হয়েছিল। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ দারায়ুসের পক্ষে এত বেশি দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটাই মিশরের সুযোগ।

ম্যারাথন যুদ্ধের পরিণতি দৃষ্টিতে রেখে মিশর বিদ্রোহ করে। প্রথম দিকে ভালোই চলে। ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দারায়ুসের মৃত্যু হয় এবং মিশর আশা করতে থাকে নতুন সম্রাটের প্রাথমিক ডামাডোলে মিশর তার স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে। দারায়ুসের পুত্র জারেক্সেস সিংহাসনে আরোহণ করে এথেন্স ও মিশরকে দেখতে পেলেন সমস্যাজর্জরিত। তাকে এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এথেন্সের বিরুদ্ধে তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছার কথা জারেক্সেসের জানা ছিল। এথেন্স একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র আর মিশর একটি বিরাট দেশ, সম্পদশালী ও জনবহুল। কাজেই প্রথমে মিশরের সাথে হিসাব নিকাশ চুকাতে হবে।

আপাতত গ্রীস আক্রমণের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয় আর বিশাল পারসিক সৈন্যবহর হতভাগ্য মিশরের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। মিশর পরাজিত এবং পদানত হয়। তবে এই কাজে পারস্যকে তিনটি বছর ব্যয় করতে হয়। কাজেই জারেক্সেসের গ্রীস আক্রমণ তিন বছর পিছিয়ে যায়। এই তিন বছরের বিলম্ব এথেন্স ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। তারা তাদের নৌশক্তিকে উন্নত করতে সময় পেয়েছিল। এই শক্তিশালী নৌবহরই ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে *সালামিসের* যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বিশ্ব, যা প্রাচীন গ্রীসের অনেক সংস্কৃতিকে বহন করে, ক্ষুদ্র গ্রীসের দৈত্যাকার পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়কে ডেভিড ও গুলিয়াথের বিস্ময়কর কাহিনীর সাথে তুলনা করা যায়। গ্রীসের এই বিস্ময়কর বিজয় গ্রীসের জনগণ পুরুষানুক্রমে পাঁচ শতাব্দী ধরে উপভোগ করে। তবে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মিশরের অসফল বিদ্রোহ না ঘটলে গ্রিকদের বিজয় হয়তো কখনোই সম্ভব হতো না।

মিশর যেমন বহুবার তার দুর্বল প্রতিবেশীদের ব্যবহার করেছে নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে, তেমনি এবার গ্রিকদের স্বার্থেও নিজেদের বলি দিতে হল।

মিশরকে গলা টিপে শান্ত করা যায়নি। পুরোহিতদের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে মিশর সর্বদাই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত থাকত। পারসিক শাসনের শেষ ভাগটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে বিবদমান উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই সুদূর মিশরে বিদ্রোহ দমনের তেমন সুযোগ ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা নূতন দুর্বল কোনো উত্তরাধিকারী দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, দূরবর্তী কোনো অভিযানে আগ্রহী নাও হতে পারেন।

কাজেই ৪৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন জারেক্সেসের মৃত্যু হয়, তখন সেটা ছিল আর একটি বিদ্রোহের ইঙ্গিত। এবার বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল লিবীয় মরুভূমির কিছু যাযাবর গোষ্ঠী। তারা নামমাত্র পারসিক শাসনের অধীনে থাকলেও মূলত ছিল স্বাধীন। তাদের দলপতিদের একজন ছিলেন ইনারস। তিনি তার সকল শক্তি নিয়ে ব-দ্বীপের দিকে অগ্রসর হলেন। যেখানে অনেক মিশরীয়ই মহানন্দে তার পক্ষ নিল। একটি তীব্র যুদ্ধের পর জারেক্সেসের ভাই, মিশরের গর্ভনর, নিহত হন এবং মিশর আবার স্বাধীন হল বলে মনে করা হয়।

পারস্য সমস্যার মধ্যে থাকলেই মিশরীয়রা নিজেদেরকে অধিকতর নিরাপদ মনে করত। সালামিসের যুদ্ধের সময় থেকেই এথেন্স পারস্যের সাথে অবিরাম যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যে যুদ্ধে তারা সর্বদাই সাম্রাজ্যের সীমান্তে খোঁচা দিত। এসব এথেনীয় কার্যকলাপে মিশরের মূল শক্তিকে ব্যাহত করতে পারেনি। তবে এর ফলে পারস্য তার সর্বশক্তিকে মিশরের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা মিশরীয় বিদ্রোহের ইঙ্গিত পেয়েই এথেনীয় নৌবহর বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।

তবে নতুন পারস্য সম্রাট (মিশরের দুর্ভাগ্য) তেমন দুর্বল ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথম জারেক্সেসের পুত্র *আর্তাজারেক্সেস*। তিনি মিশরে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিয়ে ব-দ্বীপের নিকট একটি দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। এখানে বিদ্রোহীদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের সঙ্গে ছিল এথেনীয় নৌবহর। কিন্তু আর্তাজারেক্সেস নীলের একটি শাখা নদীকে দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে জাহাজগুলি অসহায়ভাবে সৈকতে আটকা পড়ে গিয়েছিল এবং এথেনীয়দের দ্বিতীয় একটি নৌবহর দৃশ্যপটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই অর্ধেকটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। ৪৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়। গ্রিক শক্তির অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় এবং *ইনারসকে* বন্দী করে হত্যা করা হয়।

সম্পূর্ণ বিষয়টি এথেনীয়দের জন্য এক মহা বিপর্যয়। তবে ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বেশি কিছু উল্লেখ করা হয়নি, তার একটি কারণ ঘটনাটি ঘটে এথেন্সের স্বর্ণযুগে। তৎসত্ত্বেও এথেনীয় পরাজয়কে তার বৈদেশিক নীতির দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যাতে করে তার বন্ধুরা হয়ে পড়ে নিরুৎসাহিত এবং শত্রুরা হয় উৎসাহিত। যদি পারসিকদের বিরুদ্ধে প্রথম মিশরীয় বিদ্রোহ এথেন্সকে রক্ষা করে থাকে দ্বিতীয়টি তাকে ধ্বংস করায় সাহায্য করে।

সর্বশেষ স্বদেশীয়গণ

আবার মিশরের অপেক্ষার পালা। দুজন পারসিক রাজা এলেন এবং গেলেন। তাদের মধে দ্বিতীয়জন, দ্বিতীয় দারায়ুস ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এবার উত্তরাধিকার নিয়ে তীব্র বিরোধ শুরু হল। দারায়ুসের কনিষ্ঠ পুত্র এক বিশাল গ্রিক ভাড়াটিয়া বাহিনী নিয়ে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই জয়লাভ হল এবং তিনি দ্বিতীয় আর্তাজারেক্সেসরূপে শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে যে সময় এসব ঘটনা ঘটছে তখন মিশরীয়রা বিদ্রোহ করার যথেষ্ট সময় পায় এবং এক সংকটময় স্বাধীনতা লাভ করে।

ষাট বছর ধরে এই স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা গিয়েছিল মূলত গ্রিকদের সাহায্য নিয়ে। ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে এ সময় গ্রিক ভাড়াটিয়া সৈন্যদেরই আধিক্য ঘটল কারণ, এ সময় দুটি গ্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ৪৩১ থেকে ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। এ ক্ষেত্রে স্পার্টা বিজয় লাভ করেছিল এবং গ্রীসে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। দীর্ঘ যুদ্ধে সর্বস্বান্ত গ্রীসে সৈন্যদের কর্মসংস্থানের তেমন ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। কাজেই তারা স্বেচ্ছায় মিশর ও গ্রীসে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে যোগ দিত।

মিশরের সর্বশেষ স্বাধীনতার যুগে দুটি রাজবংশ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য মিশর শাসন করেছিল। তারা ছিল অষ্টবিংশ ও ঊনত্রিংশ রাজবংশ। সবাই অপেক্ষা করছিল সেই দুর্লভ সময়ের জন্য যখন পারস্য আবার শক্তিশালী হয়ে মিশরে ফিরে আসবে। ৩৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ যখন ত্রিংশ রাজবংশ ক্ষমতাসীন তখন মিশরীয় আগ্রাসন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল।

ত্রয়োবিংশ রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন প্রথম নেক্টানেবো। তিনি গ্রিক ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সাহায্যে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সৈন্যবাহিনীতে এথেনীয় জেনারেল *ক্যাব্রিয়াসকে* নিযুক্ত করলেন যার প্রচুর বিজয় লাভের রেকর্ড আছে। ক্যাব্রিয়াস এথেন্সের অনুমোদন ছাড়াই এই পদ গ্রহণ স্বীকার করলেন। তিনি মিশরীয় বাহিনীকে পূনর্গঠিত করলেন এবং সর্বশেষ যুদ্ধ কৌশলে তাদের প্রশিক্ষিত করলেন। আর ব-দ্বীপে একটি সুদৃঢ় সেনানিবাস গড়ে তুললেন যখন বিপরীত দিকে পারসিকরা সুসংগঠিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় আর্তাজারেক্সেস ক্যাব্রিয়াসের মুখোমুখি হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি এথেন্সের উপর চাপ সৃষ্টি করেন যাতে ক্যাব্রিয়াসকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। ক্যাব্রিয়াসকে মিশরীয় বাহিনী ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তবে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি তার আরব্ধ কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। পার্সিকরা যখন মিশর আক্রমণ করে, তারা এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় যে তারা মিশর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ৩৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম নেক্টানেবো মৃত্যুবরণ করেন। একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ জাতির শাসন সমাপ্ত হলো।

তার উত্তরাধিকার লাভ করেন *তিওস*। তার সামনে তখনও পারস্য একটি সমস্যারূপে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য সে সময় গ্রীসের পরিস্থিতি এক অস্বাভাবিক মোড় নিয়েছিল। গ্রিক নগরী থিবিস স্পার্টাকে পরাজিত করেছিল। তবে তার বহুশতাব্দীর সামরিক শৌর্যবীর্য হ্রাস পেয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে পৌঁছায়। তার দুই রাজার মধ্যে একজন ছিলেন *আজেসিলেউস* এবং সমসাময়িক গ্রিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ, যদিও তিনি স্পার্টাকে রক্ষা করতে পারেননি। স্পার্টার অবস্থা তখন এতই করুণ যে যুবাবস্থায় যে আজেসিলেউস গ্রীসের উপর কর্তৃত্ব করেছিলেন এবং এশিয়া মাইনরে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন, তিনি অর্থের বিনিময়ে তার প্রতিভাকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন, যে অর্থের সাহায্যে যুদ্ধ করে তিনি স্পার্টাকে রক্ষা করতে চান।

গর্বিত স্পার্টান রাজাকে এখন ভাড়াটিয়া হিসাবে কাজ করতে হচ্ছে। নিজেকে তিনি *তিওসের* কাছে বিক্রি করে তার এক স্পার্টান সেনাদল নিয়ে মিশরে উপস্থিত হন। তিওস শুধু হতাশভাবে এই বৃদ্ধ সেনাপতিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন (এ সময়ে আজেসিলেউসের ওসের বয়স হয়েছিল আশি বছর), ক্ষীণকায়, ক্ষুদ্র পঙ্গু এক ব্যক্তি। তিওস এই বৃদ্ধটির হাতে মিশরীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে রাজি হলেন না। তিনি শুধু ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিতে পারেন। ইতিমধ্যে ক্যাব্রিয়াস ফিরে এসে মিশরীয় নৌবহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তিওস এ সময় অনুভব করেন যে, তিনি এখন পারস্য আক্রমণের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। পারস্য ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার গ্রিক সৈন্যদল পারস্যের উপর দিয়ে ইচ্ছামতো কুচকাওয়াজ করে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করে দ্বিতীয় আর্তাজারেক্সেস বৃদ্ধ এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

অতএব মিশরীয় বাহিনী সিরিয়ার উপর আঘাত হানল। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এথেনীয়, স্পার্টান ও মিশরীয়দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সমস্ত পরিকল্পনাটিকে নস্যাৎ করে দিল। তার চেয়েও বড় কথা তিওসের একজন আত্মীয় সিংহাসন দাবি করে বসল আর তিওস যখন আজেসিলেউসকে আদেশ দিলেন তাকে দমন করার জন্য, তখন স্পার্টা তা প্রত্যাখ্যান করল। তিনি মিশরের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন, মিশরীয় জনগণের বিরুদ্ধে নয়।

তিওস পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন এবং নতুন দাবিদার দ্বিতীয় নেক্টানেবো মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আজেসিলেউসের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এবং তিনি স্পার্টায় ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে ফিরতি পথে সাইরেনিতে তার মৃত্যু হল। ৩৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় আর্তাজারেক্সেসের মৃত্যুর পর তার পুত্র তৃতীয় আর্তাজারেক্সেস উত্তরাধিকার লাভ করেন যার অধীনে পারস্য যথেষ্ট শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে।

৩৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় আর্তাজারেক্সেস মিশর আক্রমণ করেন। তবে মিশর তার গ্রিক ভাড়াটিয়া বাহিনীর সাহায্যে তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। তিন শতাব্দী ধরে মিশরীয়রা গ্রিক ভাড়াটিয়াদের ব্যবহার করে আসছে। তবে এবারই শেষবারের মতো তারা সফলকাম হয় (এরপর গ্রিকদের আক্রমণে মিশরীয়রা প্রভু ছিল না ভৃত্য হয়ে গিয়েছিল)।

সিরিয়ায় বিদ্রোহের কারণে পারস্য সম্রাটকে তার পরবর্তী উদ্যোগ বিলম্বিত করতে হয়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে বিরোধীতাকারীদের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। ৩৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি আর একবার মিশর অভিযান করেন এবার তিনি নিজেই সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এটি ছিল মূলত গ্রিকদের বিরুদ্ধে গ্রিকদের যুদ্ধ কারণ উভয় পক্ষেই ছিল গ্রিক ভাড়াটিয়া সৈন্য। দীর্ঘ সংগ্রামের পর পারসিক গ্রিকরা পেলুসিয়ামের যুদ্ধে মিশরীয় গ্রিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। পেলুসিয়ামের দৃঢ় অবস্থান ভেদ করতে সক্ষম হওয়ার পর পিছনে আর কিছুই বাকি রইল না যা পারস্য বাহিনীকে থামিয়ে দিতে পারে।

দ্বিতীয় নেক্টানেবো নুবিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তিনিই ছিলেন মিশরের সর্বশেষ বিষাদময় স্বদেশীয় শাসক। যে শাসন কাল শুরু হয়েছিল তিন হাজার বছর পূর্বে মেনেসের আমলে।

অর্ধ শতাব্দী পরে দ্বিতীয় নেক্টানেবোকে দিয়ে মানেথো মিশরীয় রাজবংশের ইতিহাস শেষ করেন। তবে আমরা আরও এগিয়ে যাব।

মে সি ডো নী য় গ ণ

আর্তাজারেক্সেস প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতার সাথে তার পারসিক শাসন কায়েম করেন, তবে সে শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গ্রীসে ঘটে যাচ্ছিল মহা ভয়ংকর সব ঘটনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী গ্রিক নগরীসমূহ পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, আর ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই যুদ্ধের বিরাম ঘটে। কোনো একক নগরী অন্য কারও উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এথেন্স, স্পার্টা, আর থিবিস চেষ্টা করেছিল ঠিকই, তবে সবার ভাগ্যেই জুটেছিল হতাশাজনক দুর্ভাগ্য।

তাহলে এই ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব কে দেবে? রশি টানাটানিতে যে প্রথম হতে পারে নিশ্চয়ই সে, কিন্তু কেউই তো বিজয়ী হতে পারেনি, আর মনে হচ্ছিল কেউই কোনো দিন বিজয়ী হতে পারবেনা। অন্তত নগর রাষ্ট্রের কেউ নয়।

গ্রীসের উত্তরে ছিল মেসিডন নামে এক রাজ্য। এরা গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি রপ্ত করেছিল, তবে গ্রিকরা সব সময় তাদের অর্ধবর্বররূপেই গণ্য করে এসেছে।

নিশ্চিত করেই বলা যায় এরা প্রাথমিক গ্রিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনো স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেনি। সেই মহান সময় যখন গ্রিক নগরসমূহ পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিল, সে সময় মেসিডোনীয়া পারস্যের অধীন ছিল এমনকি পারস্যের হয়ে যুদ্ধও করেছিল।

৩৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন মিশর তার স্বাধীনতার শেষ শ্বাসটি গ্রহণ করছে, তখন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব মেসিডোনীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সেই ব্যক্তিটি ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ, যিনি তার সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, ভারী অস্ত্রসজ্জিত অদম্য এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তারা দীর্ঘ বর্শা হাতে এমনভাবে সামনে অগ্রসর হতো যেন এক ঘন সন্নিবিষ্ট সজারুর দল এগিয়ে চলেছে।

ঘুষ, মিথ্যা, সামরিক প্রতিরোধ সবই যখন ব্যর্থ, তখন ফিলিপ উত্তর গ্রীসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। ৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক নগর থিবিসের নিকট *কায়রোনিয়ার* চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি থিবিস ও এথেন্সের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র গ্রীসে প্রাধান্য বিস্তার করলেন।

এবার তাহলে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেতে পারে, কারণ একজন উপযুক্ত নেতা পাওয়া গেছে। পরাজিত গ্রিক নগরবাসী সবাই এজন্য ফিলিপকে নেতা মনোনীত করলেন। তবে ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে, আর গ্রিক বাহিনী এশিয়া মাইনর অতিক্রম করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ফিলিপকে হত্যা করা হয়।

কিছুদিনের জন্য সমস্ত পরিকল্পনাটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছুদিন বিরতির পর ফিলিপের একুশ বছর বয়সী পুত্র তৃতীয় আলেক্সান্ডার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ফিলিপের নিয়ন্ত্রণাধীন নগর ও জাতিগোষ্ঠীগুলি মনে করল একুশ বছর বয়সী নাবালকের রাজত্বকালই বিদ্রোহ করার উপযুক্ত সময়, তবে এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই ছিলনা, কারণ অনেক দিক দিয়েই তৃতীয় আলেক্সান্ডার ছিলেন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত সঙ্কটজনক ও হতাশাব্যঞ্জক কোনো যুদ্ধেও পরাজিত হননি, তাছাড়া কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব করতেন না (আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলাফল দেখে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি সেসব সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক)। ঘটনাচক্রে তিনি তার সেনাবাহিনীতে কয়েকজন অত্যন্ত সুদক্ষ সেনাপতির সমাহার ঘটাতে পেরেছিলেন, একই সেনাবাহিনীতে যেমনটা আর কখনোই দেখা যায়নি (এদিক দিয়ে কেবল নেপোলিয়নকে ব্যতিক্রমরূপে গণ্য করা যেতে পারে)।

সিংহাসনে আরোহণ করেই আলেক্সান্ডার বিদ্রোহী জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন, আর প্রথম আঘাতেই তাদের পরাস্ত করলেন, ঝটিকা অভিযানে এগিয়ে গেলেন গ্রীসের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় আঘাতেই গ্রিক নগরগুলিকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি গ্রীস ছেড়ে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন।

ইতিমধ্যে আর্তাজারেক্সেস মারা যান ৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, আর কিছুকাল হট্টগোলের পর ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একজন শান্তশিষ্ট তবে দুর্বলব্যক্তি সিংহাসনের পথ খুঁজে পান, আর তিনি তৃতীয় দারায়ুস নামে শাসনভার গ্রহণ করেন। আলেক্সান্ডারকে কেউই সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারেনি (শীঘ্রই তিনি "আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট" নামে পরিচিতি লাভ করেন, তবে যত শাসক "গ্রেট" উপাধি লাভ করেন তার মধ্যে কেবল আলেক্সান্ডারের ব্যাপারেই কোনো প্রশ্ন ওঠেনা)।

পারসিকদের অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষাদল যারা ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তারা এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলের *গ্রানিকাস* নদীতীরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়।

আলেক্সান্ডার এশিয়া মাইনরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে আঘাত হানেন আর তার চাইতে অনেক বড়, কিন্তু গুণগত দিক থেকে সৈনাপত্যে নিম্নমানের পারসিক বাহিনীকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে *ঈসাস* শহরের যুদ্ধে পরাজিত করেন।

তারপর তিনি সিরীয় উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে নয় মাস অবরোধের পর *টায়ার* নগরী দখল করে নেন (সম্ভবত এটাই ছিল তার জীবনের সবচাইতে কঠিন যুদ্ধ– তবে নেবুচাদ্রেজারের তেরো মাসের অবরোধের কথা ভাবলে এটাকে তেমন বড় মনে হবেনা)।

৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেক্সান্ডার *পেলুসিয়ামের* সামনে এসে দাঁড়ালেন, তবে এখানে মিশর তার সাথে যুদ্ধে জড়ালো না, যেমনটা মিশর করেছিল সেনাকেরিব, ক্যাম্বিসেস আর তৃতীয় আর্তাজারেক্সেসের আমলে। এটা ঘটল মাত্র নয় বছর পরে যখন পারস্য *নেক্টানেবোকে* পরাজিত করে মিশরকে রক্তের নদীতে ভাসিয়েছিলেন, আর মিশরীয়দের মনে সেই ক্ষত তখনও শুকিয়ে যায়নি। তাই আলেক্সান্ডারকে ত্রাণকর্তারূপেই স্বাগত জানানো হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে আলেক্সান্ডার ঈসাসে থাকতেই মিশরীয়রা তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের দেশকে উদ্ধার করতে আবেদন জানায়।

আলেক্সান্ডার এই অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিতে মোটেই বিলম্ব করেননি। তিনি মিশরীয় রীতি অনুসরণ করে মিশরীয় দেবতার নামে বলি চড়াতে ভুল করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজেতা হিসাবে নয় বরং মিশরীয় ফারাও রূপেই তিনি পরিচয় দিতে আগ্রহী ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দিতে তিনি নীল নদের প্রায় তিনশ মাইল পশ্চিমে লিবিয়ার "সিব" মরুদ্যানে গিয়েছিলেন, যেখানে ছিল আমেনের এক শ্রদ্ধেয় মন্দির। সেখানে ফারাও হওয়ার সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছিলেন, এমনকি মিশরীয় রীতি অনুসারে নিজেকে আমেনের পুত্র বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধা করেননি। আলেক্সান্ডার যে একজন বিজেতার আত্মম্ভররূপে পরিচয় দিতে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এটা তারই প্রমাণ, আর এজন্য তিনি নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন, এছাড়া মিশরীয় পুরোহিতরা তাকে ফারাওরূপে স্বীকার করতনা। তবুও এটা একটা নজির স্থাপন করেছিল, এর সাড়ে ছয়শো বছর পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরও সেখানকার সম্রাটরা নিজেদের দেবত্ব আরোপে উন্মত্ততা প্রকাশ করত। অবশ্য এটা প্রথম দিকে গ্রিক রীতিসিদ্ধ ছিলনা। গ্রিকদের কাছে আমেন পরিচিত ছিল আমন নামে আর যেহেতু সতেরো শতাব্দী পূর্বে একাদশ রাজবংশের আমলে মিশরীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে তার স্বীকৃতি ছিল, তাই গ্রিকরা তাকে তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা "জিউসের" সমতুল্য মনে করত। কাজেই *সিবর* মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছিল "জিউস-আমনের" নামে।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সাথে এই মন্দিরের অদ্ভুত যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। মরুভূমিতে জ্বালানির খুব অভাব, আর তাই সিবর পুরোহিতরা উটের বিষ্ঠাকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করত। এর থেকে যে কালি মন্দিরের দেয়ালে লেগে থাকত তা দেখতে অনেকটা সাদা স্ফটিকের মতো মনে হতো আর তার নাম দেওয়া হয়েছিল ল্যাটিন ভাষায় "স্যাল এমোনিয়াক (আমনের লবণ)। আর এর থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তার নাম এমোনিয়া।

এভাবেই থিবিসের মহান দেবতা, ইখনাতন যাকে অস্বীকার করতে গিয়ে সফল হননি, আর যাকে দ্বিতীয় রামেসেস নিজের দ্বিতীয় স্থানের মর্যাদা দিয়েছিলেন, আজো তা এক ঝাঁজালো গ্যাসের মাধ্যমে টিকে রয়েছে।

আলেক্সান্ডার অবশ্য ফারাওরূপে বেশিদিন মিশরে থাকতে পারেননি, কারণ তাকে পারস্যের অবশিষ্টাংশ জয় করতে হবে, আর সেজন্য প্রয়োজন বহু বছরের অভিযানের। তার অনুপস্থিতিতে তিনি স্থানীয় মিশরীয়দের গভর্নররূপে মনোনীত করলেন, তবে তাদের উপর আর্থিক দায়িত্ব দেয়ার আস্থা পেলেননা (বিদ্রোহ করতে টাকার প্রয়োজন)। এই দায়িত্ব দিলেন তিনি নক্রেটিসের গ্রিকদের হাতে, যাদের একজন ছিলেন "কিস্নওমেনেস"। কর আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিটি হয়ে বসলেন মিশরের প্রকৃত শাসক, যদিও মুখরক্ষার খাতিরে শুধু উপাধিটি গ্রহণে বিরত রইলেন।

মিশর ত্যাগ করার পূর্বে আলেক্সান্ডার, নীলের সর্বদক্ষিণের একটি শাখা জরিপ করেন, যেখানে অবস্থান ছিল একটি ছোট্ট শহরের, শহরটির পশ্চিমে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরতলী নির্মাণের এলাকা চিহ্নিত করেন। নূতন শহরতলীসহ পুরাতন শহরটি তার সম্মানার্থে নামকরণ করা হয় আলেক্সান্দ্রিয়া। এই শহর নির্মাণের মধ্য দিয়ে ক্লিওমেনেস বুঝতে পারেন ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যে মিশরের ভিত নির্মাণ হলো, তা আর কোনো দিনই আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবেনা। এই শহরের পরিকল্পনাকারী ছিলেন *ডাইনোক্রেটিস,* যে শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা সরলরেখায় আর এগুলি সবসময় সমকোণে পরস্পরকে ছেদ করত।

আলেক্সান্ডার অনেকগুলি শহর নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন যাদের প্রায় সবগুলির নামই ছিল আলেক্সান্দ্রিয়া, তবে মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়াই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে নক্রেটিসের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। যেহেতু প্রাচীন বণিজ্যিক শহর টায়ার ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাই আলেক্সান্দ্রিয়াই হয়ে উঠেছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর, অনতিবিলম্বে যা পরিণত হয়েছিল মিশরের রাজধানীতে। এরপর প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিস ও থিবিস ধীরে ধীরে অবক্ষয়ে নিপতিত হলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

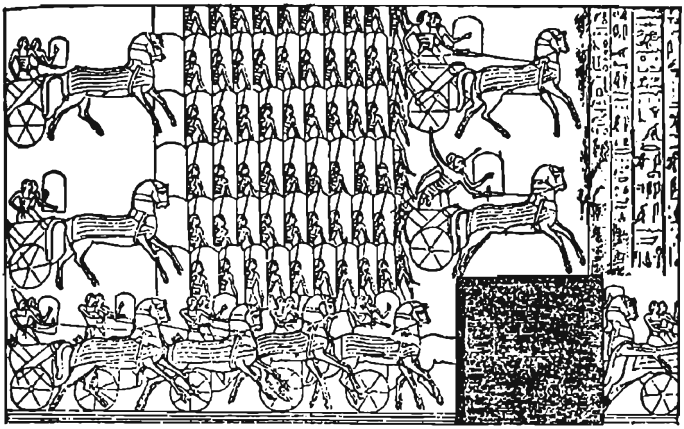

১০. টলেমীয় মিশর

প্রথম টলেমি

ক্লিওমেনিসের শাসনামলে মিশরের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল আর আলেক্সান্ডার যখন বিজয়োল্লাসে পারস্যের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন, ঘটনার ডামাডোলে তিনি কিছুটা পেছনে পড়ে গেলেন। এদিকে আলেক্সান্ডার ছোটবড় সব শহর দখল করার পর অবশেষে সমগ্র মিশরের সম্রাটরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন (পারস্যের শেষ সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিজের লোকজনের হাতেই নিহত হন)।

দূরদূরান্তে অভিযান শেষে আলেক্সান্ডার ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেবিলনে ফিরে এসে নূতন অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন আর তখনই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর, এক নব-যুবক, আর তিনি পেছনে কোনো সমর্থ উত্তরাধিকারীও রেখে যেতে পারেননি। তার ছিল এক ঝগড়াটে পারসিক মাতা, এক মানসিক জরাগ্রস্ত সৎভাই, আর এক মরণোত্তর পুত্র। এদের কাউকে হিসাবের মধ্যেই গণ্য করা যায়না।

প্রবাদ আছে মৃত্যুকালে আলেক্সান্ডারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কাকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে চান, শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে তিনি নাকি বলেছিলেন, "সবচেয়ে শক্তিমানকে।"

তিনি হয়তো এমনটা নাও বলে থাকতে পারেন, তবে তার জেনারেলরা এমনটা বলেছিলেন বলেই প্রচার করেছিল। তাদের প্রত্যেকেই এক একটা অংশ দখল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়, আর অন্য অংশগুলি কব্জা করতে উঠে পরে লেগে যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল ছিলেন টলেমী, সেলুকাস আর এন্টিগোনাস। শেষের জনের সহায়ক ছিল তার তদীয় পুত্র ডিমেট্রিয়াস।

টলেমী (অথবা গ্রিক রূপান্তর টলেমাইয়ুস) ছিলেন একজন মেসিডোনীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, রটনা রয়েছে তিনি ছিলেন ফিলিপের অবৈধ সন্তান, আর সেই সূত্রে আলেক্সান্ডারের সৎ ভাই (হয়তো এটা সঠিক নয়, আর রটনাটি টলেমী নিজেই ছড়িয়েছিলেন তার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার জন্য)।

আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর সাথে সাথেই টলেমী মিশরের গভর্নরের পদটি দখল করে নেন আর ক্লিওমেনেসকে মৃত্যুদণ্ড দেন (একজন দক্ষ শাসকের উপযুক্ত পুরস্কার)। টলেমী বেশ সুচিন্তিতভাবেই তার তার রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করেন। মিশর ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ, নীলের নিয়মিত বন্যা আর কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মিশর তৎকালীন বিশ্বের মধ্যে ছিল সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ।

টলেমী বেশ চাতুর্যের সাথে আলেক্সান্ডারের দেহাবশেষ এনে মেম্ফিসে সমাহিত করেন, যেহেতু আলেক্সান্ডারের ভাবমূর্তি তৎকালীন বিশ্বে সবচেয়ে উজ্জ্বল যাতে তার উপর আরোপিত হয়েছিল অর্ধ-দেবত্ব।

জেনারেলদের মধ্যে টলেমীই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তিনি বরং মিশরের শাসক হতে পেরেই সন্তুষ্ট, গোটা সাম্রাজ্য কব্জা করতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার কি প্রয়োজন? নীল উপত্যকা আর তার প্রবেশপথ তার আয়ত্তে থাকলেই হলো, যাতে সম্ভাব্য আক্রামকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, যাতে উত্তরের সমুদ্রপথে সংযোগ রক্ষা হতে পারে।

পশ্চিম দিকটাই সহজতর বলে মনে হয়েছিল। টলেমী চেয়েছিলেন শুধু সাইরেনি ও লিবীয় মরুদ্যান তার অধীনতা স্বীকার করুক, যেগুলি পারস্য ও আলেক্সান্ডারের অধীনে ছিল, আর এরা টলেমীর অধীনতা স্বীকারে তেমন ঝামেলা করেনি।

পূর্ব দিকেও তেমন সমস্যা ছিলনা। ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি সিরিয়ার দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বেশ চাতুর্যের সাথে যেরুজালেম আক্রমণ করেন সাবাথ ডে-তে। অতিধার্মিক ইহুদিরা সাবাথ ডে-তে যুদ্ধ করতে রাজি হয়নি, তাই বেশ বিনা বাধাতেই টলেমী যেরুজালেম অধিকার করে নেন।

সমস্যা দেখা দিয়েছিল উত্তরে। তিনি একটি নৌবহর সাজিয়ে গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সেসব এলাকায় কিছু মিত্র লাভ করা। সেখানে বাধা এল এন্টিগোনাস আর ডিমেট্রিয়াসের তরফ থেকে। আর সেখানে ৩০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিতা এবং পুত্রের নৌ আক্রমণে টলেমীকে এক চরম পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সে সময় এন্টিগোনাসের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর আর এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর আগে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়াসে এশিয়ার রাজা উপাধি ধারণ করলেন। টলেমীও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরাজয়ের জ্বালা বিনা বাধায় মেনে নিতে রাজি ছিলেননা। তিনিও নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন, এন্টিগোনাস ও ডিমেট্রিয়াসের সম্মিলিত বাহিনীর মিশর আক্রমণ প্রতিহত করলেন, আর তাতে করে তার নূতন উপাধিটির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

মিশরের রাজারূপে টলেমী এক বংশধারা প্রতিষ্ঠা করে গেলেন যা পরবর্তী তিন শতাব্দীব্যাপী টিকে ছিল, যেটা পূর্ববর্তী তিন সহস্রাব্দের মধ্যে কোনো রাজবংশই করতে সক্ষম হয়নি। এই রাজবংশকে বলা যেতে পারে মেসিডোনীয় রাজবংশ বা টলেমীর পিতা লাগিডের নামানুসারে *লাগিডীয়* বংশ বা মিশরীয় রীতি অনুযায়ী একত্রিংশ রাজবংশ।

সাধারণভাবে এই রাজবংশকে টলেমীয় বংশরূপে উল্লেখ করা হয়, কারণ এই বংশের সব রাজাই এই উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু টলেমী ও এন্টিগোনাসই একমাত্র জেনারেল ছিলেননা যারা রাজা হয়েছিলেন। সেলুকাস, যিনি বেবিলনিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনিও রাজা উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন। তার বংশধরদের বলা হতো সেলুকীয়, আর পশ্চিম এশিয়ায় তাদের রাজত্বকে বলা হয় সেলুকীয় সাম্রাজ্য।

উত্তরে মাত্র একবার পরাজিত হওয়ার জন্যই যে প্রথম টলেমী হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন তা নয়। তিনি তার নৌবহরকে পুনরায় সুসজ্জিত করে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। ৩০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ডিমেট্রিয়াস রোডস দ্বীপ অবরোধ করে বসেন, যেটা টলেমীর পরাজয় সত্ত্বেও মিশরের সাথে তার মিত্রতা বজায় রেখেছিল। রোডসবাসীরা বেশ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, আর টলেমী তাদের সাহায্যার্থে নৌবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ডিমেট্রিয়াস অবরোধ তুলে নিয়ে পিছু হটে যান। কৃতজ্ঞ রোডসবাসীরা টলেমীকে "সোটার" (ত্রাণকর্তা) উপাধি প্রদান করে।

আলেক্সান্ডারের পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, রাজারা একটা চটকদার উপনাম গ্রহণ করত যার মাধ্যমে একে অন্যের থেকে আলাদা করা যায়, আর ইতিহাসে তাদের চেনা যায়। সচরাচর যে রাজা যত কমজোর তার উপনামটা ততই চটকদার হতো। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় সব রাজাই এমনটা করত, তবে আমি শুধু তাদের সাথেই এটা যুক্ত করতে চাই মিশরের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে। তাই প্রথম টলেমীকে বলা যায় প্রথম সোটার।

যেহেতু সকল জেনারেলদের মধ্যে এন্টিগোনাসই ছিলেন সবচাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আর আপোসরফায় মোটেই আগ্রহী ছিলেননা, তাই টলেমী, সেলুকাস এবং আরও কিছু জেনারেল তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল, আর এই জোটের শর্ত অনুসারে টলেমী ও সেলুকাস তাদের মধ্যে সিরিয়াকে বাটোয়ারা করতে সম্মত হয়েছিল, টলেমীর ভাগে পড়েছিল দক্ষিণার্ধ।

এন্টিগোনাসের বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে টলেমীর ভয় ছিল হয়তো পরাজয় হতে পারে, আর তিনি তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করেছিলেন। ৩০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য এশিয়া মাইনরের *ইপসাসে* যখন যুদ্ধের শেষ পর্যায় চলছে– সেই পর্যায়ে এন্টিগোনাসই পরাজিত এবং নিহত হলেন, আর তার পুত্র ডিমেট্রিয়াস বিতাড়িত হয়ে সাময়িকভাবে নির্বাসনে চলে গেলেন।

সেলুকাসের তখন জয়জয়কার। তিনি প্রকৃতপক্ষে আলেক্সান্ডারের অধিকৃত এশীয় অঞ্চলের প্রায় পুরোটাই নিজের অধিকারে নিয়ে নিলেন। তদতিরিক্ত তিনি সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলও দাবি করে বসলেন, কারণ ইপসাসের যুদ্ধের পূর্বে পশ্চাৎমুখীনতার কারণে তিনি এই অঞ্চলের উপর তার অধিকার হারিয়েছিলেন। তবে টলেমী তার অধিকার ছাড়তে রাজি হননি। পরবর্তী এক শতাব্দী যাবৎ দক্ষিণ সিরিয়া ও বিশেষ করে জুডিয়া মিশরের অধিকারে রয়ে যায়। আট শতাব্দী পূর্বে তৃতীয় রামেসেসের পর এটাই মিশরের প্রথম এশীয় সাম্রাজ্য। তবু সিরিয়া প্রায় দেড় শতাব্দীব্যাপী টলেমীয় এবং সেলুকীয়দের মধ্যে বিবাদের বিষয় হয়ে রইল, আর এ নিয়ে অনেকগুলি যুদ্ধ ঘটে যায় যা উভয় বংশেরই ধ্বংসের কারণ।

টলেমীর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তার দীর্ঘ জীবন, যাকে মিশরেরও আশীর্বাদরূপে গণ্য করা যায়, তার নমনীয় এবং ন্যায়পরায়ণ শাসনের কারণে, যে জন্য তার রাজত্বের শেষ অবধি তিনি জনপ্রিয় শাসকের মর্যাদা লাভ করেন, যদিও তিনি ছিলেন একজন বহিরাগত। তিনিই প্রথম মিশরীয় সম্রাট যিনি ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন। মিশরের অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। তার রাজত্বের শেষ অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, তবে তার সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় ছিল অবন্ধুসুলভ সেলুকাসেরও দীর্ঘ জীবন।

২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ প্রায় ৮০ বছর বয়সে টলেমী শারীরিক ও মানসিভাবে সক্ষম আর রইলেন না। তিনি নিজেও অনুধাবন করলেন তার পক্ষে আর রাজকার্য সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এবার তাই তাকে তার উত্তরাধিকারী নিয়ে ভাবতে হবে, এমন একজন যে সেলুকাস ও তার উত্তরাধিকারীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

প্রথম টলেমীর অনেক পুত্র ছিল, তার মধ্যে দুজন (আলাদা মায়ের) ছিল গুরুত্বপূর্ণ। উভয়েই টলেমী নাম বহন করত। বয়ঃজ্যেষ্ঠজন টলেমী সেরোনাস বা "বজ্রপাণি সেরোনাস" আর কনিষ্ঠজন টলেমী ফিলাডেলফাস। এই নামটি তাকে দেওয়া হয় জীবনের শেষ পর্যায়ে যার কারণ আমরা পরে বুঝতে পারব।

প্রথমজন ছিলেন প্রকৃত বজ্রবিদ্যুৎ শক্তি, যেদিক দিয়ে যেত সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। আর সেই আগুনে নিজেও দগ্ধ হতো। কনিষ্ঠজন ছিলেন তার পিতার মতোই সুবিবেচক, নরমপন্থী। টলেমী বিনা দ্বিধায় সেরোনাসকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন এবং কনিষ্ঠপুত্রকে নিজের কাছে শাসনকার্যের অংশীদার করে রাখেন, এবং ২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কনিষ্ঠ পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। দীর্ঘ সফল রাজত্বের অবসানে ২৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

টলেমী সেরোনাস অবশেষে স্থান পেলেন সেলুকাসের রাজদরবারে, যিনি সানন্দে তাকে গ্রহণ করলেন। এই যুবা পুরুষের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন মিশরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ শাসককে, প্রয়োজনে যাকে তিনি হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পারবেন। সেলুকাস মোটেই টলেমীর মতো ছিলেন না। তার বার্ধক্য তাকে মোটেই সিংহাসন ত্যাগের হাতছানি দেয়নি। ক্ষমতার প্রলোভন তখনও তার মাঝে সক্রিয় আর এজন্য তিনি তখনও সংগ্রাম করে চলেছেন একজন সাহসি তরুণের মতো।

২৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি শেষ যুদ্ধ জয় করেন আর পরবর্তী এক যুদ্ধে আলেক্সান্ডারের এক বৃদ্ধ সেনাপতিকে পরাজিত ও হত্যা করতে সক্ষম হন। এদিকে প্রথম টলেমীর মৃত্যু হওয়ায় আলেক্সান্ডারের সেনাপতিগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, আর এটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার (এই বিজয়ের শিখরে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল সাতাত্তর বছর)।

তবে এই উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার বিজয়ের সুফল উপভোগ করার জন্য তিনি মেসিডোনে গমন করেন, আলেক্সান্ডারের দেশ তার অধিকারে নেওয়ার জন্য। তবে সেলুকাসের আগমনের সাথে সাথেই সেরোনাস তার কার্যক্রম শুরু করে দেন। মিশরের সিংহাসন তার হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে কোনো এক জায়গায় তো তাকে থিতু হয়ে বসতে হবে। আপাত অমর সেলুকাসের মৃত্যুর জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায়না। তাই ২৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ছুরিকাঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেললেন।

আলেক্সান্ডারের সেনাপতিদের সর্বশেষ ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটল, এবার টলেমী সোটারের দুই পুত্রই সিংহাসন দখল করে বসলেন। কনিষ্ঠ হলেন মিশরের আর জ্যেষ্ঠ মেসিডোনের অধীশ্বর। তবে জ্যেষ্ঠ, যিনি হত্যার মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তার ভাগ্যে বেশিদিন সিংহাসনে বসে থাকা লিখা ছিলনা। পরের বছরই উত্তরের বর্বরদের দ্বারা মেসিডোন আক্রান্ত হয়, আর ভয়ংকর এক ডামাডোলের মধ্যে সেরোনাস তার প্রাণ হারান।

আ লে ক্সা ন্দ্রি য়া

প্রথম টলেমী তার রাজ্য শাসন করতেন নূতন রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে, আর পরবর্তী সব টলেমীয়রাই তাই করেছেন। সত্যিকারের মিশর বলতে যা বোঝায় আলেক্সান্দ্রিয়া তার সবকিছুই, বিশেষ করে বহিরাগতদের কাছে। তবে মিশরীয়দের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার মোটেই কোনো গুরুত্ব ছিলনা। টলেমীয়রা মিশরীয় প্রথা এবং মিশরীয় দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, আর তাদের প্রার্থনাতেও যোগ দিত, আর সে কারণেই তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি, যেমনটা ঘটেছিল হিক্সস, আসিরীয় এবং পারসিকদের বিরুদ্ধে। তৎসত্ত্বেও মিশরীয়দের মনে হতো আলেক্সান্দ্রিয়া মিশরের মধ্যে অন্য এক দেশ। দেশটা শাসন হচ্ছিল গ্রিক রীতিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশটি গ্রিক আর ইহুদিতে ভরপুর (ওখানে ইহুদিদের আগমন ঘটে জুডিয়া থেকে যেটা সে সময় মিশরীয় শাসনাধীনে ছিল)।

হয়তো মিশরীয়দের দিক থেকে দেখতে গেলে এটাও ছিল মঙ্গলজনক। গ্রিকদের রাজধানীতে আটকে রাখতে পারায় সমগ্র মিশর ছিল মিশরীয়দের।

অনেকে মনে করত, আলেক্সান্দ্রিয়ার এক তৃতীয়াংশ গ্রিক, এক তৃতীয়াংশ ইহুদি আর এক তৃতীয়াংশ মিশরীয়। এর সম্পদ, এর আধুনিকায়ন, বিশ্বজনীয়তার কথা বিবেচনায়, আর অতীতচারিতা থেকে মুক্তির কথা বিবেচনা করে বলা যায় আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল সেকালের নিউইয়র্ক।

প্রথম টলেমী এবং তার পুত্র দ্বিতীয় টলেমী আলেক্সান্দ্রিয়াকে শুধু বৃহৎ, জনবহুল এবং সম্পদশালী করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। উভয়েই চেষ্টা করেছিলেন একে একটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে, আর এ ব্যাপারে তারা সাফল্যও লাভ করেছিলেন (এদিক থেকে প্রথম দুজন টলেমীর মধ্যে কে কতটা এগিয়ে সেটা নির্ণয় করা বেশ কঠিন)।

প্রথম টলেমী নিজেও একজন লেখক ছিলেন আর তিনি সোজাসাপ্টা গদ্যে আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের জীবনী লিখেছিলেন। এটা দারুণ আফসোসের ব্যাপার যে এই বিখ্যাত বইটির মূল কপি আমাদের হাতে আসেনি। তবে এর চারশ বছর পরে একজন গ্রিক ঐতিহাসিক *আরিয়ান* আলেক্সান্ডারের জীবনী লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন সেটি মূলত প্রথম টলেমীর বইয়ের উপর ভিত্তি করে। আরিয়ানের লেখা আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে আছে আর তার মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে আমরা প্রথম টলেমীর বই সম্বন্ধে জানতে পারি।

টলেমী মহান গ্রিক দার্শনিক এরিস্টোটলের লাইব্রেরি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন, আর তার সংগ্রহ বৃদ্ধি করার সব চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি তার লাইব্রেরি সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত করার জন্য একজন এথেনীয় লাইব্রেরিয়ানকে আমদানি করেছিলেন, যার ফলে আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লাইব্রেরিতে পরিণত হয়। বর্তমান কালের ছাপাখানা আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত পরবর্তী সতেরো শতাব্দীব্যাপী তার সাথে তুলনীয় কোনো লাইব্রেরি গড়ে ওঠেনি।

লাইব্রেরি সংলগ্ন মিউজের এক মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল, (গ্রিক ভাষায় মৌজিয়ন আর রোমান ভাষায় মিউজিয়াম) যেখানে পণ্ডিতেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এথেন্স, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বে গ্রিক বিদ্যাচর্চার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, আলেক্সান্দ্রিয়ার কাছে তা ম্লান হয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে পণ্ডিতেরা সমবেত হতে থাকে (যেখানে অর্থ, সেখানে মেধা পাচার হতে থাকে, এখন যেমন হচ্ছে আমেরিকায়)। এই কেন্দ্রের শীর্ষ সময়ে এখানে ১৪০০ ছাত্রের সমাগম ঘটেছিল, আধুনিক মাপকাঠিতেও বলা যায় এটি ছিল বিশাল এক বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আলেক্সান্দ্রিয়াতেই *ইউক্লিড* তার জ্যামিতির সূত্র আবিষ্কার করেন, *ইরাতোস্থেনিস* পৃথিবীর পরিধি নিরুপণ এবং *হেরোফাইলাস* ও *ইরাসিস্ত্রেতাস* শারীরতত্ত্বে অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন আর *তেসিবাস* আবিষ্কার করেন জলঘড়ি।

আলেক্সান্দ্রিয়ার বিদ্যাচর্চা মূলত গ্রিক ধাঁচের, তবে এতে মিশরীয় প্রযুক্তির যথেষ্ট অবদান ছিল। তাত্ত্বিক দিক থেকে মিশর গ্রীসের পেছনে থাকলেও, প্রযুক্তির দিক দিয়ে তারা গ্রীসের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল। বহু শতাব্দীর মমি তৈরির অভিজ্ঞতা তাদের রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

গ্রিক পণ্ডিতেরা মিশরীয় জ্ঞান আত্মস্থ করার ব্যাপারে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। মিশরীয়দের কাছে ইবিসের মুণ্ডযুক্ত দেবতা "থথ" ছিল সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর গ্রিকরা তার সাথে নিজেদের দেবতা *হার্মিসকে* মিলিয়েছিল। তারা বলত হার্মিস ট্রিসমেজিস্ট্রাস (ত্রিগুণাত্মক হার্মিস) আর তার ছত্রছায়ায় যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল তাকে বর্তমানে বলা হয় *আলকেমি*।

টলেমীয়রা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে গ্রিক থাকলেও তারা মিশরীয় সংস্কৃতিকে যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদান করত। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় টলেমী মিশরের ইতিহাস রচনায় মানেথোকে সহায়তা দিয়েছিলেন, আর নীলের এক নৌযাত্রায় সাহচর্য দিয়েছিলেন।

টলেমীয়রা মিশরীয় ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। তারা গ্রিক আর মিশরীয় সমন্বয়ে এক নূতন ধর্মের উদ্ভাবনের চেষ্টা করে, যেটা নিজেদের অনুকূলে যায়। যেমন *ওরিসিস আর এপিসের* সমন্বয়ে গ্রিক দেবতা *সেরাপিস*, তাকে সম্পৃক্ত করা হয় *জিউসের* সাথে আর প্রথম টলেমী তার সম্মানার্থে আলেক্সান্দ্রিয়ায় এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন। এটাই *সেরাপিওন* বা তার রোমান রূপান্তর *সেরাপিয়াম*।

মিশরীয় রীতি অনুসারে ফারাওরা যেমন ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহপাশে আবদ্ধ হতো, দ্বিতীয় টলেমী তার অনুসরণ করে নিজের ভগ্নী আর্সিনোয়েকে বিবাহ করেন, ইতিপূর্বে যার বিবাহ হয়েছিল তার সৎ ভাই টলেমী সেরোনাসের সাথে। তাদের বিবাহবন্ধন ছিল অত্যন্ত সুখকর, তবে তারা দুজনেই যৌবনোত্তীর্ণ হওয়ায় তাদের কোনো সন্তান জন্মেনি।

এমনকি ইহুদিরাও টলেমীয়দের আনুকূল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে টলেমীয়দের প্রারম্ভিককালে তারা ইহুদিদের এক প্রাচীন ইতিহাসের ধারক বাহকরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যাদের অধিকারে ছিল অনেক আকর্ষণীয় পবিত্র গ্রন্থ। এই কথা মনে রেখেই প্রথম টলেমী সাবাথ ডে-তে যেরূজালেম আক্রমণ করেন, কারণ তিনি জানতেন ঐদিন তাকে ইহুদিদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবেনা। টলেমীয়রা ইহুদিদের আজব সব প্রথা পালনের অনুমতি দেয় আর আলেক্সান্দ্রিয়ায় তারা অনেকটাই স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেক্সান্দ্রিয়ার পরিবেশ অভিবাসী ইহুদিদের জন্য এতটাই অনুকূল করে তোলা হয়েছিল যে, ইহুদিরা শীঘ্রই জুডিয়ায় ব্যবহৃত আরামীয় অথবা যে হিব্রু ভাষায় তাদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত তার পরিবর্তে তারা গ্রিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

গ্রিক ভাষায় অনূদিত বাইবেলকে বলা হয় *সেপ্টুয়াজিন্ট*, গ্রিক ভাষায় যার অর্থ "সত্তর," কারণ কথিত আছে যে সত্তরজন পণ্ডিত এই অনুবাদের কাজটি করেছিল।

ল্যাটিন ভাষায় যে বাইবেলের অনুবাদ হয়েছিল তা এই সেপ্টুয়াজিন্টেরই অনুবাদ। কাজেই প্রাথমিক খ্রিস্টীয় যুগে এই সেপ্টুয়াজিন্টেরই প্রচলন ছিল, সেটা গ্রিকই হোক আর ল্যাটিনই হোক। তাই বলা যায় টলেমীয়দের বাইবেলের অনুবাদ সমগ্র খ্রিস্টীয় জগতে অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে।

দ্বিতীয় টলেমী তার মেসিডোনীয় উত্তরাধিকারের কথাও ভোলেননি। তিনি আলেক্সান্ডারের মরদেহ মেম্ফিস থেকে আলেক্সান্দ্রিয়ায় এনে সমাহিত করেন, আর এর উপর সুদৃশ্য এক সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমী ধন্যবাদার্হ এজন্য যে তারা আলেক্সান্দ্রিয়াকে বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেই নয়, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেও গড়ে তোলেন। আর এটা টিকে ছিল পরবর্তী প্রায় নয় শতাব্দী যাবৎ।

ক্ষমতার শীর্ষে টলেমীয়গণ

দ্বিতীয় টলেমী মিশরের সমৃদ্ধির প্রবাহ ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। নীলের সাথে যে খাল সংযোগ মিশরের অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক তার কার্যক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তিনি খাল কেটে নীলের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, তিনি নীলের উজান অঞ্চল আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি লোহিত সাগরের তীরে সেনানিবাস ও শহর স্থাপন করেছিলেন, যাতে আরব উপকূলে ব্যবসাবাণিজ্য নিরাপদ করা যায়।

তাছাড়া তিনি লেক মোয়েরিস সম্বন্ধে ফারাওদের গৃহিত নীতির সংশোধন করেন। এর পানির উচ্চতা বৃদ্ধির পরিবর্তে তিনি এর পানি সেচে ফেলে খাল খননের দ্বারা নীলের মিঠাপানি সরবরাহ করে আশপাশের এলাকাকে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেন। এর ফলে সেই এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অনেক শহর গড়ে ওঠে। পরবর্তী চার শতাব্দী যাবৎ এই এলাকাটি মিশরের সবচাইতে সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়।

ভূমধ্যসাগরে নৌচলাচল নিরাপদ করার জন্য দ্বিতীয় টলেমী আলেক্সান্দ্রিয়ার অদূরে ফারোজ দ্বীপে প্রায় ৮০০ ট্যালেন্ট (আধুনিক মুদ্রায় প্রায় বিশ লাখ ডলার) ব্যয় করে একটি লাইটহাউস নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রাচীন বিশ্বে এটাই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বড় লাইটহাউস। গ্রিকরা অবাক বিস্ময়ে একে বলেছিল বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের একটি। এর বর্গাকৃতি ভিত্তিভূমির প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ ফিট, এর উচ্চতা (বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে ২০০ থেকে ৮০০ ফিট), যার শীর্ষদেশে সবসময় একটা মশাল জ্বলত। সবচেয়ে বড় আকারে নির্মিত হয়েছিল সমুদ্র-দেবতা পোসিডনের মূর্তি। প্রজ্বলিত কাঠের অগ্নিকুন্ড বিশ মাইল দূর থেকে দৃশ্যমান ছিল। এর নির্মাণ-কৌশল এখন আর জানা সম্ভব নয়, কারণ এটি নির্মাণের পনেরো শতাব্দী পরে এক প্রবল ভূমিকম্পে এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

তবে টলেমীয় এবং সেলুকীয়দের মধ্যে বিবাদ চলতে থাকে। প্রথম সেলুকাসের উত্তরাধিকার লাভ করেন তার পুত্র প্রথম এন্টিয়োকাস। আর পুত্রে পুত্রে শত্রুতা কখনোই প্রশমিত হয়নি। ২৭৬ থেকে ২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ চলে "প্রথম সিরীয় যুদ্ধ" আর এতে জয়যুক্ত হয় মিশর, যাতে করে দ্বিতীয় টলেমী তার অধিকার সম্প্রসারিত করেন ফিনিসিয়া ও এশিয়া মাইনরের অংশ বিশেষের উপর। দ্বিতীয় সিরীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় এন্টিয়োকাস ও তৃতীয় সেলুকীয় রাজার মধ্যে ২৬০ থেকে ২৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এটা মিশরীয়দের জন্য তেমন সৌভাগ্যের ছিলনা, আর এতে পূর্ববর্তী কিছু অর্জনও হারাতে হয়েছিল। সম্ভবত বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টলেমীর সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি ছিল এমন একটি বিষয় যাকে সে সময় তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়নি। ইতালিতে রোম নামে একটি নগরী ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল, যা উপদ্বীপের অধিকাংশই দখল করে বসেছিল। যে সময় দ্বিতীয় টলেমী মিশরের সিংহাসনে, ততদিনে মধ্য ইতালির অধিকাংশই রোমের অন্তর্গত যা দক্ষিণের গ্রিক নগরসমূহের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গ্রিকরা আলেক্সান্দারের দূর সম্পর্কের আত্মীয় পাইরাস নামে একজন মেসিডোনীয় জেনারেলকে তাদের সাহায্যার্থে আহ্বান করেছিল। পাইরাস ছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে অতি-উৎসাহী একজন জেনারেল আর তিনি বেশ আগ্রহভরে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হস্তিবহরযুক্ত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন আর দুইবার রোমানদের পরাজিত করেন। রোমানরা অবশ্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধে লেগে থাকে আর অবশেষে ২৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাইরাসকে পরাজিত করে, আর তাকে ইতালি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা দক্ষিণ ইতালির প্রায় সবগুলি গ্রিক নগর দখল করে নেয়।

দ্বিতীয় টলেমী গ্রিক সহানুভূতির দ্বারা মোটেই মোহিত হননি। তার মনে হয়েছিল রোমানরা একটি উঠতি জাতি, আর তাই তাদের বিপক্ষে থাকার চাইতে সাথে থাকা অনেক ভালো। তাই তিনি গ্রিকদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করেন, আর সিসিলিকে নিয়ে যখন কার্থেজে রোমানরা এক যুদ্ধে লিপ্ত, তখনও টলেমীয়রা রোমানদের সহায়তা দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মৈত্রী মিশরীয়দের এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল যেখান থেকে তারা কখনো সরে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় টলেমীর মৃত্যুর পর তৃতীয় টলেমী সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। মিশর আবার একজন তেজস্বী বুদ্ধিদীপ্ত শাসক লাভ করল। তিনি সাইরিন পুনর্দখল করেন কিছুদিনের জন্য যা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল।

তবে সেলুকীয়দের সাথে তাদের বিবাদ অবিরাম চলে আসছিল, আর এখন পারিবারিক দ্বন্দ্বে তা আরও ঘনীভূত হলো।

অবশেষে প্রথম সিরীয় যুদ্ধের সমাপ্তিতে দ্বিতীয় টলেমী তার কন্যা, যুবরাজের ভগ্নী বেরেনিসকে আর এক যুবরাজ, পরবর্তীকালে যিনি দ্বিতীয় এন্টিয়োকাসরূপে সিংহাসন লাভ করেন, তার সাথে বিবাহ দেন।

দ্বিতীয় টলেমী যে বছর মারা যান সেই একই বছরে সিংহাসনে আরোহণের অনতিবিলম্বে মারা যান দ্বিতীয় এন্টিয়োকাস। কাজেই দ্বিতীয় টলেমী আশা করেছিলেন তার বোনের শিশু সন্তানই চতুর্থ সেলুকীয় রাজারূপে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। তবে দ্বিতীয় এন্টিয়োকাসের পূর্ববর্তী আরও এক স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তিনি বেরেনিস ও তার শিশু পুত্রকে হত্যা করান এবং তার নিজের পুত্র দ্বিতীয় সেলুকাস সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৃতীয় টলেমীর জন্য যুদ্ধ শুরু করার এটাই পর্যাপ্ত কারণ। তার ভগ্নীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি সেলুকীয় রাজ্যে অভিযান শুরু করেন, আর এটাই ছিল তৃতীয় সিরীয় যুদ্ধ। তিনি অভিযান চালিয়ে বেবিলন দখল করে নেন। মিশরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি, বলা যায় এর মাধ্যমে টলেমীয় শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ। হাজার বছর পূর্বে দ্বিতীয় রামেসেসের পর মিশরীয়রা আর কখনোই পৃথিবীতে এত শক্তিধর হতে পারেনি।

তবে তৃতীয় টলেমী বুঝতে পেরেছিলেন তার অগ্রাভিযানের মধ্যে কিছুটা অবাস্ত বতা ছিল। সাময়িকভাবে যে ভূমি তিনি দখল করেছেন তা চিরকাল দখলে রাখা হয়তো সম্ভব হবেনা। তাই স্বেচ্ছায় সেলুকীয়দের ভূমি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে এলেন। শুধু মিশরের নিকটবর্তী কিছু অঞ্চল, যেটুকু লাভজনকভাবে নিজের অধিকারে রাখতে পারবেন, তাই রাখলেন।

তিনি শুধু সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কিছু মূর্তি আর ধর্মীয় উপকরণ ইতিপূর্বে তিন শতাব্দী আগে ক্যাম্বিসেস যেসব মিশর থেকে নিয়ে গিয়েছিল, এবং সেগুলি স্বস্থানে রেখে দিলেন। কৃতজ্ঞ মিশরীয়রা তাকে উপাধি প্রদান করেছিল "ইয়ুর্জেটিস" (মহৎ উপকারী)। আর এভাবেই তৃতীয় টলেমী ইতিহাসে পরিচিত ইয়ুর্জেটিস নামে। সেলুকীয় রাজ্যে টলেমীয় অভিযান নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তার রানি, সেরেনীয় যুবরাজ্ঞী বেরেনিস তার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন, আর এটা নিশ্চিত করণের জন্য নিজের চুল কেটে দেবতা এফ্রোডাইটের মন্দিরে সমর্পণ করেন। চুলগুলি চুরি হয়ে যায় আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এক পুরোহিত তাকে বলে, চুলগুলি দেবতা স্বর্গে নিয়ে গেছে, আর কিছু অস্পষ্ট তারকা দেখিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ওগুলিই তার চুল। আজো সেই তারকা মণ্ডলকে বলা হয় "কোমা বেরেনিসেস" বা বেরেনিসের চুল।

টলেমীর যুদ্ধংদেহী শৌর্যের প্রকাশ আরও একটা দিকে দৃশ্যমান আর তা হলো, তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে নুবিয়ায় প্রবেশ করেন, ইতিপূর্বে যেমনটা ঘটেছিল ফারাওদের সময়ে।

শান্তির আবহেও তৃতীয় টলেমীর অনীহা ছিলনা। তার পিতা ও পিতামহের মতো তিনিও প্রবল আগ্রহে মিউজিয়ামে সহায়তা দিয়ে যান। তার সময়ে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০,০০০, আর তিনি সকল আগ্রহী আগন্তুককেই বই কপি করে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সকল টলেমীয় সম্রাটই এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্টজনও শিল্প সংস্কৃতির মহা উৎসাহী ছিলেন।

তৃতীয় টলেমী ইহুদিদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন অব্যাহত রাখেন। তিনি তাদের গ্রিকদের সমতুল্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। এমনকি সেলুকীয় অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যেরুজালেমের মন্দিরে প্রথাসিদ্ধ বলি প্রদান করেন।

২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় টলেমীর মৃত্যু হয়। পেলুসিয়ামে আলেক্সান্ডারের আগমনের পর থেকে ১১১ বছর ধরে মিশর অত্যন্ত উন্নত সুশাসন লাভ করে। স্বদেশীয় ফারাওদের দীর্ঘ শাসনেও এমন নজির নাই। আলেক্সান্ডার, ক্লিওমেনেস এবং তিনজন টলেমীয় শাসনে মিশর লাভ করেছিল নিরাপত্তা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি।।

তবে এই সুদিনে আবার অবক্ষয়ের সূত্রপাত হলো।

অবক্ষয়ে টলেমীয়গণ

মহান ইউয়ের্জেতিসের জ্যেষ্ঠপুত্র চতুর্থ টলেমী নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ফিলোপেটার (পিতার স্নেহভাজন) উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তার প্রথম কর্তব্য ছিল তার মাতা বেরেনিস এবং ভগ্নীকে হত্যা করা। কাজেই এটা সহজবোধ্য যে তার পিতার উপাধি গ্রহণ ছিল লোক দেখানো মাত্র। হয়তো এমনটা নাও হতে পারে। ঐতিহাসিক দলিলের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় কল্পকথাকেই সম্বল করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে চটকদার কথাই টিকে থাকে, সেটা যতই মর্মন্তুদ হোক না কেন।

নূতন টলেমী ছিলেন একজন দুর্বল এবং বিলাসপ্রিয় শাসক। তিনি তার শাসনকার্য ছেড়ে দিয়েছিলেন তার মন্ত্রী এবং পছন্দের লোকদের উপর এটা ছিল মিশরীয়দের জন্য বিশেষ দুর্ভাগ্যজনক, কারণ সেলুকীয় সাম্রাজ্যে তখন একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধর উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ক্ষমতাসীন। তৃতীয় এন্টিয়োকাসের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সেলুকাস ২২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেলুকীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় টলেমীর হাতে তার পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়ে তৃতীয় এন্টিয়োকাস চতুর্থ সিরিয়ার যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীর সম্মুখীন হন। যুদ্ধটা ঠিক এমন সময়ে যখন মহান টলেমী সবেমাত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রাথমিকভাবে তৃতীয় এন্টিয়োকাসেরই জয়লাভ হয়, তবে ২১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মিশর সীমান্তে রাফিয়ার যুদ্ধে স্বয়ং চতুর্থ টলেমীর নেতৃত্বে মূল মিশরীয় বাহিনীর সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষেই ছিল হস্তিবহর। এন্টিয়োকাসের এশীয় হস্তি, আর টলেমীর বৃহৎ তবে কম সচল আফ্রিকীয় হস্তি। এটাই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে দুই প্রজাতির হস্তি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। এশীয় প্রজাতি এখানে বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও এশীয় সৈন্যবাহিনী পরাজয় বরণ করে। মিশরীয় বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় লাভে সমর্থ হয় যাতে করে মনে হয়েছিল টলেমীয়দের সৌভাগ্য এবার চিরস্থায়ী হবে।

সেলুকীয় বাহিনীর অগ্রগতির চাপে মিশরীয় সরকার বাধ্য হয়েছিল তাদের সেনাবাহিনীতে দেশীয় লোকদের বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করতে। এটা মিশরীয় সরকারের একটি দুর্ভাগ্যজনক পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। টলেমীয় শাসন আর আগের মতো রইল না এবং সশস্ত্র মিশরীয়গণ মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করত যদিও সেটা সাংঘাতিক হয়ে উঠেনি।

চতুর্থ টলেমী এবং তার মন্ত্রিপরিষদ ঢাকনা বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যতদিন চতুর্থ টলেমী জীবিত ছিলেন, ততদিন মিশর তার নিয়ন্ত্রণে ছিল আর তৃতীয় এন্টিয়োকাস নিজেকে অন্যত্র ব্যস্ত রেখেছিল।

চতুর্থ টলেমীর একটা অস্বাভাবিক খেয়াল ছিল। তিনি বিশাল বিশাল সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন– যেগুলি এত বড় ছিল যে সেগুলি তেমন ব্যবহার উপযোগী হতে পারেনি, কারণ এগুলি ছিল মহাবিদঘুটে এবং সফলভাবে চালনার অনুপযোগী। সবচেয়ে বড় জাহাজটি ছিল ৪২০ ফিট লম্বা এবং ৫৭ ফিট চওড়া। এর ছিল চল্লিশ সারি বৈঠা এবং সে বৈঠা চালানোর জন্য একপাল দাঁড়ি মাঝি। দেখে মনে হতো এক দৈত্যাকার কেন্নুই। এটা দারুণ দর্শনীয় হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল বিপজ্জনক।

চতুর্থ টলেমীর শাসনকাল একটি হতাশাজনক ঘটনার জন্ম দেয় যা গ্রীসের অবক্ষয় ডেকে আনে। মেসিডনে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় থেকে উত্তরের রাজ্যগুলি গ্রিক নগরসমূহের উপর আধিপত্য করত। নগরগুলি স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, যেটা সব সময়ই মেসিডনের পক্ষে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৩০ অব্দে যখন তৃতীয় টলেমী মিশরের সিংহাসনে আসীন তখন স্পার্টায় ক্ষমতাসীন তৃতীয় ক্লিওমেনিস নগরটিকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন, অর্ধশতাব্দী পূর্বে যা ছিল গ্রীসের প্রধান চালিকা শক্তি। "একিয়েন লীগ" (স্পার্টার উত্তরের কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরের সম্মিলন) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে তারা ক্লিওমেনিসের দ্বারা পরাজিত হয়ে মেসিডনকে আহ্বান করে, যা ছিল গ্রীসের স্বাধীনতায় শেষ পেরেক। ২২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসিডোনীয়া ক্লিওমেনিস ও তার স্পার্টান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে। রাজা এবং তার কিছু সহচর পালিয়ে গিয়ে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তৃতীয় টলেমী তাদের সাদরে গ্রহণ করেন, সম্ভবত এ কারণে যে তাদের মেসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। চতুর্থ টলেমী সিংহাসনে আরোহণ করে ক্লিওমেনিসকে দেখতে পেলেন এক আপদরূপে এবং তাকে আলেক্সান্দ্রিয়ায় গৃহবন্দী করে রাখলেন।

২২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কারাবন্দী হয়ে ক্লিওমেনিস যখন হতাশায় ভুগছেন, চতুর্থ টলেমীর আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে অনুপস্থিতিতে তার একটা সুযোগ এসে গেল। তিনি কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে টলেমীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে উদ্দীপনাময় ভাষণ দিতে শুরু করলেন যেন তারা বিদ্রোহ করে গ্রিক ধারায় স্বাধীন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। তবে মিশরীয়রা অবাক বিস্ময়ে তার ভাষণ শুনল কিন্তু তাদের কাছে এসব কথা অর্থহীন, কারণ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় তাই তারা জানতনা। যে ক্লিওমেনিসের জন্ম সময়ের পূর্বে, তার বোকামী বুঝতে পেরে নিজেই আত্মঘাতী হলেন।

২০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চতুর্থ টলেমীর মৃত্যু হয় এবং প্রথমবারের মতো টলেমীয়দের একজন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারীর অভাব হলো। যে রাজকুমার উত্তরাধিকার লাভ করেন তিনি পাঁচ বছর বয়সী এক বালক পঞ্চম টলেমী। যাকে বলা হয় "টলেমী এপিফেস" অথবা ঈশ্বরের অবতার টলেমী, যদিও এই বালকটি মোটেই সে রকম ছিলেন না। মিশরীয় সরকার প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সরকারি কর্মকর্তারা ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে দেশীয়রা বিদ্রোহ করে বসে।

শুধু এটাই যথেষ্ট নয়, তৃতীয় এন্টিয়োকাস বুঝতে পারলেন এটাই সুযোগ। রাফিয়ার যুদ্ধের পর এতদিন তিনি এশীয় অঞ্চল, যা ইতিপূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে অভিযান চালিয়ে সময় ক্ষেপণ করেছিলেন, যে অঞ্চল ইতিপূর্বে আলেক্সান্ডার অধিকার করেছিলেন এবং প্রথম সেলুকাস উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তবে বর্তমানে তৃতীয় এন্টিয়োকাস তাদের জোর করে সেখান থেকে বের দেয় এবং তার সাম্রাজ্য, অন্তত কাগজে কলমে ছিল বিশাল। তিনি নিজেকে আখ্যায়িত করেছিলেন "এন্টিয়োকাস দ্য গ্রেট" নামে।

চতুর্থ টলেমীর মৃত্যুর পর যখন তার পঞ্চবর্ষীয় পুত্র নতুন ফারাও রূপে অভিষিক্ত হলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই এন্টিয়োকাস মেসিডোনীয়ার শাসনকর্তা চতুর্থ ফিলিপের সাথে একটা রফা করলেন। যদি তারা একত্র হয়ে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে সহজেই তা জয় করা যাবে এবং তখন মৃতদেহটি ভাগাভাগি করা যাবে। ফিলিপ সহজেই এই পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হলেন এবং ২০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পঞ্চম সিরীয় যুদ্ধ শুরু হল। তবে উভয় রাজাই একটি বিষয় হিসাবের মধ্যে নেননি– সেটি হলো পশ্চিমের দেশ রোম।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে দ্বিতীয় টলেমীর আমলে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন যা মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। ২১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক বিশেষ মহূর্তে যখন কার্থেজীয় জেনারেল হানিবল (যিনি এমন একজন সামরিক নেতা যিনি অর্থের জন্য আলেক্সান্ডারকেও ছাড় দিয়েছিলেন) ইতালিতে অভিযান শুরু করেন এবং তিনটি মহান বিজয় লাভ করেন। মনে হয়েছিল এবার রোমের পতন হবে।

তবে ২০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইতিহাসের এক মহান পুনরাবর্তন ঘটে, ঠিক যেমন এন্টিয়োকাস ও ফিলিপ মিশরের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল। অবশেষে কার্থেজের পরাজয় ঘটে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় রোম প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। মিশরীয় সরকার তার শত্রুদের মিলিত শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে এবং রোমের সাথে তার পূর্বের সন্ধি স্মরণ করে রোমের সাহায্য প্রার্থনা করে।

এ ব্যাপারে রোম একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মোটের উপর হানিবলের বিজয়ের অন্ধকার দিনগুলিতে মিশরের চতুর্থ টলেমী জাহাজে করে রোমে খাদ্যশস্য পাঠিয়েছিলেন অথচ মেসিডনের পঞ্চম ফিলিপ কার্থেজীয়দের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করেছিল। রোমের অবশ্য ফিলিপের পূর্ব শত্রুতা ভুলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তাই অবিলম্বে সে মেসিডনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যখন সে দেখল তাকে রোমের মুখোমুখি হতে হবে তখন পঞ্চম ফিলিপ মিশরকে বিভক্ত করার কাজে লেগে পড়েন।

তৃতীয় এন্টিয়োকাস মহা উৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তিনি একাই মিশরকে সামলাবেন যখন মেসিডন সামলাবে রোমকে। তিনি যখন একাই মিশরে যাবেন তখন সেটাই হবে তার লভ্যাংশ। রোম নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তিনি এন্টিয়োকাস দ্য গ্রেট নাম ধারণ করে বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। তিনি পশ্চিমের বর্বরদের নিয়ে আর কেন মাথা ঘামাবেন?

অতএব তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং ১৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রকৃতপক্ষেই মিশরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেন। এন্টিয়োকাস অবিলম্বে জুডিয়াসহ সিরিয়াকে তার রাজ্যের সাথে যুক্ত করে নিলেন। এতে করে ১২৫ বছরের নমনীয় টলেমীয় শাসনের জায়গায় এক কঠোর সেলুকীয় শাসন এসে গেল।

তবে ওদিকে রয়ে গেল রোম। তারা মেসিডনকে পরাজিত করেছিল তবে সেটা খুব সহজসাধ্য ছিল না এবং পঞ্চম ফিলিপ ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে অবসরে চলে গেলেন। মেসিডোনীয়দের রাজত্ব টিকে রইল পশ্চিম এশিয়া মাইনরের ক্ষুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অঞ্চলে যারা পূর্ব দিকের সেলুকীয় শক্তির আতঙ্কে থাকত (বিশেষ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তৃতীয় এন্টিয়োকাসের ভয়ে)। তাই অবিলম্বে তারা রোমান আধিপত্যে নিজেদের সমর্পিত করল। সবাই রোমের কাছে আবেদন করতে লাগল এন্টিয়োকাসের বিরুদ্ধে কিছু করার, বিশেষ করে ইতিপূর্বে যারা এশিয়া মাইনরে মিশরের অধিপত্যে ছিল।

রোমানরা তৃতীয় এন্টিয়োকাসকে আদেশ করলেন এশিয়া মাইনর থেকে চলে যেতে, তবে তৃতীয় এন্টিয়োকাস এতে মোটেই কর্ণপাত করলেন না। কার্থেজীয় জেনারেল হানিবল তার দরবারে নির্বাসিত ছিলেন এবং তিনি এন্টিয়োকাসকে অনুরোধ করলেন ইতালি অভিযানে তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে। তবে এন্টিয়োকাস অনুভব করলেন যে রোম অধিকারে তাকে তেমন বেগ পেতে হবে না। তিনি একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রীসের দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু তাতে শুধু সময় নষ্ট হল।

রোমানরা গ্রীসের দিকে অগ্রসর হয়ে এন্টিয়োকাসকে শক্ত আঘাত হানল। চৈতন্য ফিরে পেয়ে সেলুকীয় রাজা এশিয়া মাইনরে ফিরে এলেন যেখানে রোমান বাহিনী তার উপর আরও শক্ত আঘাত হানল। এতদিনে তৃতীয় এন্টিয়োকাস জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি একটি অসম শান্তি চুক্তি করে এশিয়া মাইনরে ফিরে গেলেন।

অবশ্য তিনি সিরিয়া ধরে রাখতে সক্ষম হলেন, যা মিশর আর কোনোদিনই ফিরে পায়নি। রোম মিশরের মূল ভূখণ্ড নীল উপত্যকা রক্ষা করতে পেরেছিল। সে মিশরের রাজকীয় অধিকার নিশ্চিত করতে আগ্রহী ছিল না। এতদিন মিশর এশিয়া মাইনরে যা কিছু অধিকার করেছিল তা উপদ্বীপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়– যাদের সবাই হয়ে পড়ে রোমানদের ক্রীড়নক। নীল উপত্যকার বাইরে টলেমীয় মিশর একমাত্র যে এলাকা নিজেদের অধিকারে রাখতে পেরেছিল তা হল পশ্চিমে সাইরেনাইকা এবং উত্তরে সাইপ্রাস দ্বীপ।

এ কাজটি সমাপ্ত করার পর রোম পূর্ব সাম্রাজ্য তাদের অধিকারে ছেড়ে দেয় এর ফলে তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদে নিজেরাই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে পঞ্চম টলেমী এত বৃদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তার পক্ষে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার সামর্থ্য ছিল না। তার বার্ধক্য মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় এবং তার গৌরবগাথা গ্রিক ও মিশরীয় ভাষায় কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদাই করে রাখা হয়। এই লিপি প্রায় দুহাজার বছর পরে উদ্ধার করা হয় যেমনটা করা হয়েছিল রোজেট্টা পাথরের বেলায় যা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস উন্মোচনে সহায়তা করে। শুধু এ কারণেই বলা যায় পঞ্চম টলেমীর জীবন ব্যর্থ ছিল না।

রোমানদের সাহায্যে বিদেশি আশঙ্কা দূর হওয়ায় যুবক টলেমী অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোনিবেশ করেন। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় এন্টিয়োকাসের মৃত্যুর পর পঞ্চম টলেমী সিরিয়া পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ১৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। সম্ভবত তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

তিনি দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে রেখে যান। জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠ টলেমী পরিচিত ছিলেন "ফিলোমেটার বা মাতৃপ্রেমিক" নামে। অথচ তার প্রিয় মাতা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মিশরকে শান্তিপূর্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যুর পর ষষ্ঠ টলেমী যিনি তখনও যথেষ্ট অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনি এক অনলবর্ষী মন্ত্রীর প্রভাবাধীন ছিলেন, যিনি সিরিয়া পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন। সেলুকীয়দের সাথে আবার সেই পুরাতন সংগ্রাম শুরু হল।

তবে ষষ্ঠ টলেমী মোটেই যোদ্ধা ছিলেন না (প্রকৃতপক্ষে সকল টলেমীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে কোমলহৃদয় ও মানবিক)। তার বিরুদ্ধে সেলুকীয় সাম্রাজ্যে ছিল একজন নতুন সম্রাট চতুর্থ এন্টিয়োকাস যিনি তথাকথিত এন্টিয়োকাস দ্য গ্রেটের যুবক পুত্র। চতুর্থ এন্টিয়োকাস প্রকৃতপক্ষে তার অতিমূল্যায়িত পিতার চাইতে অধিকতর সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, তবে তার প্রধান রোগ খামখেয়ালীপনা ও বদমেজাজ।

মিশরীয়দের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে চতুর্থ এন্টিয়োকাস তৎক্ষণাৎ মিশর সীমান্তের দিকে ছুটে যান এবং পেলুসিয়ামের যুদ্ধে মিশরীয়দের পরাস্ত করে আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রাচীর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং চতুর্থ টলেমীকে বন্দী করেন। হয়তো তিনি আলেক্সান্দ্রিয়া অধিকার করে নিতেন তবে অনেক দূর রোম থেকেই তিনি ইঙ্গিত পান যে এটা তার জন্য বাড়াবাড়ি হবে।

যেহেতু ষষ্ঠ টলেমী বন্দী অবস্থায় থেকে সম্রাটের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি, মিশরীয়রা তাই ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার ছোট ভাই সপ্তম টলেমীকে সম্রাট ঘোষণা করে। এন্টিয়োকাস তৎক্ষনাৎ ষষ্ঠ টলেমীকে মুক্ত করে দেন এবং তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন আর তিনি একটা বেশ রসালো গৃহযুদ্ধের আমেজ অনুভব করেন কিন্তু দুই টলেমী একত্রে রাজ্যশাসনে আপোসরফা করে এন্টিয়োকাসের মতলব ভেস্তে দেয়।

বিরক্ত হয়ে এন্টিয়োকাস মিশরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং আলেক্সান্দ্রিয়া প্রাপ্তির বিনিময়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন। তবে আবার তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। এবার রোমান রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রাচীরের কাছে এগিয়ে যান এবং তাকে মিশর থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেন। রোমের এই ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির আদেশ প্রতিপালন করে তার সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া চতুর্থ এন্টিয়োকাসের গত্যন্তর ছিল না। কাজেই তিনি দ্রুত স্বদেশে ফিরে গেলেন।

তিনি যাকে পরাজিত করতে পারতেন এমন এক ব্যক্তির আদেশে ফিরে যাওয়ার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি যেরুজালেম দখল করে নেন। তিনি ইহুদী মন্দিরকে অপবিত্র করেন এবং যার ফলে ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী নেতা ম্যাকাবিসের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের মুখোমুখি হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে প্রাচ্যদেশে একটি ব্যর্থ অভিযানে চতুর্থ এন্টিয়োকাসের মৃত্যু হয়। এর ফলে এমনকি টলেমীয় মিশরের চাইতেও অধিকতর দ্রুতগতিতে সেলুকীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয়। একের পর এক অন্তর্কলহে দেশটির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ইহুদী বিদ্রোহ অধিকতর সুযোগ লাভ করে।

এক বিশেষ মুহূর্তে শান্তিবাদী ষষ্ঠ টলেমীও গোলমালের সুযোগ নিয়ে সেলুকীয়দের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন। তার আশা ছিল পিতার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা। সেলুকীয় সম্রাটের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল (প্রাচ্য প্রদেশসমূহ) আবার স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেটুকু কব্জা করাই ছিল তার অভিপ্রায়। প্রথমত আলেক্সান্ডার ব্যালাস নামে একজন সেলুকীয় দখলদারকে প্রথমে সহায়তা দিয়ে এবং তারপর তাকে উৎখাত করে তিনি সাফল্যলাভের আশা করেছিলেন। তবে সিরিয়ায় তিনি তার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং সেই আঘাতে ১৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

এর ফলে সপ্তম টলেমী একমাত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রয়ে যান। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা সর্বদাই তার কুখ্যাতি করেন। যদিও দাপ্তরিকভাবে প্রপিতামহের মতো তার নাম ছিল ইউয়ার্জেটিস, তবে সর্বজনীনভাবে তিনি পরিচিত ছিলেন ফিজকন (পেটমোটা কারণ তিনি অতি বিলাসিতায় ভীষণ মোটা হয়ে গিয়েছিলেন) নামে। সকল প্রকার বদখেয়াল ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ তার ঝুলিতে জমা পড়েছিল। তবে এটা বলা যাবে না এর কতটা অতিরঞ্জন।

শিলালিপিতে দেখা যায় তিনি ছিলেন বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক এবং মিশরীয় মন্দির সংস্কারে এবং জাতীয় সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছিলেন। এমনটা হতে পারে যে গ্রিকরা তাকে অপছন্দ করত কারণ তাদের চোখে তিনি ছিলেন স্বদেশীদের অতিশয় প্রশ্রয়দাতা। মিশরীয়রা নয় বরং গ্রিকরাই ছিল এসব ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সম্ভবত সপ্তম টলেমী একারণেই এসব মিথ্যা অপবাদের ভাগিদার হয়েছিলেন।

মিশরীয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেতে শুরু করে ১১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সপ্তম টলেমীর মৃত্যুর পর। তিনি তার একপুত্রকে সাইরেনী ও অপর পুত্রের নামে সাইপ্রাস উইল করে যান এবং খোদ মিশর রয়ে যায় তৃতীয় পুত্র অষ্টম টলেমীর অধিকারে। তৃতীয় জন বিতাড়িত হন নবম টলেমীর দ্বারা আর আলেক্সান্দ্রিয়ার জনগণ নবম টলেমীকে বিতাড়িত করে অষ্টম টলেমীকে ফিরিয়ে আনে।

এই ধরনের যাওয়া-আসায় মিশরীয়দের জন্য এমন কিছু যায় আসেনি এবং পূর্ব সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু একটি শক্তি গণনার মধ্যে থেকে যায় এবং তা হলো রোম। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের একটি ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া যায়। ৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অষ্টম টলেমীর সিংহাসনে আরোহণের পর কোনো এক সময় থিবিস নগর বিদ্রোহ করে বসে। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে টলেমী সেই নগরের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধযাত্রা করেন। তিন বছর ধরে এটা অবরোধ করে রাখেন এবং অবশেষে একে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন, যে ধ্বংসস্তূপ থেকে একে আর কখনোই পুনরুদ্ধার করা যায়নি।

অবশেষে মধ্যরাজত্ব এবং নব্যরাজত্বের রাজধানীর দু'হাজার বছরের গৌরবগাঁথার অবসান হল। যে মহান নগর ছিল দ্বিতীয় রামেসেসের অধীনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। তবে এর চেয়েও এক হাজার বছরের পুরনো মেম্ফীস নগরী মিশরের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে আজও টিকে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

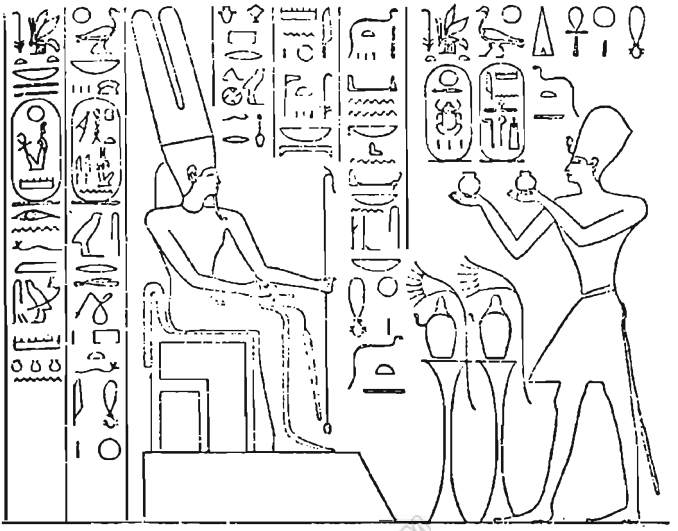

১১. ক্লিওপেট্রা

জুলিয়াস সিজার

টলেমীয়দের দুর্বলতা ও বালখিল্যতা সত্ত্বেও মিশরীয়রা অর্ধ শতাব্দীব্যাপী শান্তির আবহ উপভোগ করেছিল। যে শান্তি ভঙ্গ হয়েছিল শুধু আলেক্সান্দ্রিয়ায়। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট কিছু টলেমীয়দের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তারা যেন জাঁকজমকপূর্ণ মিশরীয় পোশাক পরিধান না করে, রাজকীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে এবং মিশর রাজের ব্যয়বহুল রাজ্যাভিষেকে না যায়।

টলেমীয়রা অনায়াসে মিশরীয় সিংহাসন অধিকার করতে পেরেছিল কারণ যুদ্ধের বাতাবরণ তিরোহিত হয়েছিল। রোমানরা শুধু প্রাচ্যের অধিকার টিকিয়ে রাখতেই তাদের শক্তি ক্ষয় করছিল।

১৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসিডন রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং গ্রীসও পশ্চিমের এই মহান নগরীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ রোমের প্রদেশে পরিণত হয় এবং উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশ স্বাধীন হলেও এক ক্রীড়নক রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়।

পূর্ব এশিয়া মাইনরের একটি রাজ্য *পন্টাস* যখন রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে, রোম তখন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত পূর্বাংশ সম্পূর্ণরূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। এই চূড়ান্ত সমাধানের কৃতিত্ব যে রোমান জেনারেলের তার নাম *নেউস পম্পেউস* ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পম্পেই। ত্রয়োদশ এন্টিয়োকাসের অধীনে সেলুকীয় সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন সিরিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পম্পেই-এর আদেশে তা প্রদেশ হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করা হয়। টলেমীয় ও সেলুকীয়দের দেড় শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলো। ছয়টি মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিল টলেমী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম। সবকিছু আস্তাকুড়ে নিক্ষীপ্ত হয়েছিল! মেসিডোনীয়রা পরাজিত হয়েছিল এবং ভুঁইফোড় রোমানরাই বিজয় লাভ করেছিল। সিরিয়া ও জুডিয়া গ্রাস করা হয়েছিল।

টলেমীয়দের দূরবর্তী প্রদেশগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। সপ্তম টলেমীর পুত্র ফাইসন যিনি সাইরেনির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, ৯৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুকালে তিনি তা রোমানদের নামে উইল করে দিয়েছিলেন এবং ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইপ্রাস সর্বগ্রাসী রোমের উদরস্থ হয়।

আড়াই শতাব্দী পূর্বে মহান আলেক্সান্ডার বিজয়ের মাধ্যমে যে বিশাল এলাকা মেসিডনের জন্য অর্জন করেছিলেন, ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ শুধু মিশরের নীল উপত্যকাতেই তার শেষ চিহ্ন টিকে থাকে। তবে এটাও ছিল রোমের ক্রীড়নক, কারণ রোমের অনুমতি ছাড়া টলেমীদের কেউই রাজা হতে পারত না। ঘটনাটি এ রকম যে, একাদশ টলেমী (অথবা সম্ভবত দ্বাদশ ত্রয়োদশও, কারণ শেষ কয়েকজন টলেমীয়কে এই পর্যায়ে ছায়ামূর্তি বলে মনে করা যেতে পারে), যার দাপ্তরিক নাম ছিল টলেমী ডাইওনিসাস, তবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন *টলেমী অলেটেস* (বংশীবাদক টলেমী) নামে। কারণ তিনি বাঁশী বাজানোতে ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টম টলেমীর (যিনি থিবিস ধ্বংস করেছিলেন) অবৈধ সন্তান, এবং যেহেতু কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না তাই তিনিই ছিলেন সিংহাসনের প্রত্যাশী।

৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন, তবে এই পদটি সুরক্ষিত রাখার জন্য তার রোমান সিনেটে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুচিন্তিত এবং বিশাল অঙ্কের উৎকোচের। এ নিয়ে দরকষাকষিতে বহু বছর কেটে যায়। উৎকোচের অঙ্ক বাড়াতে তিনি কর বৃদ্ধি করেন আর এতে করে ক্ষিপ্ত হয়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার লোকজন ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

প্রতিবাদে তিনি রোমে আশ্রয় প্রার্থনা করেন যা ছিল তখন জেনারেল পম্পেইর অধিকারে। এবার অলেতেস আরও একটি উৎকোচের ঘোষণা দেন যদি রোমানরা তাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে পারে, আর তা হলো মিশরের কৃষকদের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খাওয়া এবং মন্দিরসমূহের সম্পদ লুটপাট করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থের ব্যাপারে রোমান নেতাদের তেমন অনীহা ছিল না এবং ৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অলেতেসকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা হয় যেটা অসহায় মিশরীয়দের চরম ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করে। তিনি তার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলেন শুধু বৃহৎ এক রোমান দেহরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে আর এই রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলেন পম্পেই। তবে ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীকে রেহাই দিয়ে যান এবং তার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বাদশ টলেমীকে উত্তরাধিকারী রেখে যান। তিনি উইল করে তার পুত্রকে রোমান সিনেটের অধীন করেন এবং সিনেট তাকে অভিষিক্ত করে।

দ্বাদশ টলেমীর বয়স ছিল দশ বছর। তবে তিনি তার সতেরো বছর বয়স্কা ভগ্নির সহযোগিতায় দেশ শাসন করেন (এই ভ্রাতা-ভগ্নির যৌথ শাসন টলেমীয়দের জন্য নতুন কিছু নয়, কারণ দুই শতাব্দী পূর্বে এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় টলেমীর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল যার ভগ্নি-পত্নী ছিলেন রানি আরসিনো)। বালক রাজার ভগ্নি একটি নাম ধারণ করেছিলেন, যেটি টলেমীয়দের একটি সাধারণ প্রচলন। অবশ্য তিনি এই নামধারীদের মধ্যে ছিলেন সপ্তম ব্যক্তি তাই তিনি পরিচিত ছিলেন সপ্তম ক্লিওপেট্রা নামে। তবে তিনি ক্লিওপেট্রা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, রোমান সংখ্যাটি তার নামের সাথে তেমন ব্যবহার হয় না (তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্লিওপেট্রার শরীরে কোনো মিশরীয়র রক্ত প্রবাহিত ছিল না। তার সমস্ত পূর্ব পুরুষরা ছিল হয় গ্রিক নয়তো মেসিডোনীও)।

টলেমীয় মহিলারা ছিলেন পুরুষদের চাইতে অধিকতর সক্ষম, আর বলা যেতে পারে ক্লিওপেট্রা ছিলেন সবার চাইতে অধিকতর সুদক্ষ। এটাই স্বাভাবিক যে, ষড়যন্ত্র-কন্টকাকীর্ণ দেশে সক্ষম বড় বোনের চাইতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককেই বেশি পছন্দ করা হবে, কারণ এই বড় বোনটিকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বিশেষ করে যখন *পথিনাস* নামে এক খোজা সে সময় শাসনক্ষমতা দখলে রেখেছিল, আর সে ছিল এই নারীর একজন বিষাক্ত শত্রু।

৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্লিওপেট্রা মিশরকে এই সংকট থেকে বের করে আনার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যেটি ছিল মিশরের জন্য একটি প্রচলিত পদ্ধতি। তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার বাইরে থেকে একটি সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন আর এ জন্য তিনি সিরিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি একটি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। তার এবং তার ভাইয়ের বাহিনী পেলুসিয়ামের যুদ্ধে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তবে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই এমন কিছু ঘটেছিল যাতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

সে সময় রোমেও একটি গৃহযুদ্ধ চলছিল। পম্পেই তখন মরিয়া হয়ে তার চাইতেও একজন অধিকতর ক্ষমতাশালী সেনাপতি জুলিয়াস সিজারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। উভয় সৈন্য গ্রীসে পরস্পরের মুখোমুখি হয় আর এতে বিজয়ী হলেন সিজার। পম্পেইয়ের জন্য পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, আর সাধারণভাবেই তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন মিশরে (যেমনটা ঘটেছিল দুই শতাব্দীপূর্বে স্পার্টান ক্লিওমেনিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে)। মিশর ছিল কাছাকাছি জায়গা এবং নামমাত্র স্বাধীন। দেশটি ছিল দুর্বল কিন্তু সম্পদশালী আর একটি সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে পম্পেইকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। টলেমী অলেতেসেরও পম্পেইকে প্রয়োজন ছিল সিংহাসনে টিকে থাকার জন্য। আর তিনি অলেতেসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু পুত্রের অভিভাবকরূপে কাজ করেছিলেন।

তবে পম্পেইয়ের জাহাজ মিশরীয় উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ায় মিশরীয় রাজদরবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। নিজেদের দেশে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম, তখন তারা রোমের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহী ছিল। যদি তারা পম্পেইকে সাহায্য করে তাহলে হয়তো সিজার ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লিওপেট্রার উপর আক্রমণ চালাতে পারে। আবার যদি পম্পেইকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে তাহলে তিনি হয়তো তাদের সাহায্য ছাড়াই জয়লাভ করবেন আর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবেন।

পথিনাস একটি উপায়ের কথা ভাবলেন। তিনি পম্পেইয়ের নৌবহরে একটি নৌকা পাঠিয়েছিলেন। পম্পেই মহা আনন্দে তাদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং তাদেরকে তীরে আসতে আহবান জানিয়েছিল যাতে তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত হতে পারেন। তারপর যখন পম্পেই কূলে পা রাখলেন (নৌকা থেকে তার স্ত্রী ও পুত্র অবলোকন করছিল), তখন ঠান্ডা মাথায় তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হল।

এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। পম্পেই এখন মৃত আর তাই কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে না। সিজারেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং তিনি নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রার সৈন্যের বিরুদ্ধে পথিনাসকে সাহায্য করবেন। এক ঢিলে দুই পাখি।

এর কয়েকদিন পরে চার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সিজার আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকূলে অবতরণ করলেন। তিনি দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন পম্পেইকে বন্দী করবেন, যাতে তিনি কোনো শক্তিশালী সেনাদল গঠন করতে না পারেন। তাছাড়াও সিজারের ইচ্ছা ছিল আলেক্সান্দ্রিয়ার সম্পদশালী দরবার থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করবেন।

পথিনাস অবিলম্বে পম্পেইয়ের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে হাজির হলেন এবং ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন। হয়তো এটা সম্ভব যে কিছু অর্থ পেলেই সিজার সেই সাহায্য প্রদান করবেন। কোন্ টলেমী মিশর শাসন করছে, তাতে তার কী যায় আসে?

তবে কেউই ক্লিওপেট্রাকে হিসাবের মধ্যে রাখল না। ক্লিওপেট্রার একটা বিশেষ সুবিধা ছিল, যেটা পথিনাসের ছিল না। তিনি ছিলেন সুন্দরী আকর্ষণীয়া যুবতী। কেউই জানেনা আধুনিক মাপকাঠিতে কতটা সুন্দরী ছিলেন তিনি অথবা তিনি মোটেই সুন্দরী ছিলেন কি না। কারণ তার কোনো ছবিই বর্তমানে পাওয়া যায়নি। তবে প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায় সুন্দরী হোক বা না হোক পুরুষদের আকৃষ্ট করার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লিওপেট্রার জন্য তাই প্রয়োজন ছিল তার ভাইয়ের সৈন্যদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর সিজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তাহলে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, তাকে করায়ত্ব করা যাবে কি না। কাজেই সিরিয়া থেকে তিনি নৌযাত্রা করলেন এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকূলে গিয়ে অবতরণ করলেন এবং সেখানে গিয়ে সিজারকে একটি বিশাল কার্পেট উপহার দিলেন (প্রচলিত কাহিনী অনুসারে)। পথিনাসের সৈন্যবাহিনীরা এই উপহার প্রদানে আপত্তিকর কিছু দেখলো না, কারণ তারা জানতই না এই কার্পেটের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন খোদ ক্লিওপেট্রা।

ক্লিওপেট্রার কৌশল পুরোপুরি কাজে লাগে। কার্পেট খোলা হলে সিজার মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সুন্দরী যুবতীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ক্লিওপেট্রা তার আগমনের কারণ বোঝাতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি আগের ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে আদেশ দিলেন। অর্থাৎ ক্লিওপেট্রা এবং তার বালক ভ্রাতা একত্রে শাসক হবেন।

এটা অবশ্য পথিনাসের জন্য পছন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। তিনি জানতেন যে, মিশর সম্ভবত রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে পারবে না, তবে সিজারের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব। যদি সিজারকে হত্যা করা যায় তাহলে রোমে সিজারবিরোধীরা রোমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে এবং সে ক্ষেত্রে পথিনাসও প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করবে। পথিনাসের এমনটাই যুক্তি।

কাজেই তিনি সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন এবং তিন মাস যাবৎ রোমানরা ফারোস দ্বীপে (যেখানে রয়েছে একটি লাইটহাউস) অবরুদ্ধ হয়ে রইল। সিজার টিকে রইলেন শুধু তার ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও কুশলতা দিয়ে, যার সাহায্যে তিনি তার ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন (এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশাল লাইব্রেরি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল)।

তবে পথিনাস নিজে যে সংকট সৃষ্টি করেছিলেন তা তার বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি। যেই মুহূর্তে মিশরীয়রা আক্রান্ত হয় সেই মুহূর্তেই সিজার পথিনাসকে বন্দী করে হত্যা করেন।

অবশেষে সিজারের কাছে তার বর্ধিত জনবল পৌঁছে গেল এবং মিশরীয়রা পরাজিত হল। মিশরীয়দের পলায়নের এক পর্যায়ে বালক দ্বাদশ টলেমী একটি প্রমোদতরীতে করে নীল নদের মধ্যদিয়ে পলায়নের চেষ্টা করে। তরীটিতে অত্যধিক যাত্রী উঠার কারণে সেটা ডুবে যায় আর এতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এবার সিজার মিশরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন। সর্বজনীন প্রচলিত গল্প অনুসারে এবার তিনি এবং ক্লিওপেট্রা পরস্পরের প্রেমিক প্রেমিকা, আর এভাবেই ক্লিওপেট্রা তার সিংহাসন ধরে রাখার চেষ্টা করেন। যা হোক, একজন রানির পক্ষে তার একজন সহচর অপরিহার্য। আর সেই উদ্দেশ্যে সিজার ক্লিওপেট্রার আর এক ছোট ভাইকে ব্যবহার করলেন। তিনি ছিলেন দশ বছর বয়স্ক এক বালক যিনি ত্রয়োদশ টলেমীরূপে দেশ শাসন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিজার চিরকাল মিশরে থাকতে পারেন না। এশিয়া মাইনরে রোমানদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ চলছিল যেটার সুরাহা করা প্রয়োজন। পশ্চিম আফ্রিকা এবং স্পেনে তখনও পম্পেইয়ের বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী রয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মোকাবেলা করা দরকার। তার চাইতেও বড় কথা রোমের সরকারব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। তাই ৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মিশর থেকে নৌযাত্রা করে রোমে ফিরে এলেন।

সিজার সাথে করে রোমে কিছু একটা নিয়ে এলেন। তিনি মিশরে এক পঞ্জিকা দেখেছিলেন যেটা ছিল সূর্য-কেন্দ্রিক যা রোম ও গ্রীসে প্রচলিত চান্দ্র-পঞ্জিকা থেকে অধিকতর উপযোগী।

তিনি *সসিজিনেস* নামে একজন আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং রোমে একটি অনুরূপ পঞ্জিকা প্রবর্তন করেছিলেন। এই পঞ্জিকায় ছিল বৎসরে ১২টি মাস এবং প্রতিটি মাস ৩০ ও ৩১ দিনের। এটা অবশ্য মিশরীয় পঞ্জিকার মতো সমসংখ্যক ৩০ দিনের মাস ছিল না, যার শেষ মাসটি ছিল ৩৫ দিনের। তবে মিশরীয়রা এই পরিবর্তন কখনো গ্রহণ করেনি। যেহেতু প্রতিটি বছর ছিল ৩৬৫.২৫ দিনের, ৩৬৫ দিনের নয়, তাই প্রতি চার বছর পরপর একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করতে হয়। এটাকে বলে "জুলিয়ান ক্যালেন্ডার" (জুলিয়াস সিজারের নাম অনুসারে)। এর ছয়শত বছর পরে ক্যালেন্ডারে সামান্য একটু পরিবর্তন যোগ হয় যেটা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কাজেই আমাদের পঞ্জিকা সরাসরি মিশরের সাথে যুক্ত, যেটা জুলিয়াস সিজারের স্বল্পকালীন মিশরে অবস্থানের ফসল।

সিজারের প্রত্যাবর্তনের অল্পদিনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম দেওয়া হয় টলেমী সিজার এবং তার ডাকনাম সিজারিয়ন (ছোট্ট সিজার)।

মার্ক এন্টনি

রোমে প্রত্যাবর্তনের পর সিজারের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে থাকে আর ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। সিজারের মৃত্যুর পরপরই ক্লিওপেট্রা তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রয়োদশ টলেমীকে হত্যা করান। কারণ তার অস্বস্তিকর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটছিল– ইতিমধ্যে তার বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বছর এবং শাসনকার্যে তিনি ভূমিকা রাখতে শুরু করেছিলেন। ক্লিওপেট্রা এবার তার পুত্র টলেমী সিজারের (সে সময় তার বয়স তিন বছরের চেয়েও কম) সাথে যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন, যার উপাধি ছিল চতুর্দশ টলেমী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে রোমে দুজন ব্যক্তি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করায় ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরে আসছিল। এর মধ্যে একজন হলেন মার্কাস এন্টনিয়াস, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় মার্ক এন্টনি। তিনি ছিলেন সিজারের একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা। অন্যজন হলেন অক্টেভিয়ান সিজার, যিনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের নাতি (ভাগ্নের পুত্র)।

এই দুই ব্যক্তি আপাত শত্রু হলেও পরস্পরের সাথে আপোস করতে সম্মত হয়েছিলেন। যে আপোসের ফলে রোমান এলাকায় বাইরের কোনো প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা দূরীভূত হলো। অক্টেভিয়ানের অধিকারে চলে গেল রোম নগরীসহ রাজ্যের পশ্চিম অংশ আর মার্ক এন্টনির অধিকারে রইল পূর্বাঞ্চল।

এই বিভাজনের প্রকৃতিই দুই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্দেশ করে। মার্ক এন্টনি ছিলেন আকর্ষণীয়, হাস্যোজ্জ্বল, পানাসক্ত এবং তিনি লোকজনের সাথে পানভোজন উপভোগ করতেন। তার সক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি ঠান্ডা মাথায় যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা করতে পারদর্শী ছিলেন না এবং সাময়িক আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়তেন। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ছিল অধিকতর সভ্য ও সমৃদ্ধ। এখানে মার্ক এন্টনি আশা করতে পারতেন আরাম আয়েস ও বিলাসিতা।

মার্ক এন্টনি অক্টেভিয়ানকে সাংঘাতিকভাবে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। সাধারণত ঐতিহাসিকরা শীতল অকৌতুকপ্রিয় অক্টেভিয়ানের চাইতে রোমান্টিক মার্ক এন্টনিকে অধিকতর আনুকূল্য দেখিয়েছেন তবে এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান ভুল ছিল। দু হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের এই কালটির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাব অক্টেভিয়ানই ছিলেন রোমান ইতিহাসে যোগ্যতম ব্যক্তি। এমনকি জুলিয়াস সিজারও এর আওতা থেকে বাদ পড়েন না। যদিও পিতামহের সমতুল্য সামরিক প্রতিভা তার ছিল না।

যে চক্রটি জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেছিল, ৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসিডনের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। তারপর মার্ক এন্টনি জাহাজে করে তার পূর্ব সাম্রাজ্যে ফিরে যান। সেখানে তিনি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে *তার্সাস* নগরকে তার শাসন কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এন্টনির প্রধান চহিদা ছিল অর্থ, যার সরবরাহ সর্বদা আসত মিশর থেকে। তাই তিনি রাজকীয় ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে ক্লিওপেট্রাকে তার্সাসে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন এবং সিজারের মৃত্যুর পর সেখানকার শাসন-নীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। অবশ্য মিশর সবসময় চেষ্টা করত এ সব ঘোরপ্যাঁচ থেকে দূরে থাকার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার, কারণ তারা জানত না কোন্ পক্ষ শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো দোষের বিষয় ছিল না, তবে যে কেউ এটাকে অপরাধ ভাবতে পারত।

ক্লিওপেট্রার হাতে তখনও সেই ট্রাম্পকার্ড ছিল যেটা তিনি সাত বছর আগে জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে ছুড়েছিলেন। তিনি এক বিলাস সাজে সজ্জিত জাহাজে করে তার্সাসে এলেন। সে বিলাসিতার মাত্রা ছিল অকল্পনীয়। আর এই জাহাজে সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রীটি ছিলেন তিনি নিজে, তার বয়স তখনও মাত্র আটাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর। জুলিয়াস সিজারের মতো মার্ক এন্টনিও এই সম্মোহনকারিণীর মোহে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

জুলিয়াস সিজার যেখানে কখনো তার ভালোবাসাকে শাসননীতির উপরে স্থান দেননি, সেখানে মার্ক এন্টনি কখনোই তার শাসন নীতিকে ভালোবাসার কবল থেকে মুক্ত করতে পারেননি।

রোমান জেনারেল ও মিশরীয় রানির এই মুখরোচক কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমকাহিনীরূপে, এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো এর একটি বিষাদময় পরিসমাপ্তি রয়েছে। এই দুই প্রেমিক প্রেমিকা যুগল ভালবাসার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন। শেক্সপিয়ার এই যুগলের প্রেম কাহিনীকে তার *এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা* নাটকে অমর করে রেখে গেছেন এবং ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেন তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে: *সব কিছু প্রেমের জন্য, নয়তো হারিয়ে যাবে পৃথিবী*।

যদিও সন্দেহ নাই যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীর প্রণয়-সম্পর্ক ছিল তবে সেটা সম্পূর্ণরূপে রোমান্স কেন্দ্রিক ছিল বলে মনে হয় না। ক্লিওপেট্রার ছিল অর্থ-সম্পদ আর মার্ক এন্টনির সেটির প্রয়োজন ছিল। ক্লিওপেট্রা বারো বছর ধরে সেই অর্থ যুগিয়ে গেছেন যার ফলে মার্ক এন্টনির পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়। আর মার্ক এন্টনির ছিল সৈন্যবল যার প্রয়োজন ছিল ক্লিওপেট্রার। মিশরের রানি হিসেবে টিকে থাকার জন্য ঠান্ডা মাথায় ক্লিওপেট্রা সে বাহুবলকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

৪১-৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শীতকালটি এন্টনি কাটিয়েছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার সাহচর্যে, যে সময় তিনি আমোদ-আহ্লাদে মত্ত ছিলেন। অবশেষে ক্লিওপেট্রা তার ঔরষে জমজ সন্তানের জন্ম দেন। মার্ক এন্টনিও সানন্দে তাদের গ্রহণ করেন এবং তাদের নাম দেওয়া হয় আলেক্সান্ডার হেলিওস এবং ক্লিওপেট্রা সেলিনি (আলেক্সান্ডার সূর্য এবং ক্লিওপেট্রা চন্দ্র)।

কিছুদিনের জন্য এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদ ঘটে তবে এন্টনি আবার ফিরে এসে ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি রোমে এসে অক্টেভিয়ানের ভগ্নিকেও বিবাহ করেছিলেন। তিনি ঠান্ডা মাথায় তার রোমান পত্নীকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান।

রোমে অক্টেভিয়ান এন্টনির এই বালখিল্যতার সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন এন্টনি কতটা নির্বোধ অকালকুষ্মাণ্ড। রোমের জনগণ এটাকে গ্রহণ করেছিল। তারা আরও অনুভব করেছিল অক্টেভিয়ান রোমের জন্য কতটা শ্রমস্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতেন এবং রোমের একটি ভদ্র পরিবারে বিবাহ করেছিলেন।

মার্ক এন্টনি এসব জনমতের খুব কমই মূল্য দিতেন। তার মতে অক্টেভিয়ান ছিলেন একজন অক্ষম জেনারেল এবং তিনি নিজে কুশলী যোদ্ধা (তবে তিনি যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতেন সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়)। তাই এন্টনি তার নিজের পথে চলতেন আর কে কী ভাবছে তার মোটেই তোয়াক্কা করতেন না।

ক্লিওপেট্রা চেয়েছিলেন তার পূর্বপুরুষের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ধরে রাখার। আর এ নিয়ে মার্ক এন্টনি তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। এন্টনি তাকে সাইরেনি ও সাইপ্রাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (যেটা করার তার কোনো অধিকার ছিল না)। এমনকি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা যা, এক সময় তৃতীয় টলেমীর অধিকারে ছিল সেটাও ক্লিওপেট্রাকে উপহার দেন। এটাও প্রবাদ আছে তিনি ক্লিওপেট্রাকে "পার্গে" নামের লাইব্রেরি (পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি শহর যেখানকার গ্রন্থ-সংগ্রহ আলেক্সান্দ্রিয়ার কাছাকাছি ছিল) দান করেছিলেন।

অক্টেভিয়ানের জন্য এ সবকিছুই অপপ্রচারের কাজে লেগেছিল। তিনি জনগণকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে এন্টনিও তার প্রেমিকার জন্য সব কিছুই বিলিয়ে দিতে পারেন। এমনও গুজব আছে যে সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চল তিনি ক্লিওপেট্রাকে এবং তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ছেলেমেয়েদের নামে উইল করে যান। এতে রোমানরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে যে একজন মেসিডোনীও রানি সবকিছু গ্রাস করছে শুধু তার সৌন্দর্যের আকর্ষণে। যেটা কোনো মেসিডোনীও রাজাও সক্ষম হননি বাহুবলে জয় করতে।

রোমান জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধকে পুঁজি করে অক্টেভিয়ান সমর্থ হয়েছিলেন মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় সিনেটের সমর্থন আদায় করতে। যে যুদ্ধটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মার্ক এন্টনির বিরুদ্ধে।

মার্ক এন্টনি নিজেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তখনও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে অক্টেভিয়ানকে সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। তিনি জাহাজ সংগ্রহ করে গ্রীসের দিকে অগ্রসর হলেন আর সে দেশের পশ্চিম অঞ্চলে তার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে ইতালি আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। প্রথম উদ্যোগেই তিনি রোম দখল করে নিলেন।

অক্টেভিয়ান যদিও মোটেই দক্ষ সেনাপতি ছিলেন না, তবে তার কিছু অনুগত দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিল। এদের মধ্যে একজন হলেন *মার্কাস ভিস্পেনিয়াস আগ্রিপ্পা*। আগ্রিপ্পার অধীনে অক্টেভিয়ানের নৌবহর পশ্চিম গ্রীসের জলসীমায় প্রবেশ করল। অনেক আয়োজন প্রস্তুতির পর ক্লিওপেট্রা এন্টনিকে একটি নৌযুদ্ধে এগিয়ে যেতে তাগিদ দিল। এন্টনির জাহাজসমূহ সংখ্যায় এবং আয়তনে অক্টেভিয়ানের চাইতে অনেক বড় ছিল। যদি এন্টনি নৌযুদ্ধে জয়ী হতেন তাহলে এন্টনির পদাতিক বাহিনীও যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল, সেহেতু চূড়ান্ত বিজয় এন্টনিরই হতো।

৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২ সেপ্টেম্বর, পশ্চিম গ্রীস উপকূলে *এক্টিয়াম* নামে এক শৈলান্ত রীপে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। প্রথমে যদিও অক্টেভিয়ানের জাহাজসমূহ এন্টনির বিশাল যুদ্ধ জাহাজের সামনে মোটেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছিল না তবে এগ্রিপ্পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজসমূহ দ্রুতগতিতে এন্টনির জাহাজের মধ্যদিয়ে ক্লিওপেট্রার ষাটটি জাহাজ পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

কাহিনীটা এরকম যে আতঙ্কগ্রস্ত ক্লিওপেট্রা তার জাহাজসমূহ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এন্টনিও যখন বুঝতে পারেন যে ক্লিওপেট্রা এবং তার জাহাজসমূহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এন্টনিও তার জীবনের সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজটি করে বসেন। তিনি ছোট একটি নৌকায় চড়ে তার রাজকীয় নৌবহর এবং সৈন্য সামন্তকে (যারা হয়তো তাকে বিজয় এনে দিতে পারত) পিছনে ফেলে রানির সঙ্গে পলায়নে যোগ দিলেন। তার পরিত্যক্ত নৌবহর প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতিতে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন অক্টেভিয়ান।

সর্বশেষ টলেমীয়

আলেক্সান্দ্রিয়ায় অলস কালক্ষেপণ ছাড়া এন্টনি ক্লিওপেট্রার আর কিছুই করার ছিল না। তারা অপেক্ষা করছিল অক্টেভিয়ান মিশরে তাদের পিছু ধাওয়া করতে আসে কি না। ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলাই মাসে অক্টেভিয়ান তাই করলেন এবং *পেলুসিয়ামে* এসে হাজির হলেন। এন্টনি তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ১ আগষ্ট অক্টেভিয়ান আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করলেন আর আত্মহত্যা করলেন মার্ক এন্টনি।

এবার ক্লিওপেট্রা একা। তখনও রয়েছে তার সৌন্দর্য, তার আকর্ষণ। তিনি আশা করলেন অক্টেভিয়ানের উপর এটা প্রয়োগ করবেন যেমন করেছিলেন সিজার ও এন্টনির উপরে। এখন তিনি উনত্রিশ বছর বয়স্কা। তবে এটা তেমন বেশি বয়স নয়।

অক্টেভিয়ান তার চেয়ে মাত্র ছয় বছরের ছোট, তবে সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। আসল সমস্যা হল অক্টেভিয়ানের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো রোমের পুনর্গঠন, এর সরকারের স্বীকৃতি আর এমন সুদৃঢ়ভাবে ভিত নির্মাণ করেন যাতে বহু শতাব্দীব্যাপী এর অস্তিত্ব টিকে থাকে (এর সবকিছুই তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন)।

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রানি ক্লিওপেট্রার আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেই হবে। রানির সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারেই প্রমাণ হয়ে যায় তিনি এসবের উর্ধ্বে। তিনি রানির সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বললেও রানির বুঝতে বাকী রইলনা যে মানসিকভাবে অক্টেভিয়ান কতটা কঠোর। রানি বুঝতে পারেন অক্টেভিয়ানের আসল উদ্দেশ্য তাকে শান্ত রেখে বন্দী করে রথের চাকায় বেঁধে টেনেহিঁচড়ে রোমে নিয়ে যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাত্র উপায়– আত্মহত্যা। তিনি সম্পূর্ণ আনুগত্যের ভান করলেন এবং মনে মনে পরিকল্পনা স্থির করলেন। দূরদর্শী অক্টেভিয়ান এই সম্ভবনাটি অনুধাবন করতে পারলেন আর রানির কক্ষ থেকে সমস্ত তৈজস ও বিপজ্জনক জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললেন। তৎসত্ত্বেও রোমান সৈন্যরা যখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রানির কক্ষে উপস্থিত, তারা দেখতে পেল রানি মরে পড়ে আছেন।

যেমন করেই হোক রানি আত্মহত্যার একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়লেন আর অক্টেভিয়ানের চরম বিজয়োল্লাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। কিভাবে তিনি এটা করলেন কেউ জানতে পারেনি। তবে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, তিনি একটি বিষাক্ত সাপকে (এস্প– বিষধর ক্ষুদ্র সর্পবিশেষ) কাজে লাগিয়েছিলেন। এটা গোপনে ডুমুরের বাক্সে করে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাটিই ছিল তার জৌলুসময় জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়।

মিশরকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত করা হল। তবে প্রকৃতপক্ষে মিশর হয়ে পড়ে অক্টেভিয়ানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে, বর্তমানে যাকে আমরা বলি রোমান সাম্রাজ্য। তিনি অগাস্টাস উপাধি ধারণ করে প্রথম সম্রাটরূপে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যু এবং প্রথম টলেমীর সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তিন শতাব্দীব্যাপী মিশরে টলেমীয় শাসনের অবসান ঘটল।

তবে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুতে টলেমী বংশের অবসান ঘটেনি। নিশ্চিত করে বলা যায় অক্টেভিয়ান ঠান্ডা মাথায় রানির দুই শিশুপুত্র সিজারিয়ন ও আলেক্সান্ডার হেলিয়সকে হত্যা করেন, যাতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো বীজ অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু এন্টনি ও ক্লিওপেট্রার কন্যা ক্লিওপেট্রা সেলিনি তখনও বেঁচে ছিলেন।

অক্টেভিয়ান দশ বছর বয়েসী এক শিশু কন্যাকে হত্যা করাকে তেমন আবশ্যক মনে করেননি, তবে তিনি স্থির করেন মেয়েটিকে বিবাহ দিয়ে পৃথিবীর কোনো দূর প্রান্তে সরিয়ে দেওয়ার, যাতে তার পক্ষ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা না থাকে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নুমিডীয় (এই স্থানটি বর্তমানে আলজেরিয়ার অন্তর্গত) রাজার পুত্র *জুবার* দিকে।

অক্টেভিয়ান ভেবেছিলেন জুবা ব্যক্তিটিই হবে ক্লিওপেট্রার কন্যার কবর। জুবার সাথে বিয়ে হয়ে যায় ক্লিওপেট্রা সেলিনির। তিনি দ্বিতীয় জুবা নামে তার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েক বছর পরে অগাষ্টাস (যিনি অক্টেভিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন) স্থির করলেন নুমিডীয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত করাই সঙ্গত হবে এবং তিনি জুবা এবং তার স্ত্রীকে পশ্চিম দিকে মৌরিতানিয়ায় (বর্তমানে মরক্কো) পাঠিয়ে দিলেন। যেখানে তারা রোমের ক্রীড়নক হিসেবে শান্তিতে রাজত্ব করেন।

অধিকন্তু তাদের ছিল এক পুত্র যাকে বংশধারার প্রতীক হিসাবে নাম দিয়েছিল টলেমী, যিনি ইতিহাসে পরিচিত *টলেমী মৌরিতানিয়া* নামে। ক্লিওপেট্রার এই নাতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(অগাষ্টাসের মৃত্যুর চার বছর পর) ১৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একুশ বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন।

৪১ খ্রিস্টাব্দে রোম চলে আসে তৃতীয় সম্রাট ক্যালিগুলার অধীনে। ক্যালিগুলা ছিলেন অগাষ্টাসের মায়ের দিক থেকে তার নাতির ছেলে। তিনি বেশ ভালোভাবেই তার শাসনকার্য শুরু করেন। তবে একটা অসুখে ভুগে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। তার অমিতব্যয়িতা চরম শিখরে পৌঁছে এবং তিনি চরম অর্থ সংকটে পড়েন। যখন এমনটা ঘটছিল মৌরিতানিয়ায় টলেমী তার সম্পদ খুব সতর্কভাবে রেখেছিলেন। ক্যালিগুলা একটা বাজে অজুহাত দিয়ে তাকে রোমে ডেকে পাঠান এবং হত্যা করেন। মৌরিতানিয়াকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয় আর মৌরিতানিয়ার সব ধনসম্পদ ক্যালিগুলা হস্তগত করেন। এভাবেই ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার সত্তর বছর পরে তার নাতির ছেলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে টলেমীয় বংশের অবসান ঘটে।

তবে এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হল এর পরেও আর একজন বিখ্যাত টলেমীর আবির্ভাব। মৌরিতানীয় টলেমীর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে মিশরে একজন মহান জ্যোতির্বিদ কর্মরত ছিলেন। তিনি *ক্লদিয়াস টলেমীয়াস* নাম ধারণ করে লিখতেন।

তবে তার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায়নি, তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন, কখন মৃত্যুবরণ করেন, কোথায় কর্মরত ছিলেন অথবা তিনি গ্রিক নাকি মিশরীয় ছিলেন। আমরা তার সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা শুধু তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ের মাধ্যমে এবং যেহেতু সেগুলি ছিল গ্রিক ঐতিহ্যের অনুসারী তাই বলা যায় তিনি ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে গ্রিক। রাজকীয় টলেমীদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্ভবত তিনি নামটি গ্রহণ করেছিলেন তার জন্মস্থানের নাম অনুসরণ করে। এই টলেমীয় জ্যোতির্বিদ পূর্ববর্তী গ্রিক জ্যোতির্বিদদের কাজের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। যেখানে পৃথিবীকে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থান দেওয়া হয়েছিল আর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে। একেই বলে "টলেমীয় পদ্ধতি"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

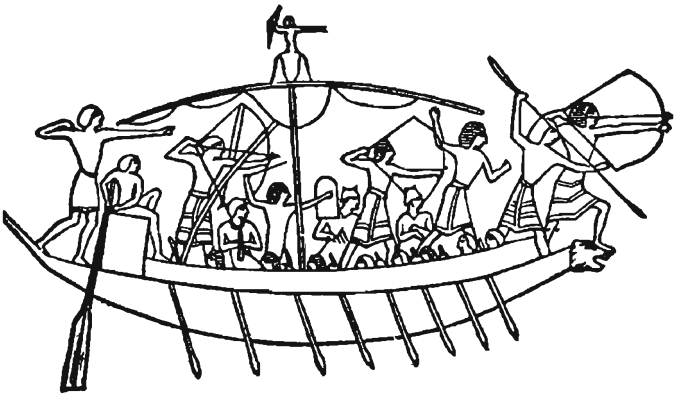

১২. রোমান মিশর

রোমানগণ

রোমান সাম্রাজ্য থেকে রোমান প্রদেশে পরিণত হওয়াটা মিশরের পক্ষে তেমন কোনো বিশাল পরিবর্তন নয়। নিশ্চিত করে বলা যায়, মিশরীয় শাসকরা এখন থেকে আলেক্সান্দ্রিয়ার পরিবর্তে রোমে বসবাস শুরু করেন, তবে এতে মিশরীয় কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন কিছু আসে যায় না। তাদের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়া এবং রোম কোনোটাই বিদেশ বলে অনুভূত হয়নি আর ফারাও ও টলেমীয়দের চাইতে রোমান সম্রাটদেরকে বেশি অপরিচিত বলে বোধ হয়নি। অগাষ্টাস এবং তার পরবর্তী সম্রাটগণ মিশরকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন এবং ভালোভাবেই লুটপাট চালাতেন। তবে মিশর এতে চিরকালই অভ্যস্ত ছিল। এক সময় এটা ছিল ফারাওদের সম্পত্তি পরবর্তীকালে টলেমীয়দের, কাজেই চিরকাল এমনটাই চলে এসেছে। রোমানরা যদি করের অতিরিক্ত টোল আদায় করে তাহলে সেটা টলেমীয়দের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। আর রোমান সরকারের সুযোগ্য শাসনে সেটা প্রদান করা তেমন কষ্টসাধ্য মনে হয়নি।

ইহজাগতিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে বিচার করলে মিশরের তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুবিধাই হয়েছিল। শেষার্ধের টলেমীয়গণের রাজত্বে অবক্ষয় শুরু হয় আর এখন শক্তিশালী রোমান প্রশাসনে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়। জটিল খাল-খনন পদ্ধতি যার উপরে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত স্থাপিত ছিল, তার আরও উন্নতি করা হয়। রোমানরা তৈরী করেছিল রাস্তা, নির্মাণ করেছিল জলাধার এবং লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক নৌবহর চালু করেছিল। সে সময়ে মিশরের জনসংখ্যা সত্তর লক্ষে উপনীত হয়েছিল এটা অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতিও স্তিমিত হয়নি। আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি ও জাদুঘর সরকারি প্রণোদনায় সচল ছিল এবং তা ব্যবহারের শর্ত আগের চাইতে নমনীয় ছিল। গ্রিক নগরীগুলির মধ্যে আলেক্সান্দ্রিয়াই ছিল সর্ববৃহৎ এবং আকার ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে রোমকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

অধিকন্তু নীতিগতভাবে মিশরীয়রা সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত এবং মিশরীয়দের বিশ্বাসের উপর মৌখিক সমর্থন ছিল। এটা মিশরীয় কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য সর্বাধিক সন্তুটির বিষয়। ইতিপূর্বে আর কখনো তাদের ধর্মমতের এত ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে নাই। এতবেশি মন্দির নির্মাণ ও সমৃদ্ধ করা হয়নি। বাধাহীনভাবে মিশরীয় সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছিল। গ্রিকরা তাদের কর্মকাণ্ড শুধু আলেক্সান্দ্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল কিন্তু রোমান আমলে তা সমগ্র ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করে। সর্বোপরি রোমান শাসনে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা রোমানদের এই শান্তিতে অংশীদার হতে পেরেছিল। তবে কোনো রোমান এলাকায় মিশরের চাইতে অধিক নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করতে পারেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ দেখা দিত এবং উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি হতো, তবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে চিন্তা করলে এগুলি তেমন মারাত্মক ছিল না।

অগাষ্টাস নিজেই এই শান্তি-নীতির উদ্বোধন করেছিলেন। দানিয়ুবের দক্ষিণ এবং এল্‌ব্‌ নদীর পশ্চিমে বর্বরদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। যাতে এই সীমার বাইরে তার সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করা যায়।

কাজেই রোমানদের মিশর অধিকারের অল্পদিনের মধ্যেই রোমান ভাইসরয় গেয়াস পেট্রোনিয়াসের ধারণা জন্মে যে ফারাওদের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গ্রহণ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। তিনিও নুবিয়ায় অভিযান চালাতে পারেন এবং ২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাই করেছিলেন আর তাতে তিনি বিজয় লাভও করেছিলেন তবে অগাষ্টাস তাকে ডেকে পাঠান। নুবিয়াতে তাদের কোনো প্রয়োজন নাই এবং শান্তি বজায় রাখাই বেশি প্রয়োজন। তবু এই অভিযান লোহিত সাগরের ওপারে দক্ষিণ আরবে বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রণোদনা যুগিয়েছিল। কোনো যুদ্ধবাজ সম্রাট হলে হয়তো সেই অঞ্চলটি অধিভুক্ত করতে চাইতেন কিন্তু অগাষ্টাস এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টা করেননি।

৬৯ খ্রিস্টাব্দে একটি স্বল্পকালীন আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় রোমের পঞ্চম সম্রাট নীরো আত্মহত্যা করেন। অগাষ্টাসের কোনো উত্তরাধিকারী জীবিত ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোমান জেনারেলরা ক্ষমতা গ্রাস করার জন্য ছুটে আসতে থাকে।

একটি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় জনগণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। এমনকি সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়। যেমনটা ঘটেছিল আলেক্সান্ডারের সাম্রাজ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌভাগ্যবশত অনতিবিলম্বে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। *ভেস্পাসিয়ান* নামে একজন রোমান জেনারেল যিনি প্রাচ্যে বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি মিশরে তার সৈন্য সমাবেশ করেন এবং রোমে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন (সাম্রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ সময় মিশর ছিল রোমের রুটির ঝুড়ি) এর ফলে ছোটখাটো সংঘর্ষের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করেন।

ভাগ্য ভালো, মিশরের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ভেস্পাসিয়ানের সৈন্য সঞ্চালনের সময় তারা বড় কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। কয়েকজন আলোকিত সম্রাটের সিংহাসন অধিকারের ফলে দ্বিতীয় শতাব্দীর সূত্রপাত হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাড্রিয়ান। যিনি তার শাসনকালের প্রায় সব সময়ই সারা রাজ্যে ঘুরে বেড়াতেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা যাচাই করতেন। ১৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশর ভ্রমণ করেন। প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বে পম্পেই, জুলিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও অক্টেভিয়ানের পরে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি।

হাড্রিয়ান নীল নদের উজান ভাটিতে ভ্রমণ করেন এবং সবকিছুই সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি পিরামিড এবং থিবিসের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন। তিনি মেমননের সংগীত শ্রবণ করেন (ইতিপূর্বে উল্লিখিত)। তবে এজন্য তিনি বেশি সময় দিতে পারেননি। হাড্রিয়ানের ভ্রমণের কয়েক দশক পরে মূর্তিটির সংস্কার প্রয়োজন হয়। নির্মাণ কাজে কিছু পরিবর্তন আনা হয় যার ফলে এই সংগীত আর শ্রুতিগোচর হয় না। মেমননের সংগীত আর কখনোই শোনা যায়নি। হাড্রিয়ানের ভ্রমণের একটি বিষাদময় ঘটনা হল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী *এন্টিনোয়াস* নীল নদীতে ডুবে মারা যায় (কেউ কেউ মনে করে সে আত্মহত্যা করেছিল)। তার মৃত্যুতে হাড্রিয়ান দারুণভাবে শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তার সম্মানার্থে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন (এন্টিনোপলিস)। সেখানে এই স্নেহভাজন ব্যক্তিটির অনেক চিত্র ও মূর্তি ছিল।

ইহুদিগণ

রোমান শাসনের প্রথম দুই শতাব্দীব্যাপী শাসনে সবচেয়ে যে শোচনীয় ঘটনাটি ঘটে তা হলো ইহুদিদের দুর্ভাগ্য। টলেমীয়দের আমলে ইহুদিরা সমৃদ্ধির শীর্ষে অবস্থান করত। তাদের উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং তারা গ্রিকদের সমমর্যাদা ভোগ করত। তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইহুদিরা কখনো বিদেশে সংখ্যালঘু হিসাবে কারও কাছ থেকে এত ভালো ব্যবহার পায়নি (একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে মধ্যযুগে স্পেনে মুসলিম শাসনামলে)। তার বিনিময়ে তারা মিশরের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাহরণস্বরূপ প্রধানতম আলেক্সান্দ্রীয় দার্শনিকদের মধ্যে একজন ছিলেন *ফিলো জুডাইউস*। তার জন্ম ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার বছরে অথবা তার অল্প কয়েক বছর পরে। তিনি ইহুদি এবং গ্রিক উভয় সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই গ্রিকদের কাছে ইহুদি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তার চিন্তা চেতনা প্লেটোর চিন্তার এত কাছাকাছি ছিল যে তাকে ইহুদি প্লেটো বলা হতো।

দুর্ভাগ্যবশত ফিলোর জীবৎকালেই ইহুদিদের ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্বাধীনতা হারানো মেনে নিতে পারেনি এবং এমন একজন রাজার অপেক্ষা করতে থাকে যিনি হবেন স্বর্গীয়ভাবে উদ্দীপ্ত (শেষের কথাটি হিব্রু ভাষায় "মেসিয়া" গ্রিক ভাষায় "খ্রীস্টোস," ল্যাটিন ভাষায় "খ্রিস্টাস" এবং ইংরেজিতে "ক্রাইস্ট")। মেসিয়া এসে শত্রুদেরকে পরাস্ত করে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তিনি হবেন তার অধীশ্বর যার রাজধানী হবে যেরুজালেম এবং সমগ্র পৃথিবী তার অধীনে চলে আসবে। ইহুদি ধর্মগ্রন্থে এই পরিণতির কথা উল্লিখিত আছে। তাই অধিকাংশ ইহুদি আজ পৃথিবী যেমনটা আছে তেমনটা মেনে নিতে রাজী নয়। বাস্তবিকপক্ষে মাঝে মাঝেই কোনো একজন ইহুদি নিজেকে মেসিয়া বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে স্বীকার করে নেওয়ার লোকেরও অভাব হয় না। আর এতে করেই জুডিয়ায় রোমানদের সাথে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

জুডিয়ার চাইতে আলেক্সান্দ্রীয় ইহুদিরা মেসিয়া স্বপ্নে তুলনামূলকভাবে কম আবিষ্ট ছিল তবে গ্রিক ও ইহুদিদের মধ্যে এ নিয়ে একটি চাপা ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। তাদের জীবন প্রণালী অনেকটাই ভিন্ন ছিল এবং উভয়েই নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিল। ইহুদিরা অনড় ছিল যে তাদের ঈশ্বরই সত্যিকারের ঈশ্বর এবং অন্য ধর্মকে তারা অবজ্ঞা করত, যাতে করে অ-ইহুদিরা বিরক্ত হতো। এদিকে গ্রিকরাও অনড় ছিল যে তাদের সংস্কৃতিই প্রকৃত সংস্কৃতি।

অধিকন্তু গ্রিকরা ইহুদিদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভে অসন্তুষ্ট ছিল। পৌত্তলিক বলিদান, সম্রাটের প্রতি স্বর্গীয় আনুগত্য এবং বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে ইহুদিদের অব্যাহতি (যেটি গ্রিক ও মিশরীয়দের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল) তারা ভালো চোখে দেখেনি। জুডিয়ার রোমান শাসকরা ইহুদিদের ধর্মীয় গোড়ামী এবং রাজকীয় প্রথা নিয়মের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনীহায় বিরক্তি বোধ করত। এক সময় উন্মাদ সম্রাট ক্যালিগুলা যেরুজালেমের মন্দিরে তার নিজের একটি মূর্তি স্থাপনের দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেন আর ইহুদিরা মরিয়া হয়ে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুতি নেয়।

ফিলো জুডাইউস নিজেই একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে এই অধর্মোচিত কার্য থেকে বিরত থাকার আবেদন নিয়ে রোমে গমন করেন। ক্যালিগুলার মৃত্যু এবং তার উত্তরাধিকারীর নিষেধাজ্ঞা থেকেই শুধু এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়। তবে কেবল এই অবসম্ভাব্যতাকে সাময়িকভাবে স্থগিত করা সম্ভব হয়। ৬৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুব্ধ ইহুদিরা স্বাধীনতার দাবিতে কর প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং বিদ্রোহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ফোরণ ঘটে। রোমান সৈন্যবাহিনী জুডিয়ার দিকে ছুটে যায় আর একটি তিন বছর স্থায়ী অভুতপূর্ব নিষ্ঠুর যুদ্ধের সূচনা হয়। ইহুদিরা অমানবিক নাছোড়বান্দা হয়ে যুদ্ধে টিকে থাকে। উভয় পক্ষেই বিপুলসংখ্যক লোকক্ষয় হয়।

এই যুদ্ধটি রোমান সরকারকে কিছুটা নাড়া দিয়ে যায়। কারণ বিদ্রোহের শুরুতে সম্রাট নীরোকে হত্যা করা হয়, অংশত এ কারণে যে ইহুদিদের তরফ থেকে দুঃসংবাদটির জন্য তিনি দায়ী। জুডিয়া যুদ্ধে রোমান সেনাপতি ভেস্পাসিয়ানকে নীরোর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। অবশেষে ৭০ খ্রিস্টাব্দে জুডিয়াকে শান্ত করা সম্ভব হয়। ভেস্পাসিয়ানের পুত্র টাইটাস যেরুজালেম অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলেন। মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয় আর নেবুচাদ্রেজারের পর থেকে ইহুদি ধর্মকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা হয়।

জুডিয়ার বাইরের ইহুদিরা এই যুদ্ধে অংশ নেয়নি আর রোমানদের কাছ থেকে তারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ লাভ করেছিল (এমনকি বর্তমান কালে পার্ল হারবারের ঘটনার পর জাপানিরাও আমেরিকানদের কাছ থেকে এমন নমনীয় আচরণ লাভ করেনি)।

অবশ্য মিশরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। রক্তাক্ত দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ইহুদি এবং গ্রিক কেউই এই বিরোধের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। উভয় পক্ষই নিষ্ঠুর আচরণ করতে থাকে। তবে ইহুদিদের বিয়োগান্ত ক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সব সময় ছিল সংখ্যালঘু এবং তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলেক্সান্দ্রিয়ার ইহুদি মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়। হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয় এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার ইহুদিরা এই দুঃসময় আর কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এসব ঘটনার পর মিশরের ইহুদিরা সব সময় রোমান ও গ্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে এসেছে। সাইরেনিতে তখনও একটি শক্তিশালী ইহুদি কলোনী ছিল, আর ১১৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের একটা সুযোগ এসে গেল। সে সময় রোমান সম্রাট ট্রেজান দূরপ্রাচ্যে একটা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আর রোমান সাম্রাজ্যের শেষ চেষ্টা হিসাবে রোমান বাহিনীকে পারস্য উপসাগরের কাছে নিয়ে গেল। হয়তো মিশরে তার একটি মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল (সে সময় সম্রাটের বয়স ষাট বছর), অথবা হয়তো একজন মেসিয়ার আবির্ভাব প্রচারিত হয়েছিল। সে যাই হোক না কেন, সাইরেনির ইহুদিরা ক্ষেপে গিয়ে একটি ধর্মোন্মাদ আত্মঘাতী বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে যে গ্রিককেই তারা পেয়েছিল তাকেই হত্যা করেছিল, আর বিস্মিত রোমানরা তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিল। দু'বছর ধরে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকে এবং ১১৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মিশর থেকে ইহুদিরা প্রকৃতপক্ষে উৎখাত হয়ে যায়।

এই বিদ্রোহ রোমান ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছিল। মিশরে বিশৃঙ্খলার সংবাদে ট্রেজান ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রোমান বিজয়ের ঢেউ আর কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদূর পর্যন্ত আসেনি আর এখান থেকেই রোমের সৌভাগ্যে ভাটা পড়তে শুরু করে। ট্রেজানের উত্তরাধিকার লাভ করেন হাড্রিয়ান। যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি একজন রাজকীয় পর্যটক হিসাবে। যেমনটা বর্ণনা করেছি মিশর ভ্রমণের পূর্বেই তিনি নির্জন জুডিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন। আর অবশিষ্ট ইহুদিদের ধ্বংসস্তূপের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে বিব্রত বোধ করেন। তার কাছে মনে হয়েছিল বোধ হয় আর একটি বিপ্লব আসন্ন। তাই তিনি আদেশ দিলেন যেরুজালেমকে একটি রোমান নগরী হিসাবে পূনর্নির্মাণের এবং তার পারিবারিক নাম অনুসারে নাম রাখেন "এলিয়া"। আর বিধ্বস্ত ইহুদি মন্দিরের জায়গায় নির্মাণ করেন জুপিটারের এক মন্দির। এই নগরে ইহুদিদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে হাড্রিয়ানের এই কার্যক্রম বিদ্রোহ দূর করার পরিবর্তে আরও বেশি করে উসকে দেয়। আর একজন মেসিয়ার আগমন ঘোষণা করে ইহুদিরা আবার বিদ্রোহ শুরু করে। তাদের মন্দির অপবিত্র করলে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ১৩২ থেকে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর যুদ্ধ চালিয়েছিল। এর ফলে মিশরের মতো জুডিয়াও ইহুদি শূন্য হয়ে পড়ে।

এরপর থেকে ইহুদিবাদের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয় হয়েছিল বেবিলনিয়ার ইহুদি কলোনী যা নেবুচাদ্রেজারের আমল থেকে টিকেছিল এবং ইউরোপীয় কলোনী যা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। তারা সর্বদাই সেখানে রোমানদের সন্দেহের দৃষ্টিতে ছিল।

AMARBOI.COM

খ্রিস্টানগণ

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের সময় থেকে এশিয়া ও আফ্রিকায় গ্রিক সংস্কৃতির বিস্তার কখনো একপাক্ষিক ব্যাপার ছিল না। গ্রিকরা বিদেশি সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল আর তাদের কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি আকৃষ্টও হয়েছিল।

বিদেশি ধর্ম তাদের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল কারণ এগুলি ছিল গ্রিক ও রোমান দাপ্তরিক ধর্মের চাইতে অধিকতর বর্ণিল, গভীরভাবে আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ এবং অধিকতর আবেগময়। প্রাচ্যের ধর্মসমূহ ধীরে ধীরে পশ্চিমে প্রসার লাভ করতে থাকে।

রোমানরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরও দ্রুততর ও সহজতর হতে থাকে। একদা যা ছিল স্থানীয় ধর্ম তা সমগ্র সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হতে থাকে।

প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মিশর এ সব ধর্মের প্রাণবন্ত বিচরণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। গ্রিক ভাবধারায় রঞ্জিত মিশরীয় *সেরাপিও* মতবাদ প্রথমে গ্রীসে এবং তারপর রোমে বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথম দুই সম্রাট অগাষ্টাস এবং টাইবেরিয়াস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব সমর্থন করেননি, কারণ প্রাচীন রোমক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের একটি ব্যর্থ স্বপ্ন ছিল। তবে যে ভাবেই হোক এটা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ট্রেজান ও হাড্রিয়ানের সময় সাম্রাজ্যের এমন কোনো প্রান্ত বাকি রইল না যেখানে এই ধর্মের অনুসারীদের অভাব ছিল। তিন হাজার বছর পূর্বে পিরামিড নির্মাণের সময় থেকেই এই ধর্মটির প্রচলন ছিল। মিশরীয় দেবী আইসিস-এর ধর্মমত এর চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় ছিল এবং তাকে *স্বর্গের রানি* রূপে চিত্রিত করা হতো। হানিবলের অন্ধকার যুগে রোমানদের যখন ধারণা হয় যে সেই পরাজয় কোনো দেবতার রোষাগ্নি ছাড়া সম্ভব ছিল না, তখন থেকেই রোমে এর প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি নীল নদ থেকে দুই হাজার মাইল দূরে সুদূর দ্বীপ ব্রিটেনেও ঘটনাচক্রে আইসিস-এর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তার আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হতো। তবে যদিও মিশর পৃথিবীকে ধর্ম দিয়েছিল সে-ও বহির্বিশ্ব থেকে নিয়েছিল– বিশেষ করে জুডিয়া থেকে।

জুডিয়ার অস্তিত্বের শেষ শতাব্দীতে যখন অনেকেই নিজেদেরকে মেসিয়া বলে ঘোষণা দিতে শুরু করে, এবং যখন ইহুদি জনগণ তার জন্য ক্ষুধার্ত চিত্তে অপেক্ষা করছিল তখন একজনের আবির্ভাব ঘটেছিল যার নাম *যশুয়া*। তার জন্ম অগাষ্টাসের রাজত্বকালে, ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তার শিষ্যরা তাকে মেসিয়া হিসাবে সাদরে গ্রহণ করে। তিনি মেসিয়া যশুয়া, গ্রিক ভাষায় *জিসাস ক্রাইস্ট*। ২৯ খ্রিস্টাব্দে টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। টাইবেরিয়াসের ভয় ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত ইহুদিরা যিশুকে রাজা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়াতেই ইহুদিদের মন থেকে যিশুর মেসিয়াত্বের বিশ্বাস লোপ পায়নি, আর শ্রীঘ্রই একটি কাহিনী বিস্তার লাভ করতে থাকে যে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন। ইতিহাসের এই পর্যায়ে ইহুদিদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাই এটাকেও একটা নতুন সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা যায়– যিশুখ্রিস্টের অনুসারী অথবা খ্রিস্টান হিসাবে।

এই সম্প্রদায়ের প্রথম কয়েক বছরে যে কেউ ভাবতে পারে এদের ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল নয় এবং গ্রিক ও রোমান ধর্মমতের বিরুদ্ধে এর টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। নিশ্চিত করে বলা যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু দেবত্ববাদে বিশ্বাসে বিরক্ত হয়ে বহু লোক ইহুদিবাদের কঠোর একেশ্বরবাদিতা এবং তাদের উন্নত নৈতিকতাবোধে আকৃষ্ট হয়। কাজেই অনেক অ-ইহুদি যার মধ্যে অনেকেই উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল তারা জুডাইজমকে গ্রহণ করে।

এ ধরনের ধর্মান্তরকরণ খুব বেশি ছিল না, কারণ ইহুদিরা নিজেরাই এটাকে কঠিন করে তুলেছিল। তারা সহজ জীবনাচরণের সাথে আপোস করেনি এবং অনেক নিয়মকানুনে আবদ্ধ করেছিল। তার চাইতেও বড় কথা তারা সম্রাট-পূজার ঘোর বিরোধী ছিল এবং ধর্মান্তরিতদের এ থেকে বিরত থাকতে চাপ দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতরা নিজ সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। ৬৬ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতদের ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গণ্য করত এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করে দিয়েছিল।

খ্রিস্টধর্মের প্রচারকগণ অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করলেও একজন লোকের প্রভাবে কিছুটা সহজ হয়েছিল। এই ব্যক্তিটি ছিলেন সল (পরে যিনি পল নামে পরিচিত হয়েছিলেন)। তিনি ছিলেন টার্সাসের (যে নগরে ক্লিওপেট্রার সাথে এন্টনির প্রথম দেখা হয়েছিল) একজন ইহুদি। প্রথমে তিনি খ্রিস্টধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন কিন্তু খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে খ্রিস্টান মিশনারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সক্রিয় মিশনারীরূপে পরিগণিত হন।

তিনি অ-ইহুদি সমাজে ভাষণ দিয়ে বেড়াতেন এবং খ্রিস্টধর্মের একটি বিশিষ্ট মতবাদ ধারণ করেন যা ইহুদি আইন ও ইহুদি জাতীয়তাবাদের বিরোধী। তৎপরিবর্তে তিনি একটি বিশ্বজনীন মতবাদ প্রচার করেন যেখানে জাতীয়তা ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তিনি একটি উন্নত নৈতিকতার সাথে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন যেখানে মুসার জটিল নিয়মনীতি ও বাধ্যবাধকতা পরিহার করা হয়েছিল। এর ফলে মিশর এবং আরও অনেক স্থানে প্রচুর লোকজন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল।

তৎসত্ত্বেও সম্রাট-পূজার আনুষ্ঠানিকতায় খ্রিস্টানদের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং ইহুদিদের মতো তাদেরকেও সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে দেখা হতো। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে নীরোর রাজত্বকালে রোমে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করে খ্রিস্টানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। কথিত আছে যে, এই নির্যাতনের শেষ পর্যায়ে পলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

পলের প্রচারের মাধ্যমে খ্রিস্ট-সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার একভাগ ইহুদি ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেছিল আর অন্যভাগ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর চরম পর্যায়ে ইহুদি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। যেসব ইহুদি খ্রিস্টের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল, তারা ছিল পরিপূর্ণ শান্তিবাদী। তাদের কাছে ইতিমধ্যেই মেসিয়া (যিশুর রূপ ধরে) এসেছিল আর তারা ছিল তার অপেক্ষায়। কাজেই যিশু ব্যতিত অন্য কারও নামে জুডিয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম তাদের কাছে অর্থহীন। তাই তারা পর্বতে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নিল। যে সব ইহুদি বেঁচে রইল তারা খ্রিস্টানদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিল যার ফলে ইহুদিদের খ্রিস্ট ধর্মান্তরকরণ স্তিমিত হয়ে পড়ল।

৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুডাইজম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক খ্রিস্টীয় ধর্মের অবির্ভাব হয়, এবং ইহুদি জগতে ছড়িয়ে পড়ে আর গ্রিক দর্শন ও পৌত্তলিক উৎসবের দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

৯৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে ভেস্পাসিয়ানের কনিষ্ঠপুত্র রোমান সম্রাট *ডমিশিয়ান* ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একটি আইন পাশ করেছিল, আপাতদৃষ্টিতে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে একই দৃষ্টিতে দেখতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিকভাবেই ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে একটি বিরোধ ছিল। খ্রিস্টানরা ইহুদিদের প্রতি বিরূপ ছিল এ কারণে যে তারা যিশুকে মেসিয়া বলে স্বীকার করেনি। আরও একটি কারণ যিশুর ক্রুশবিদ্ধ করণে ইহুদিদের একটি ভূমিকা ছিল (তারা ভুলে গিয়েছিল যে যিশুর শিষ্যরাও ছিল ইহুদি)। অপরপক্ষে ইহুদিরা খ্রিস্ট মতবাদকে ধর্মদ্রোহরূপে গণ্য করত এবং তাদের দৈব-দুর্যোগের জন্য খ্রিস্টানদেরই দায়ী করত।

তবুও এই দুই ধর্মের মধ্যে তিক্ততা এতটা ভয়ংকর হতো না যদিনা তার মধ্যে মিশরের প্রভাব থাকত। ইহুদি-বিরোধী মনোভাব মিশরীয়দের মধ্যে যে কোনো জায়গার চেয়ে বেশি ছিল, যার ফলে খ্রিস্টধর্মে নষ্টিকবাদ প্রসার লাভ করে।

নষ্টিকবাদ ছিল একটি খ্রিস্টপূর্ব দর্শন যা পার্থিব অনিষ্ট নিয়ে বেশি করে ভাবত। নষ্টিকবাদীদের কাছে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরই প্রকৃত ঈশ্বর। যিনি প্রকৃত কল্যাণ এবং সর্বশক্তিমান শাসনকর্তা, তিনি জ্ঞানের প্রতিমূর্তি।

পৃথিবী থেকে জ্ঞান সম্পূর্ণ বিযুক্ত যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে একজন অধস্তন দেবতা *ডেমিউর্জের* (ডেমিউর্জ একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ প্রকৃত শাসক) দ্বারা। যেহেতু ডেমিউর্জের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ তাই পৃথিবী মন্দত্বে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মানব দেহ একটি নিকৃষ্ট বস্তু তাই আত্মাকে এর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

কিছু কিছু নষ্টিকবাদী খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল আবার কেউ কেউ এ থেকে বেড়িয়েও গিয়েছিল। এই মতবাদের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন *মার্শিয়ন*। তিনি ছিলেন এশিয়া মাইনরের অধিবাসী এবং মনে করা হয় তিনি একজন খ্রিস্টান বিশপের পুত্র ছিলেন।

ট্রেজান এবং হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে মার্শিয়ন এই ধারণা পোষণ করতেন যে, ডেমিউর্জ প্রকৃতপক্ষে ওল্ডটেষ্টামেন্টের গড– যিনি একজন নিম্নতর দেবতা, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। অপরপক্ষে যিশু ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞ ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যেহেতু যিশু ডেমিউর্জের সৃষ্টিকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাই পবিত্র আত্মা আর মানব দেহ ধারণের মাধ্যমে তিনি তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করেন।

কিছুকালের জন্য মিশরে নষ্টিক মতবাদ বেশ জনপ্রিয় ছিল কারণ ইহুদিবিরোধী অনুভূতির সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। এতে করে ইহুদি-ঈশ্বরকে দানবের রূপ দেওয়া হয় আর ইহুদি ধর্ম গ্রন্থকে দানবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবা হয়।

তবে নষ্টিক খ্রিস্টবাদ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, কারণ খ্রিস্টধর্মের মূল ধারা এর বিরোধী ছিল। অধিকাংশ খ্রিস্টীয় নেতাই ইহুদি-ঈশ্বর এবং ওল্ডটেষ্টামেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারা মনে করত ওল্ডটেষ্টামেন্টের ঈশ্বরই নিউ টেষ্টামেন্টের ঈশ্বর, যিশু যাকে ধারণ করেছিলেন।

যদিও নস্টিকবাদ লোপ পেয়ে যায়, তবে এটা কিছু কালো রেখা ছেড়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মে পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অশুভ সম্বন্ধে ধারণা ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার ফলে ইহুদি বিদ্বেষ আগের চাইতে আরও কঠোর হয়। তার চাইতেও বড় কথা মিশরীয়রা যিশুর সাথে সংশ্লিষ্ট নষ্টিক ধ্যানধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেনি যার ফলে মিশরীয় খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়ে যায় এবং যার ফলে মিশরে খ্রিস্টধর্ম টিকে থাকেনি।

খ্রিস্টধর্মে আরেকটি মিশরীয় প্রভাব লক্ষ করা যায় স্বর্গের রানি আইসিসের মাধমে। তিনি শুধু মিশরের নয় রোমেও ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী তার ঔজ্জ্বল্য সৌন্দর্য কমনীয়তা রূপলাভ করেছিল কুমারী মাতা মেরীর মাধ্যমে। এতে করে খ্রিস্টধর্মে একটি নারী প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইহুদি ধর্মে যা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

রোমের অধোগতি

ট্রেজান ও হাড্রিয়ান এবং তাদের উত্তরাধিকারী এন্টনিয়াস পায়াস ও মার্কাস অরেলিয়াসের সাম্রাজ্যকাল ছিল রোমের সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল দিন। আশি বছর ধরে রোম সুরক্ষা ও শান্তিতে ছিল। তবে শীঘ্রই এর সমাপ্তি ঘটল। মার্কাস অরেলিয়াসের অযোগ্য পুত্র ১৮০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাসীন হলেন এবং ১৯২ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর রোমান সাম্রাজ্য একটি অস্থির পরিস্থিতিতে নিপতিত হয় যখন ক্ষমতাগ্রাসের জন্য জেনারেলরা পরস্পরের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল নীরোর মৃত্যুতে।

এই সংগ্রামে সবচেয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন *পেসেনিয়াস নিগার* তখন যার অবস্থান ছিল সিরিয়ায়। শীঘ্রই তিনি মিশর অধিকার করে বসেন যা ছিল রোমের *রুটির ঝুড়ি,* ঠিক যেমনটা হয়েছিল সোয়াশ' বছর আগে ভেস্পাসিয়ানের আমলে। রোমের দিকে অগ্রসর না হয়ে তিনি আগের জায়গাতেই থেকে যান আর ধরে নিয়ে ছিলেন যে খাদ্যের অভাবে রোম নিজেই এসে তার কাছে ধরণা দেবে।

রোমেই রয়ে গেলেন দানিয়ুবের তীরে তাড়া খাওয়া জেনারেল *সেপ্টিমিয়াস সিভেরাস*। তিনি রোমে তার আসন পাকা করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে এশিয়া মাইনরে গিয়ে নিগারকে ধরে ফেলেন এবং তাকে পরাজিত করেন। এরপর সেপ্টিমিয়াস সিভেরাস রোমের সম্রাট হয়ে বসলেন।

তার জ্যেষ্ঠপুত্র *কেরাকেলা* ২১১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং ২১২ খ্রিস্টাব্দে একটি আদেশ প্রচার করেন যার মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সকলকে রোমের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মিশরের জনগণ রোমের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে দারুণ গর্ব অনুভব করে। তাদেরকে রোমের সিনেটেও স্থান দেওয়া হয় (সে সময় অবশ্য সিনেট কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করত না, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক সামাজিক ক্লাবের মতো)।

তবে রোমের জন্য আসন্ন দিনগুলি বেশ কঠিন হয়ে পড়ছিল। মার্কাস অরেলিয়াসের সময় রোমে এক দারুণ প্লেগের আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় পতিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু নাগরিকরাই করের আওতাভুক্ত ছিল আর কেরাকেলার আদেশের ফলে তা সকল স্বাধীন জনগণের উপর প্রযোজ্য হয় এবং তাছাড়াও বাড়তি কর ধার্য করা হয়েছিল।

হাড্রিয়ানের পরে কেরাকেলাই প্রথম মিশর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তবে উপলক্ষটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক শতাব্দী পূর্বে হাড্রিয়ান ছিলেন শুধু একজন কৌতূহলী পর্যটক, যিনি মনের আনন্দে শান্তিপূর্ণ এক সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কেরাকেলা ছিলেন এক কঠিন সময়ে যখন উত্তর এবং পূর্ব থেকে শত্রুরা রোমের দুর্গপ্রাকারে আঘাত হানছিল। তিনি মিশরে গিয়েছিলেন অসন্তুষ্ট চিত্তে শত্রুর মোকাবেলা করতে।

কঠিন অর্থ-সংকটের চাপে পিষ্ট হয়ে কেরাকেলা আলেক্সান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে পণ্ডিতদের সহায়তা দানে বিরত থাকেন। সম্ভবত কেরাকেলার দৃষ্টিতে এটা তেমন অযৌক্তিক ছিল না। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মিউজিয়ামটি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে খুব কমই অবদান রাখছিল। মিশরের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী। তার কাজ ছিল মূলত পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজের উপর গবেষণা। সম্ভবত কেরাকেলা অনুভব করেছিলেন যে মিউজিয়ামটি মৃতপ্রায় এবং এখানে অর্থব্যয় করা নিস্ফল যখন সাম্রাজ্য নিজেই অর্থসংকটে ভুগছিল। এরপর আর এই মিউজিয়াম প্রাণ ফিরে পায়নি।

কেরাকেলার এই কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে পণ্ডিতদের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল আর সে সময়ের ইতিহাসবিদরা তার সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। মনে করা হয় তিনি তুচ্ছ কারণে আলেক্সান্দ্রিয়া আক্রমণ করে হাজার হাজার নাগরিককে মেরে ফেলেন। সন্দেহ নাই যে এটি একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী।

তবে আলেক্সান্দ্রিয়া বিজ্ঞানে ক্ষয়িষ্ণু হলেও বিদ্যাচর্চায় পশ্চাৎপদ হয়নি। এক ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেছিল যারা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক আর এই পথ অনুসরণ করে আলেক্সান্দ্রিয়া পৃথিবীকে এগিয়ে নিতে পেরেছিল।

পলের পরে এক শতাব্দী ধরে খ্রিস্টধর্ম প্রসার লাভ করে নিম্নশ্রেণির মানুষ ও মহিলাদের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে। শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেণী এর বিরোধীতা করেছে। যারা গ্রিক দার্শনিকদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারী ছিলেন তাদের কাছে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ বর্বরোচিত এবং খ্রিস্টের শিক্ষাকে সাদামাটা এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচারকে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। আলেক্সান্দ্রিয়ার ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সংগ্রামে যিনি সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে এথেন্সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মগ্রহণকারী এক পুরোহিত *ক্লেমেন্ট*, যিনি আলেক্সান্দ্রিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে গ্রিক দর্শনে ও খ্রিস্ট্রীয় তত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। তিনি গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে খ্রিস্ট্রীয় মতবাদকে সমৃদ্ধ করে তাকে একটি সম্মানজনক রূপ দিতে পেরেছিলেন। তারচেয়েও বড় কথা তিনি এর এমন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন যাতে সম্পদশালী ব্যক্তিরাও মুক্তির আস্বাদ পেতে পারে। তাছাড়া তিনি নষ্টিকবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্ত অবস্থান নিতে পেরেছিলেন।

ক্লেমেন্ট ছিলেন একজন গ্রিক এবং তিনি মিশরে তার শিক্ষা প্রচার করতেন। মিশরে *অরিগেন* নামে তার একজন মিশরীয় শিষ্য ছিল। তিনি ১৮৫ খ্রিস্টাব্দে আলেক্সান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বংশগতভাবে একজন গ্রিক পৌত্তলিকের সন্তান ছিলেন। ক্লেমেন্টের মতো তিনিও খ্রিস্ট মতবাদের সাথে গ্রিক দর্শনের মিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন।

তিনি প্লেটোবাদী একজন দার্শনিক *সেলসাসের* সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন কারণ সেলসাস খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেলসাসের বিরুদ্ধে অরিগেন একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে খ্রিস্টধর্মের পক্ষে এবং সেলসাসের বিরুদ্ধে লেখা হয়।

বর্তমানে সেলসাসের বইয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে অরিগেনের গ্রন্থে এর দশ ভাগের নয় ভাগই উদ্ধৃতি হিসাবে পাওয়া যায়। অরিগেনকে ধন্যবাদ যে তার প্রতিপক্ষের চিন্তাধারাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। এভাবেই খ্রিস্টধর্মের বৌদ্ধিক অনুষঙ্গে মিশরীয়রা অবদান রাখতে পেরেছে এবং ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চায় খ্রিস্ট্রীয় মতবাদের উত্তরণ ঘটাতে পেরেছে তবে সময় দ্রুত খারাপ হতে থাকে। ২২২ খ্রিস্টাব্দে *সেপ্টিমিয়াস সিভেরাসের* এক প্রপৌত্র *আলেক্সান্ডার সিভেরাস* সম্রাট হলেন। তিনি একজন সহৃদয় কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং তার মায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। ২৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন।

এরপর সম্রাটগণের এক জংলী উৎসব শুরু হয়। একের পর এক জেনারেলরা সিংহাসনের দাবিদার হয়ে চলে আসেন আর তার বিরোধী জেনারেল তাকে হত্যা করে। এই অর্ন্তদ্বন্দ্বে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। আর এর ফলে উত্তর থেকে জার্মান বর্বররা বন্যার মতো ধেয়ে আসে আর এখানে সেখানে টুকরো টুকরো রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

এবার সুযোগ এল পারসিকদের। ছয় শতাব্দী পূর্বে আলেক্সান্ডারের বিজয়ের পর এখন তার পুনর্জন্ম হলো। তৃতীয় এন্টিয়োকাসের পরে সেলুকীয় সাম্রাজ্যের পূর্বের প্রদেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, রোমানরা যাকে বলত *পার্থিয়া* (এটা পারসিয়া শব্দেরই একটি রূপান্তর)।

তিন শতাব্দীব্যাপী রোম ও পারস্যের মধ্যে উত্থান পতনের এক যুদ্ধ চলতে থাকে যাতে উভয় পক্ষে রক্তক্ষয় ছাড়া আর বিশেষ কিছুই অর্জন ছিল না। তারপর ২২৮ খ্রিস্টাব্দে যখন আলেক্সান্ডার সিভেরাস সিংহাসনে আসীন তখন পার্থিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চলে এক নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। যা ছিল একজন পারসিক দলপতি *সাসানের* বংশধর। কাজেই এই রাজ বংশকে বলা হয় *সাসানীয়*।

আলেক্সান্ডার সিভেরাসের মৃত্যুর পর রোমে যখন নৈরাজ্য চলছে সেই সুযোগে পারসিকরা অভিযান চালিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। ২৬০ খ্রিস্টাব্দে *এডেসায়* তারা রোমান সৈন্যের মুখোমুখি হয়। রোমান সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন সম্রাট *ভ্যালেরিয়ান*।

ঠিক কী ঘটেছিল তা আমরা জানিনা, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অদক্ষভাবে পরিচালিত রোমান সৈন্যরা ফাঁদে পড়ে যায় এবং পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয় এবং ভ্যালেরিয়ান নিজেও বন্দী হন। কোনো রোমান সম্রাট শত্রুদের হাতে বন্দী হয়, এটাই তার প্রথম দৃষ্টান্ত আর এই বজ্রনির্ঘোষ কর্ণবিদারী প্রতিপন্ন হল। পারসিক সৈন্যরা স্রোতের মতো এশিয়া মাইনরের উপর ভেঙ্গে পড়ে।

এবার ঘটল একটি বিস্মকর ঘটনা। সমুদ্র থেকে একশত ত্রিশ মাইল দূরে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত সিরিয়ায় *পালমিরা* নামে একটি মরুশহর ছিল। রোমান সাম্রাজ্য যখন ক্ষমতার শীর্ষে তখন এটি বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ভ্যালেরিয়ানের পরাজয়ের সময় পালমিরা ছিল একজন আরব বংশীয় সর্দার *অডিনেথাসের* শাসনাধীন। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি অবশ্য পারস্য সৈন্যের মুখোমুখি হতে চাননি (যারা ছিল অনেক পশ্চিমে) তৎপরিবর্তে পূর্ব ও দক্ষিণে তেসিফোনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন যা ছিল কম সুরক্ষিত পারসিক রাজধানী। বিরক্ত পারসিকরা পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয় এবং তাদের রোম বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। কৃতজ্ঞ রোমানরা তাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে এবং তাকে একজন স্বাধীন রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় তবে রাজকীয়তা সে যুগে কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল না এবং ২৬৭ খ্রিস্টাব্দে অডিনেথাস নিহত হন।

ক্লিওপেট্রার মতো একজন শক্তিধর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোক *জেনোবিয়া* তার শূন্যস্থানে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তার স্বামীর সমস্ত উপাধি তার পুত্রের বলে তিনি দাবি করলেন এবং নিজেই রোমের সম্রাটের পদ দখল করতে প্রস্তুত হলেন। ২৭০ খ্রিস্টাব্দে তার সৈন্যবাহিনী এশিয়া মাইনর অধিকার করে নিল আর সেই শীতকালেই তিনি মিশরে অভিযান পরিচালনা করলেন।

মিশরীয়রা সিনাইয়ের দ্বারপ্রান্তে শত্রুসৈন্যের উপস্থিতি দেখে, তিন শতাব্দী পূর্বে অগাষ্টাসের পর থেকে যেমনটা আর কখনো দেখেনি, বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারল না। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে জেনোবিয়া ও তার পুত্রকে রোমের যৌথ সম্রাট ঘোষণা করলেন।

তবে রোমে আর একজন সম্রাটের উদ্ভব ঘটল তিনি *অরেলিয়ান*, যিনি অরাজকতার কালে রোমের সিংহাসন আঁকড়ে ধরে ছিলেন। দ্রুতগতিতে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিমত্তার সাথে তিনি এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেনোবিয়ার বাহিনী পিছু হটে মিশর ত্যাগ করে তাদের নিজ অবস্থানে চলে গেল।

২৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অরেলিয়ান পালমেরীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন এবং পালমিরা দখল করে নিল। জেনোবিয়া ক্লিওপেট্রার চাইতে কম সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় অরেলিয়ানের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানে। এই গোলযোগের সুযোগে মিশরে *ফাইমাস* নামে একজন সম্পদশালী মিশরীয় নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। পালমিরা থেকে মিশরে ফিরে এসে অরেলিয়ান আলেক্সান্দ্রিয়া দখল করে নেন এবং ফাইমাসকে ক্রুশবিদ্ধ করেন। প্রথমে জেনোবিয়া ও তারপর অরেলিয়ানের দ্বৈত আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে মিশর তার নিজস্ব গতিতে চলতে লাগল।

তবে কিছু একটা হারিয়ে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ফাইমাস ও অরেলিয়ানের হট্টগোলে আলেক্সান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। টলেমীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন যা ছয় শতাব্দী ধরে টিকেছিল এবং তিনটি রাজবংশ যার প্রণোদনা দিয়েছিল, তা নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তবে সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। লাইব্রেরির অসংখ্য পেপিরাসের বান্ডিল এখনও টিকে আছে এবং যাতে সঞ্চিত রয়েছে গ্রিক সংস্কৃতির হাজার বছরের জ্ঞান এবং বিদ্যা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. খ্রিস্ত্রীয় মিশর

উৎপীড়ন

সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীগুলিতে খ্রিস্টধর্মের প্রসার পরিপূর্ণভাবে মসৃণ ছিল না, বিরোধমুক্তও ছিল না। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ ছিল: সম্রাটের দাপ্তরিক মতবাদ, গ্রিক রহস্যময় ধর্মমত, মিশরের সেরাপিও এবং আইসিস আচার অনুষ্ঠান সবগুলি সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

এ সবের চাইতে শক্তিশালী ছিল মিথ্রীয়বাদ, উৎস পারসিক ধর্ম, যা ছিল মূলত সূর্য-দেবতার পূজা। অগাষ্টাস ও টাইবেরিয়াসের সময়ে রোমে এর একটি প্রতিকল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। এর এক শতাব্দী পরে ট্রেজান ও হাড্রিয়ানের শাসনামলে এটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ধর্মমতগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ২০০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য জরিপ করতে গিয়ে যে কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, যদি একটি ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করতে চায় তাহলে তা হবে মিথ্রীয়বাদ, খ্রিস্টধর্ম নয়।

তবে মিথ্রীয়বাদের একটি ভয়ংকর ত্রুটি ছিল। এর আনুষ্ঠানিকতায় শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করতে পারত, মেয়েদেরকে সেখান থেকে বাদ দেওয়া হতো আর সেজন্য তারা প্রায়ই খ্রিস্টান হয়ে যেত। তারা শিশুদেরকে প্রতিপালন করত এবং তাদের ধর্মগ্রহণে উৎসাহিত করত। গ্রিক দর্শনেরও প্রবল প্রভাব ছিল এবং এ ব্যাপারে *প্লটিনাস* (জন্মসূত্রে একজন মিশরীয়) নামে এক দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন *লাইকোপলিস* নামে এক নগরে, যার অবস্থান ছিল হতভাগ্য ইখনাতনের শহর আখেতাতন থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে। তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করেন এবং এথেনীয় দার্শনিক প্লেটোর অনুকরণে এক নতুন দর্শনের উদ্ভব ঘটান, তবে সেটি নূতন ধর্মমতের দিকে অগ্রসরমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যুক্তিবাদি গ্রিক চিন্তার সাথে রহস্যময় প্রাচ্য চিন্তার একটা সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যাকে বলা হয়েছিল নব্য- প্লেটোবাদ।

সাম্রাজ্যে প্রচলিত সকল ধর্মীয় মতবাদ ও দর্শনের মধ্যে খ্রিস্টধর্মই সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল (যদি অবশ্য ইহুদিবাদকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিই)। খ্রিস্টীয়বাদ অন্য কোনো মতবাদের সাথে আপোস করতে রাজী ছিল না এবং নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম মনে করত।

অধিকন্তু প্রথম দিকে খ্রিস্টবাদ ছিল অত্যন্ত শান্তিবাদী। তারা পৌত্তলিক সম্রাটদের হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাত (বিশেষ করে যেহেতু সম্রাটের সৈন্যদের সম্রাট পূজায় অংশগ্রহণ করতে হতো)। অপরপক্ষে তারা এই ধারণা পোষণ করত যে খ্রিস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম যেখানে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন থাকবে না এবং এক আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে। এতে করে অন্য মতাবলম্বীদের কাছে খ্রিস্টধর্ম অত্যন্ত অ-জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম দিকে খ্রিস্টানরা প্রবল উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে নীরো ও ডমিশিয়ানের রাজত্বকালে। তবে তা ছিল তুলনামূলকভাবে স্বল্পস্থায়ী এবং বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি কিন্তু আলেক্সান্ডার সিভেরাসের হত্যার পর যে অরাজকতা শুরু হয় যখন সাম্রাজ্য নিজেই টালমাটাল, তখন খ্রিস্টানরা আবার অত্যাচারিত হতে থাকে।

২৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সম্রাট *ডিসিয়াস* সারা সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপর ব্যাপক অত্যাচারের নির্দেশ দেন এবং এতে করে খ্রিস্টানরা চরম সংকটে নিপতিত হয়। শুধু দুইটি বিষয় তাদেরকে বাঁচিয়েছিল প্রথমত খ্রিস্টানরা ছিল প্রবল ধর্মোন্মাদ এবং তাদের বিশ্বাসকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরত যে তারা এ জন্য মরতেও রাজী ছিল। যাতে করে পরকালে তারা স্বর্গে মহাসুখ উপভোগ করবে। এ জন্য অসংখ্য খ্রিস্টানের বলিদান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর অনেকেই, যারা এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে তারা এই বিশ্বাসের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। এই উৎপীড়নের ফলে যত লোক মারা গেছে তার চাইতেও বেশি করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এরূপ উৎপীড়ন দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না এবং পরবর্তী সম্রাটগণ ধীরে ধীরে নমনীয় হতে শুরু করেন। ২৫৯ খ্রিস্টাব্দে *গ্যালিয়েনাস* সম্রাট হলেন। তিনি ছিলেন প্লটিনাসের শিষ্য, যিনি তখন রোমে শিক্ষা দিচ্ছিলেন আর নব্য প্লেটোবাদের সহনশীলতা প্রচার করছিলেন। প্লটিনাস অনুভব করেছিলেন সত্য কখনো জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না এবং মিথ্যা যুক্তিবাদিতার শক্তির কাছে টিকে থাকতে পারে না। তাই খ্রিস্টানদের উপর চাপ অনেকটা হ্রাস পেল।

অবশ্য এক দশকের উৎপীড়ন অনেকটাই ছাপ ফেলে যায়। আলেক্সান্দ্রিয়ায় অনেক বিশপ নিহত হন, অরিগেনের উপর এত অত্যাচার করা হয় যে তিনি প্রাণে মারা না গেলেও দৈহিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং টায়ারে গিয়ে অবশেষে ২৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকন্তু একটি নমনীয় যুগের পরে আবার একটি উৎপীড়নের যুগ সৃষ্টি হয়, আর এক শতাব্দী ধরে খ্রিস্টানরা কখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারেনি। ইহুদিদের মধ্যে ছিল একটি কৃচ্ছ্রসাধন গোষ্ঠী যারা মনে করত জীবনের কঠোরতা ঈশ্বর সাধনার জন্য অপরিহার্য, এবং পার্থিব প্রলোভন থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। ইহুদিদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করত এবং ভোগ বিলাস সম্পূর্ণরূপে পরিহার করত।

উৎপীড়নের যুগে খ্রিস্টানরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে *এলিজা* ইসরাইলের রানি জেবেলের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান। মেকাবিস, হেরড এবং রোমানরা কঠোর ইহুদি সম্প্রদায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

তাহলে খ্রিস্টানরাই বা কেন নির্বাসনে যাবে না। এই পৃথিবী দুষ্ট, একে পরিহার করাই উত্তম। এই পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে পৌত্তলিকদের উৎপীড়নের মধ্যে থাকতে হবে এবং জীবন রক্ষার্থে খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগের লোভ আসতে পারে। তাই জঙ্গলে গিয়ে আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।

মিশরের আবহাওয়া এমন যে, নিঃসঙ্গ নির্বাসনের জীবন সমাজ জীবনের চাইতে অধিকতর আকর্ষণীয়। নিকটবর্তী মরুভূমি নির্জন শান্ত, সেখানে হিমেল শীতের প্রাদুর্ভাব নাই, ঝড় বৃষ্টির শন্‌শনানি নাই। জীবনযাত্রা সরল নির্বিরোধ।

প্রথম নির্বাসনে যাওয়া মিশরীয়র নাম *এন্থনি*। ২৫০ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম আর বিশ বছর বয়সে তিনি কৃচ্ছ্র সাধনার সংকল্প গ্রহণ করেন। ২৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে সমাজের প্রলোভন থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ এবং সেজন্য তিনি নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তার ধার্মিকতা ও পবিত্রতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিবছর অনেক লোক মরুভূমিতে গিয়ে ঈশ্বরের সাধনায় আত্মনিবেদন করে আর এভাবেই কঠোর অত্মসংযমীদের দ্বারা মিশরের মরুভূমি পরিপূর্ণ হয়। তবে সবাই এন্থনির খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। প্রবাদ আছে যে তিনি ১৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এন্থনি খ্রিস্টধর্মে সন্ন্যাসবাদের প্রবর্তন করেন, খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এভাবেই খ্রিস্টধর্মের আর একটি রূপকল্পের জন্ম হয়েছিল মিশরেই।

এ রি য়া ন গ ণ

২৮৪ খ্রিস্টাব্দে *ডায়ক্লিসিয়ান* নামে একজন যোগ্য সেনাপতির সিংহাসনে আরোহণের পর রোমান সাম্রাজ্যের একটি নূতন পর্যায় শুরু হল। তিনি সাম্রাজ্যের খোলনলচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালটে ফেলেন এবং অগাষ্টাস ও তার উত্তরাধিকারীদের রিপাবলিকান পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন তার বদলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের।

তার চেয়েও বড় কথা, তিনি একজন যুগ্ম-সম্রাটের পদ সৃষ্টি করেন এবং তিনি ও তার সহযোগী-সম্রাটও সিজার নামে একজন করে সহকারীর নিয়োগ দান করেন। কাজেই সাম্রাজ্যের প্রশাসন ও সামরিক কাজে চার জন অংশীদারের সৃষ্টি হল। পারস্য-ভীতি নিরসনের জন্য ডায়ক্লিসিয়ান মিশর এবং এশীয় প্রদেশগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি শহর *নিকোমেডিয়ায়* তার রাজধানী স্থাপন করেন।

তবে অরাজকতার পরিস্থিতি তখনও বিদ্যমান ছিল। সেনাধ্যক্ষরা তখনও অনুভব করতেন যে তাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে সুযোগ বুঝে তারাও নিজেদেরকে সম্রাট ঘোষণা করতে পারেন। *একিলিয়ুস* নামে মিশরের একজন সেনাপতি ২৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। আট মাস ধরে আলেক্সান্দ্রিয়া অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা দখল করে একিলিয়ুসকে হত্যা করা হয়। ৩০৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের উপর চরম এবং সর্বশেষ নির্যাতন শুরু করেন ডায়ক্লিসিয়ান। ডায়ক্লিসিয়ানের উত্তরাধিকারী *গ্যালিরিয়াসের* শাসনকালেও প্রাচ্যে এই নির্যাতনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং স্বল্পমাত্রায় হলেও তার উত্তরাধিকারী *লিসিনিউসের* শাসনকালেও তা বলবৎ থাকে।

সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্ধের শাসকরা সাধারণত খ্রিস্টধর্মের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম *কনস্টান্টিন* সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষমতাসীন হন। ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৩১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি পুরো পশ্চিম সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। কনস্টান্টিন ছিলেন একজন ধূর্ত রাজনীতিবিদ্ আর তিনি ভাবলেন যদি খ্রিস্টানদের সমর্থন লাভ করা যায় (তখন পর্যন্ত তারা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ তবে সক্রিয় ও উচ্চকণ্ঠ), তাহলে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। কাজেই তিনি লিসিনিয়ুসকে বাধ্য করলেন, তখন পর্যন্ত যিনি সাম্রাজ্যের পূর্বার্ধের সম্রাট, তিনি যেন "সহনশীলতার একটি আদেশ" জারি করেন যাতে সকল ধর্মের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়।

লিসিনিয়ুস এই আদেশটিকে বরং দুর্বল ভাবলেন এবং ৩২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রথম কনস্টান্টিনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। এখনও খ্রিস্টান ধর্মের পরিপূর্ণ বিজয়ের অর্ধশতাব্দী বাকী রয়েছে তবে নির্যাতনকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছে (এর তেরো বছর পরে তার মৃত্যুশয্যায় প্রথম কনস্টান্টিন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান সম্রাট)।

পৌত্তলিকদের দ্বারা উৎপীড়নের যুগের শেষ হলেও অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েই গেল। খ্রিস্টানদের মধ্যে সবসময় মতভেদ বিদ্যমান ছিল। এমনকি খ্রিস্টধর্ম প্রসারের শুরুতে পলের উপাখ্যানেও এই মতভেদের কথা লিপিবদ্ধ আছে। খ্রিস্টানরা যখন অবিরাম নির্যাতনের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত তখন শুধু ক্রুদ্ধ বাকবিতণ্ডা ছাড়া বেশি কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। তবে রোমান সম্রাটের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তারা বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর যারা সম্রাটের পক্ষে থাকত তারাই হতো অধিক শক্তিশালী। তাই খ্রিস্টানরা বিধর্মীদের দ্বারা উৎপীড়িত না হলেও নিজেরাই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর নির্যাতন চালাত।

খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার প্রধানতম কেন্দ্র হিসাবে আলেক্সান্দ্রিয়া এই বিবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এটা সত্য যে প্রথম কনস্টান্টিনের সময় যিশুর চরিত্র নিয়ে একটা তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠেছিল তিনি কোনো দৈবী শক্তির অধিকারী কি না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, যাদের বলা যায় ঐক্যবাদী, যিশু মোটেই কোনো দৈবী শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাদের মতে ঈশ্বর মাত্র একজন এবং তিনি ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঈশ্বর। যিশু হলেন একজন সৃষ্ট মানব, তিনি যেই হোন না কেন ঈশ্বর নহেন। যিশু শ্রেষ্ঠ মানব হতে পারেন, পবিত্রতম পয়গম্বর হতে পারেন, স্বর্গীয় আলোকে উদ্দীপ্ত শিক্ষক হতে পারেন তবে কোনোক্রমেই ঈশ্বর নন।

অন্যপক্ষের মতে ঈশ্বরের তিনটি রূপ যা সব দিক দিয়ে সমকক্ষ এবং তারা অনন্তকাল বিদ্যমান ছিল। এর একজন হলেন পিতা, যিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আর একজন পুত্র, যিনি যিশুরূপে শরীর ধারণ করেছেন; আর একজন পবিত্র আত্মা, যিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন, যার সাহায্য ব্যতিত কোনো মানুষই কর্মক্ষম থাকতে পারে না। ঈশ্বরের এই তিন রূপকে একত্রে বলা হয়েছে "ট্রিনিটি" (একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ ত্রিমূর্তি)।

এই ট্রিনিটিবাদের প্রধান প্রচারক হলেন *এরিয়াস* নামে এক আলেক্সান্দ্রীয় পুরোহিত। তার মতবাদের প্রচার এতই দৃঢ় ছিল যে তার নামে এই মতবাদকে বলা হয়েছে এরিয়ানিজম, আর যারা এই মতের সমর্থক তাদের বলা হয় এরিয়ান। আলেক্সান্দ্রিয়ান ছাড়াও প্রথম কনস্টান্টিনের সময়ে এই মতবাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থক ছিল এশিয়া মাইনরে। মিশর তখনও নস্টিকবাদের ছায়ায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, যাতে বলা হয়েছে যিশু একজন পবিত্র আত্মা তিনি মোটেই দেহধারী নন, তিনি একাধারে স্বর্গীয় এবং মানবীয়।

অধিকাংশ আলেক্সান্দ্রীয়রাই *ত্রিত্ববাদে* বিশ্বাসী ছিল এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্ডারকে সবসময় উসকে দেওয়া হতো এর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কঠোর হতে। ৩২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আলেক্সান্ডার বিশপদের একটি সম্মেলন (সিনোড) আহবান করেন। যারা সরকারিভাবে এরিয়ানদের মতবাদকে নিন্দা করেছিল, তবে এরিয়াস এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি।

ঠিক এই সময়ে কনস্টান্টিন সাম্রাজ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং তার কাছে ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য একটি আবেদন জানানো হয় (বিশপরা হয়তো তার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নাও ভাবতে পারেন তবে তা অমান্য করার সাহসও কারও ছিল না)। এই ব্যাপারে কনস্টান্টিন তার মতামত প্রদানে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি এই ধর্মীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধের ভালোমন্দ নিয়ে মোটেই ভাবিত ছিলেন না। তবে তিনি এর রাজনৈতিক বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি খ্রিস্টান সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং সেই জন্যই খ্রিস্টানদের খ্যাপাতে চাননি। তবে খ্রিস্টানরা নিজেরাই যদি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের সমর্থন তেমন কাজে আসবে না। হয়তো তার প্রতিপক্ষ বিরোধী উপদলকে সমর্থন করে সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতেও পারে।

তাই ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কনস্টান্টিন রাজধানী নিকোমেডিয়ার পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে *নিশিয়া* নগরে বিশপদের এক বিশাল সম্মেলন আহবান করেন এবং বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার আদেশ দেন। এটাই ছিল খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত প্রথম কাউন্সিল, যেখানে সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে বিশপরা যোগদান করেছিলেন।

বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়, যদিও কাগজ কলমে। কাউন্সিল থেকে একটি ফর্মুলার পক্ষে মতদান হয় (নিসিন মতবাদ) যা সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে মান্য করতে হবে। এই সম্মেলনে ট্রিনিটিবাদকে গ্রহণ করা হয়। এরিয়াস এবং গোড়া এরিয়ানদের অনেককে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

তাত্ত্বিকভাবে হলেও ট্রিনিটিবাদকে সমগ্র খ্রিস্টান জগতে গ্রহণ করা হয়, সর্বজনীন চার্চ অথবা গ্রিক ভার্সনে সর্বজনীন ক্যাথলিক চার্চ। কাজেই ট্রিনিটিবাদের সমর্থকদের বলা হয় ক্যাথলিক আর এরিয়ানদেরকে আখ্যায়িত করা হয় ধর্মদ্রোহীরূপে।

৩২৫ খ্রিস্টাব্দে মনে হয় আলেক্সান্দ্রিয়া গুরুত্বের একটি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। রোমেরই বরং একটি পশ্চাৎ আসন লাভ হয়েছিল। ডায়ক্লিসিয়ানের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে অর্ধশতাব্দীব্যাপী যে নৈরাজ্য বর্তমান ছিল তাতে রোমের সম্পদ এবং সম্মান উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৭১ খ্রিস্টাব্দে অরেলিয়ান রোমে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। যাতে প্রমাণ হয় রোম নগরী শত্রুর আশঙ্কামুক্ত ছিল না।

তারপর যখন ডায়ক্লিসিয়ান নিকোমেডিয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন তখন রোমের আরও অবনতি ঘটে কারণ এটা আর সম্রাটের আবাসস্থল রইল না। নিকোমেডিয়াও আকার আয়তনে তেমন গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি। নতুন সম্রাটের উপস্থিতি সত্ত্বেও এটা শুধু একটি প্রাদেশিক শহরই রয়ে যায়।

কনস্টান্টিনোপল

প্রথম কনস্টান্টিনের একটি পদক্ষেপ আলেক্সান্দ্রিয়ার অবস্থান টলায়মান হয়ে পড়ে। তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তিনি যে জায়গাটি নির্বাচন করেন সেটি এশিয়া মাইনরের ইউরোপীয় প্রান্তে যেখানে হাজার বছর ধরে একটি গ্রিক নগরী বাইজেন্টিয়াম অবস্থিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রাজধানী নির্মাণে কনস্টান্টিন চারটি বছর ব্যয় করেন এটিকে বিশাল বিলাসবহুল করার জন্য; আর এ জন্য তিনি সাম্রাজ্যের অন্যান্য নগরগুলির বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলি তার নতুন রাজধানীতে সরিয়ে আনেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমলা এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে তার নতুন রাজধানীতে আকৃষ্ট করা। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে এই নতুন নগরকে কনস্টান্টিনের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং তার নামকরণ করা হয় কনস্টান্টিনোপল (কনস্টান্টিনের নগরী)। আলেক্সান্দ্রিয়া আবারও হঠাৎ করেই দ্বিতীয় অবস্থানে চলে গেল, কারণ নতুন নগরীটি দ্রুতগতিতে সম্পদ, জৌলুস এবং জনসংখ্যায় সবাইকে অতিক্রম করে গেল এবং পরবর্তী হাজার বছর ধরে খ্রিস্টান জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা নিয়ে টিকে রইল।

আলেক্সান্দ্রিয়ার অবস্থান আগের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিক সংকটের সম্মুখীন হল। রোমের কাছে দ্বিতীয় অবস্থানে যাওয়া যে নগরী বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পরিবর্তে শুধু পেশীশক্তিতে এগিয়ে ছিল তা আলেক্সান্দ্রিয়ার জন্য অবমাননাকর।

এরপর যে সব ধর্মীয় বিরোধ ছিল তা আরও তিক্ত হয়ে দেখা দিল এবং সে বিরোধ কেন্দ্রিভূত হল কনস্টান্টিনোপল ও আলেক্সান্দ্রিয়া এই দুই নগরীর মধ্যে।

নিকিয়ায় এরিয়ানরা পরাজিত হয়, তবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এশিয়া মাইনরের কিছুসংখ্যক বিশপ এরীয় মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন *ইউসেবিয়াস*, যিনি ছিলেন নিকোমেডিয়ার বিশপ।

কনস্টান্টিনোপলে দ্রুত তার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীঘ্রই কনস্টান্টিন আফসোস করতে থাকেন এজন্য যে নিকিয়াতে বিশপদেরকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেন বিশপদের কার্যকলাপ খ্রিস্ট জগতের মতবিরোধ দূর করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতপক্ষে এশিয়া মাইনর ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের খ্রিস্টানরা এরিয়ানবাদকেই সমর্থন করেন আর কনস্টান্টিন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাননি।

অতএব ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি টায়ারে বিশপদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং নিকিয়ায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলেন। এরিয়াস তার পদে পূনর্বহাল হন (তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি হওয়ার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হঠাৎ করেই এরিয়ানবাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে)। তবে এতে করে ক্যাথলিক মতবাদের মৃত্যু ঘটেনি যা আলেক্সান্দ্রিয়ায় টিকে থাকে।

এক দশক পূর্বে *এথেনীসাস* নামে একজন যুবক পুরোহিত আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্ডারের সেক্রেটারী হিসাবে নিকিয়ার কাউন্সিলে যোগ দেন। ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলেক্সান্ডারের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিশপের পদ লাভ করেন। তিনি ক্যাথলিক ত্রিত্ববাদের একজন উচ্চকণ্ঠ সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। টায়ারের সিনোডের সিদ্ধান্ত অনুসারে এথেনিসাসকে নির্বাসন দেওয়া হয় তবে তার কণ্ঠরোধ করা যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কনস্টান্টিনের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র সাম্রাজ্যের তিনটি অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। মধ্যমপুত্র দ্বিতীয় *কনস্টান্টিউস* পূর্ব সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন এরিয়ানবাদের একজন প্রবল সমর্থক এবং ৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি *ইউসেবিয়াসকে* কনস্টান্টিনোপলের প্রধান বিশপ নিয়োগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই ইউসেবিয়াস এবং তার উত্তরাধিকারীরা অনুভব করেন যে খ্রিস্টধর্মের রাজকীয় নগরের বিশপ হওয়ার কারণে তারাই হবেন চার্চের প্রধান (এই একই কারণে রোমের বিশপরাও এই ধারণা পোষণ করত যার কারণে খ্রিস্টধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে)।

ইউসেবিয়াস এবং এথেনিসাস মতবাদগত কারণেই যে শুধু বিভক্ত হয়েছিল তাই নয়, প্রকৃত ক্ষমতা দখলই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় কনস্টান্টিয়াসের শাসনকালে এথেনিসাস অধিকাংশ সময়ই নির্বাসনে ছিলেন। ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে কনস্টান্টিয়াসের ভ্রাতারা যখন মৃত এবং অন্যান্য ক্ষমতার দাবিদাররাও পরাজিত ও নিহত তখন দ্বিতীয় কনস্টান্টিয়াস সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসেন। এতে করে মনে হয় এরিয়ানবাদেরই পরিপূর্ণ জয়লাভ ঘটবে।

তবে কনস্টান্টিয়াস চিরজীবী ছিলেন না। ৩৬১ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র *জুলিয়ান* উত্তরাধিকার লাভ করেন (খ্রিস্টধর্মে শিক্ষা লাভ করেও তিনি নিজেকে একজন পৌত্তলিক বলে ঘোষণা করেন)। অবিলম্বে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বুঝতে পারেন বিভিন্ন খ্রিস্ট্রীয় সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিলে তারা পরস্পরকে কামড়াকামড়ি করে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জুলিয়ান যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলেন তেমনটা ঘটেনি। তিনি দুই বছরেরও কম সময় ক্ষমতায় টিকে ছিলেন এবং ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। খ্রিস্টানরাও এ সময় বুঝতে পারে যে নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত থাকলে পৌত্তলিকদের উত্থান ঘটবে, তাই তারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। জুলিয়ানের স্বল্পকালীন শাসনকালে এরিয়ানদের ক্ষমতা হ্রাসে সাহায্য করেছিল। জুলিয়ানের আদেশে ক্যাথলিক বিশপরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসে স্বপদে বহাল হতে পেরেছিল। এমনকি এথেনিসাসও আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফিরে এসেছিলেন (যদিও দীর্ঘকালের জন্য নয়)। ক্যাথলিকরা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদেরকে আর নতুন করে টলানো সম্ভব ছিল না, কারণ পরবর্তী সম্রাটরা দ্বিতীয় কনস্টান্টিয়াসের মতো এরিয়ানবাদের তেমন গোড়া সমর্থক ছিলেন না।

৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এথেনিসিয়াসের মৃত্যুর পর পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় ক্যাথলিক মতবাদ বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সে বিজয় অর্জন হয়েছিল ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে, যখন প্রথম থিওডোসিয়াস সম্রাট হলেন। তিনি ছিলেন একজন গোড়া ক্যাথলিক, যতটা গোড়া এরিয়ান ছিলেন দ্বিতীয় কনস্টান্টিয়াস। ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপলে একটি খ্রিস্ট্রীয় ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরিয়ানবাদকে আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আর এবার রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণশক্তিতে ক্যাথলিকবাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এরীয় এবং অন্যসব বিধর্মী সম্প্রদায়ের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাদের গীর্জা অধিকার করে নেওয়া হয়। ক্যাথলিক মতবাদের বাইরে অন্যান্য খ্রিস্ট্রীয় সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার কোনো অধিকার রইল না।

এবার কনস্টান্টিনোপলের উপর বিজয় হলো অন্ততপক্ষে সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে (কিছু জার্মান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এরিয়ানবাদ টিকে ছিল প্রায় তিন শতাব্দী ধরে যারা শীঘ্রই স্রোতের মতো রোমান সাম্রাজ্যে চলে আসতে থাকে)।

প্রথম থিওডোসিয়াস যেমন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তেমনি খ্রিস্টান ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও খড়গহস্ত ছিলেন। ৩৮২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমার্ধের সহ-সম্রাট *গ্রেশিয়ান* সিনেট থেকে পৌত্তলিক বেদী অপসারণ করেন এবং পৌত্তলিক পুরোহিতদের পন্টিফেক্স মেক্সিমাস পদবী পরিত্যাগ করান। ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিয়াস অলিম্পিক ক্রীড়ার সমাপ্তি ঘোষণা করেন যা প্রায় বার শতাব্দী ধরে পৌত্তলিক গ্রিকদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব ছিল। তারপর ৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে বর্বর আক্রমণকারীদের (যারা ছিল এরিয়ান খ্রিস্টান), তারা এথেন্সের কাছে সেরিস-এর মন্দির ধ্বংস করে। এতে করে গ্রিকদের শ্রদ্ধেয় ধর্ম-বিশ্বাস এলুসিয়ান রহস্যের চির-অবসান ঘটে।

তবু যে ভাবেই হোক না কেন পৌত্তলিকতার কিছু অবশেষ রয়ে যায়। গ্রীসের দার্শনিকরা দ্বিধাগ্রস্ত একাডেমিক (এথেন্সের স্বর্ণযুগে প্লেটোর দ্বারা যে একাডেমী প্রতিষ্ঠা) স্রোতাদের নিকট পৌত্তলিক মতবাদ প্রচার করতে থাকে। বহুযুগের মিশরীয় ধর্মও রেহাই পায়নি। একটু একটু করে মিশরের জনগণ অসিরিস থেকে যীশু, আইসিস থেকে মেরী বহুসংখ্যক দেবতা থেকে অসংখ্য সাধুতে পরিবর্তন করে। অনেক প্রাচীন মন্দির অবহেলায় পড়ে থাকে অথবা গীর্জায় পরিবর্তন করা হয়। ধ্বংসের শেষ সুর স্পষ্টভাবে শোনা যায় ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে যখন আলেক্সান্দ্রিয়ায় ছয় শতাব্দী টিকে থাকার পর সম্রাটের আদেশে সেরাপিয়ন ধ্বংস করা হয়।

আলেক্সান্দ্রিয়ার ভাগ্যে এর চেয়েও বড় দুর্ভোগ ছিল। আলেক্সান্দ্রিয়ার সবচেয়ে বড় পৌত্তলিক দার্শনিক শিক্ষক ছিলেন *হাইপেসিয়া*। *সিরিল* তাকে বিপজ্জনক ভাবত। ৪১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ নিযুক্ত হন অংশত তার আকর্ষণীয় দার্শনিক এবং অংশত একজন ধর্মনিরপেক্ষ মিশরীয় কর্মকর্তার সাথে তার সম্পর্কের কারণে।

ধারণা করা হয় সিরিলের উস্কানিতেই ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে একদল উত্তেজিত সাধু হাইপেশিয়াকে হত্যা করে এবং তারা আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির অনেক কিছুই ধ্বংস করে দেয়। যেভাবে এক শ্রেণীর খ্রিস্টান পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাতে মানব সমাজে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। তবু সিরিলের সময়ে প্রাচীন ধর্মের কিছু কিছু অবশেষ টিকে ছিল।

অনেক দক্ষিণে প্রথম প্রপাতের কাছে ফাইলি দ্বীপে দ্বিতীয় *নেকটানেবোর* নির্মিত আইসিসের একটি মন্দির সাত শতাব্দী ধরে টিকে ছিল। দ্বিতীয় টলেমী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলাডেলফাস এবং ক্লিওপেট্রা এটা পূনর্নির্মাণ করেছিলেন। পৃথিবী যখন খ্রিস্টধর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখনও সেখানে স্বর্গের রানির মৃদু হাসি দেখা যাচ্ছিল এবং গোপনে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো।

ম নো ফা ই সা ই ট গ ণ

আলেক্সান্দ্রিয়া দীর্ঘস্থায়ীভাবে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ চলতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে *জন ক্রিসোস্টম* কনস্টান্টিনোপলের বিশপ নিযুক্ত হন। সুন্দর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তার একটি উপাধি ছিল সোনালি মুখ।

তার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল বিলাসিতা ও অমরত্বের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে তিনি এমনকি সম্রাজ্ঞীকেও ছাড় দেননি। বিরক্ত হয়ে সম্রাজ্ঞী ক্রিসোস্টমকে নির্বাসনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি *থিওফাইলাসকে* সহযোগী হিসাবে পেয়ে যান যিনি ছিলেন সিরিলের পূর্বসূরি আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ। কিছু কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পেরেছিলেন, আর নির্বাসনে ক্রিসোস্টমের মৃত্যু হয়। আলেক্সান্দ্রিয়া আরও একবার বিজয় লাভ করল। এটা অবশ্য ব্যক্তিত্বের বিরোধ ছিল। তাত্ত্বিকতার বিরোধ ছিল দুটি নগরের মধ্যে।

৪২৮ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া থেকে আগত একজন পুরোহিত দ্বিতীয় *থিওডোসিয়াস* কর্তৃক রোমের বিশপ নিযুক্ত হন। এই সম্রাটের অধীনে এরিয়ান ও অন্যান্য বিধর্মীদের অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। নেস্টোরিয়াস যীশুকে কেন্দ্র করে আর একটি বিরোধ উসকে দেন। এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বাস যে যিশুর একটি স্বর্গীয় রূপ ছিল। এবার এরিয়ানবাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটায় তার একটি মানবিক রূপ প্রকাশ পায় আর প্রশ্ন দেখা দেয় এই দুটি রূপের কিভাবে সমন্বয় করা যায়।

নেস্টোরিয়াস এই মতবাদ পোষণ করতেন যে এই দুটি রূপ সম্পূর্ণ পৃথক এবং মেরী শুধু মানবিক রূপেরই মাতা ছিলেন, স্বর্গীয় রূপের নয়। তাকে খ্রিস্টের মাতা বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের মাতা নয়। এই মতবাদকে বলা হয়েছে নেস্টোরীয়বাদ।

একে বলা যায় এরিয়ানবাদরে দিকে পিছন ফিরে চলা এবং আলেক্সান্দ্রিয়ায় এই মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। আলেক্সান্দ্রিয়ার সিরিল ছিলেন একজন অক্লান্ত শত্রু। দ্বিতীয় থিয়ডোসিয়াস ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মাইনর উপকূলের একটি শহর *ইফেসাসে* একটি ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করেন। এই কাউন্সিলে বিভিন্ন মতবাদী বিশপদের সমাবেশ ঘটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিরিল তার প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং নেস্টোরীয়বাদ বেআইনী ঘোষণা করা হয়। নেস্টোরিয়াসকে তার নিজ পদ থেকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপসারণ করা হয় এবং মিশরে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পর পর তিনটি ধর্ম সম্মেলনে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিজয় লাভ হয়।

তবু এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ায় নেস্টোরীয়বাদ টিকে থাকে আর এর বিরুদ্ধে যখন রাষ্ট্রীয় পীড়ন অসহনীয় হয়ে উঠে তখন এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা দেশত্যাগ করে পারস্যে চলে যায়। ঘটনাক্রমে তারা সুদূরপ্রাচ্যে চীন পর্যন্ত গ্রিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়।

তবে ইউটেকিস নামে কনস্টান্টিনোপলের একজন পুরোহিত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তার মতে যিশু একটিমাত্র স্বরূপ আর তা হলো স্বর্গীয়। তিনি শুধু মানবিক রূপ ধারণ করেছিলেন। এটাই মনোফাইসাইট (*অভিন্ন প্রকৃতির* গ্রিক প্রতিশব্দ) মতবাদের ভিত্তি, মিশরে যে দৃষ্টিভঙ্গিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল আর কনস্টান্টিনোপলে একে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয়।

আলেক্সান্দ্রিয়ার সিরিল ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন আর তার উত্তরাধিকারী কঠোরভাবে মনোফাইসাইট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিবাদ বিপজ্জনক রূপ নেয় এক শতাব্দী পূর্বে এরিয়ান প্রশ্নে যেমনটা ঘটেছিল, এবং দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে এটা সামাল দেওয়া যাবে।

দুই রূপের তত্ত্ব কনস্টান্টিনোপল আর রোমেও গৃহীত হয়েছিল এবং এটা গোড়া ক্যাথলিক রূপ লাভ করে এবং অখণ্ডরূপী মনোফাইসাইটবাদকে ধর্মদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইউটেকিসকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

এই পরাজয়কে আলেক্সান্দ্রিয়া সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। একগুয়েমিভাবে মনোফাইসাইটবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকে, বিশেষ করে যেহেতু কনস্টান্টিনোপল এর বিপরীত মতবাদ পোষণ করত।

প্রথম থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সাম্রাজ্যে ধর্মীয় অনৈক্য (একের পর এক ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও) আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্রের একজন পূর্বার্ধে এবং অপরজন পশ্চিমার্ধে শাসনভার লাভ করেন এবং এরপর সাম্রাজ্য আর কখনোই পুনরেকত্রিত হতে পারেনি। বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি অর্ধাংশ হয়ে রয়ে যায়। একাংশ উল্লেখিত হয় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং অপরার্ধ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যরূপে। দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস এবং মার্সিয়ান যারা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন তারাই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট হন। অবশ্য মিশরও পূর্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পশ্চিম সাম্রাজ্যকেই এই বিপর্যয়ের অধিকতর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। প্রথম থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পরবর্তী শতাব্দীতে হুণ এবং বিভিন্ন জার্মান উপজাতীয়গণ সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশগুলির উপরে চড়াও হয়। ভেন্ডাল নামে একটি জার্মান উপজাতি স্পেনের সংকীর্ণ প্রণালী পার হয়ে আফ্রিকায় ঢুকে পড়ে এবং কার্থেজকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য গঠন করে। পূর্ব সাম্রাজ্যের কোনো কোনো প্রদেশেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযান চলে। মিশর অবশ্য অধরাই রয়ে যায়। এই শতাব্দীব্যাপী হট্টগোলের মধ্যেও যেখানে শান্তি বজায় ছিল।

৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এই অর্থে যে, শেষ শাসক হিসাবে যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার পদচ্যুতি ঘটে। পূর্ব সাম্রাজ্য অখণ্ড রয়ে যায়। এক সময় মনে হয় যা কিছু হারিয়েছিল তার সবই পুনরুদ্ধার সম্ভব। একজন সক্ষম সম্রাট *জাস্টিনিয়ান* ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূর্ব দিকে তার সেনা অভিযান প্রেরণ করেন বর্বরদের হাত থেকে পূর্ব সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিকে উদ্ধার করার জন্য।

সেই বাহিনী উত্তর অফ্রিকায় *ভেন্ডাল* রাজত্ব ধ্বংস এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়। ইতালী এবং স্পেনের অংশবিশেষ দখল করা হয়। এক সময় মনে হয় বর্বরদের জোয়ার সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, দুই শতাব্দী পূর্বে যেমনটা ঘটেছিল অরেলিয়াসের সময়।

তবে পশ্চিমের বিজয় জাস্টিনিয়ানের সংকট ঘনীভূত করে তুলেছিল, বিশেষ করে ধর্মীয় প্রেক্ষিতে। জাস্টিনিয়ান ছিলেন একজন উৎসুক ক্যাথলিক এবং তার অধীনে পৌত্তলিকতার চিহ্ন মুছে যায়। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে নয়শ বছর ধরে বর্তমান এথেন্সের একাডেমী তিনি বন্ধ করে দেন, আর বিমর্ষ দার্শনিকরা দেশত্যাগ করে পারস্যে চলে যান। এই শতাব্দীতেই আইসিস এবং ফাইলির মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয় আর এতে করে চার সহস্রাব্দ পূর্বে মেনেসের আমলে প্রচলিত প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের সমাপ্তি ঘটে। জাস্টিনিয়ান ইহুদি এবং পৌত্তলিকদের সাথেও কঠোর ব্যবহার করেন।

তবে মনোফাইসাইটদের ভাগ্যে কি ঘটল? মিশর এবং সিরিয়ায় মনোফাইসাইটবাদ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। সেখানে জাস্টিনিয়ানরা তেমন পাত্তা পায়নি। জাস্টিনিয়ানের স্ত্রী থিওডোরা তার স্বামীর বিপরীতে মনোফাইসাইটীয়দের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তা ছিলেন না। অধিকন্তু, পশ্চিমে তার নতুন বিজিত স্থানগুলি মনোফাইসাইটীয়দের ঘোর বিরোধী ছিল এবং এই ধর্মদ্রোহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাত।

জাস্টিনিয়ান চাননি পশ্চিমে বিজিত স্থানগুলিতে ক্ষোভের সৃষ্টি করতে এবং মিশর ও সিরিয়ার মতো সম্পদশালী প্রদেশগুলিতে তার অবস্থান দুর্বল করতে। ৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপলে পঞ্চম ধর্ম সম্মেলনের অহবান করেন। সেখানে তিনি মনোফাইসাইটীয়দের কিছুটা হলেও শান্ত করে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য তিনি আলেক্সান্দ্রিয়া ও রোমের বিশপদের উপরে রাজকীয় শক্তি প্রয়োগ করেন। তবে এটা কোনো সুফল বয়ে আনেনি। পশ্চিমের খ্রিস্ট সমাজ এবং মিশর ও সিরিয়ার খ্রিস্ট সমাজ আপোসরফায় মোটেই রাজী হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবিকপক্ষে জাস্টিনিয়ানের প্রচেষ্টার ফলে মনোফাইসাইটীয় মতবাদ মিশর ও সিরিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় রাজকীয় চাপের ফলে গ্রিকরা কনস্টান্টিনোপলীয় অবস্থানের দিকে ঝুঁকেছিল। অপরপক্ষে মিশরীয়রা আরও দৃঢ়ভাবে মনোফাইসাইটীয়বাদকে ধারণ করে। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপল ও আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রচলিত গ্রিক ভাষা পরিত্যাগ করে প্রার্থনায় নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে।

এই স্থানীয় ভাষাকে বলা হয় *কপ্টিক* (ঈজিপ্টিক শব্দের বিকৃত রূপ) এবং মনোফাইসাইটীয় চার্চকে কপ্টিক চার্চ বলে আখ্যায়িত করা হয়। একভাবে বলতে গেলে বলা যায় কপ্টিক চার্চ মিশরের পুনরুত্থান সূচনা করে। বহুশতাব্দী বিদেশিদের অধীনে থাকায় মিশর তার পরিচয় ধরে রাখার জন্য তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মকে অবলম্বন করে। এসিরীয়া, পারস্য, গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির স্রোতের মধ্যেও মিশরীয়রা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেনি।

শুধু খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবেই মিশরীয়রা নতিস্বীকার করে এবং বহিরাগত একটি প্রভাব অবলম্বনে বাধ্য হয়। এমনকি এখানেও খ্রিস্টধর্মের উপরে তাদের নিজস্ব জীবনধারার ছাপ রেখে দিতে চেষ্টা করে। অবশেষে তাদের নিজেদের মতো একটি ব্যবস্থা খুঁজে পায়। মিশরের কপ্টিক চার্চ পূর্বের গ্রিক ও পশ্চিমের ল্যাটিন খ্রিস্টীয়বাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী প্রতিআক্রমণ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

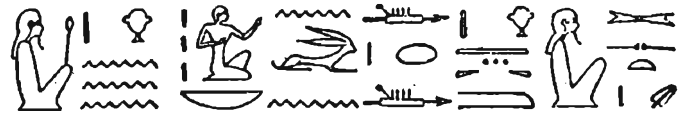

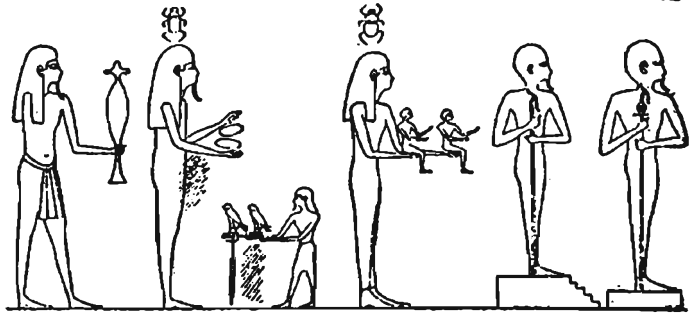

১৪. অন্তিম দৃশ্য

পারসিকগণ

জাস্টিনিয়ানের আমলে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বর্বরদের অভিযানে ইতালি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উপদ্বীপটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

পশ্চিমের বর্বর আক্রমণের চাইতেও আরও বড় উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের আরও পূর্বে এক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল। রোমান সম্রাটরা (শুধু জাস্টিনিয়ান নয় তার পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিরাও) পশ্চিমে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল সেখানে রোম সাম্রাজ্যের শক্ত অবস্থান নির্মাণ করতে। তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সব সময় পারস্যের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

এমনকি জাস্টিনিয়ান যখন পশ্চিমে তার বিজয় অব্যাহত রেখেছিল, তখনও তাকে পারস্যের সাথে দুটি যুদ্ধে অংশ নিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি চুক্তিতে আসতে হয়। অবশেষে পারস্যে দ্বিতীয় খসরুর আমলে পরিস্থিতি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য যখন *আভার* যাযাবর উপজাতির আক্রমণে বিপর্যস্ত তখন দ্বিতীয় খসরু সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর থেকেই তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দানিয়ুব নদীকে অবলম্বন করে বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। পারস্যের রাজা বিপুল সাফল্য অর্জন করে এবং এশিয়া মাইনরের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়। ৬০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় খসরু কনস্টান্টিনোপল প্রণালী পার হয়ে *ক্যালসিডনে* পৌঁছান।

তার সৈন্যবাহিনী সিরিয়াতেও অভিযান পরিচালনা করে। সেখানকার জনগণ তাকে আক্রমণকারী শত্রু হিসাবে না দেখে খ্রিস্টীয় রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে মুক্তিদাতা হিসাবে গণ্য করেছিল। দ্বিতীয় খসরু ৬১১ খ্রিস্টাব্দে এন্টিয়ক এবং ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক অধিকার করেন।

৬১৪ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের উপরে একটি হতাশাজনক আঘাত আসে, যখন পারস্য বাহিনী যেরুজালেম অধিকার করে এবং প্রকৃত ক্রুশ বহন করে নিয়ে যায় (কথিত আছে যে এটিই সেই ক্রুশ যাতে যিশুকে ঝোলানো হয়েছিল)। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে পারসিকরা মিশরে প্রবেশ করে। এজন্য মনোফাইসাইটদের বিতর্ককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পারসিকরা সহজেই মিশর অধিকার করে, যেমনটা এক হাজার বছর পূর্বে আলেক্সান্ডার মিশর অধিকার করেছিল। সে সময় যেমন আলেক্সান্ডারকে ভাবা হয়েছিল পারসিকদের যাতাকল থেকে ত্রাণকর্তা হিসেবে, ভাগ্যের পরিহাস, এবার গ্রিক যাতাকল থেকে ত্রাণকর্তা হিসাবে পারস্যের রাজাকে দেখা হল।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খসরুর বিজয়ের মাধ্যমে আলেক্সান্ডারের অর্জনকে নষ্ট করে দেয়া হয়। পারসিকদের পরাজয়ের এক হাজার বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পারস্য নেতৃবৃন্দের প্রথমে সেলুকীয় এবং পরে রোমান সম্রাটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল। শেষ পর্যন্ত তারা হৃত গৌরব ফিরে পেল। ইরানীয় উচ্চভূমি, মেসপটেমিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং মিশর তাদের করায়ত্ত হলো।

এই সংকট নিরসনে হেরাক্লিয়াস নামে এক নূতন সম্রাটের অভ্যুদয় ঘটল, তিনি হলেন এক ক্ষীয়মান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। শুধু যে সমগ্র প্রাচ্য পারস্যের অধিকারে চলে গিয়েছিল তাইনা, ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি জার্মান উপজাতি সাম্রাজ্যের পুরো স্পেনীয় অঞ্চল দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে এ্যাভার্সরাও দানিয়ুবের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

সৈন্যবাহিনীকে পূনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হেরাক্লিয়াসের দশ বছর লেগে যায়, আর এক প্রবল ধর্মোন্মাদনার মধ্যে তিনি এশিয়া মাইনরে ঢুকে পড়েন। ৬২২ ও ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি উপদ্বীপ থেকে পারসিকদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি মহা উৎসাহে পারস্যের মূল ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হন। এ জন্য তিনি কোনো বাধা মানতে রাজী নন। ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি কনস্টান্টিনোপলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনস্টান্টিনোপল বেঁচে গিয়েছিল। এর প্রাচীর আভারদের আক্রমণেও টিকে ছিল। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে পুরাকালে যেখানে নিনেভ নগরী ছিল, এক কঠিন যুদ্ধের পর সেখানে তিনি পারসিকদের পরাজিত করেন। এখানেই পারসিকদের সমাপ্তি। দ্বিতীয় খসরু পদচ্যুত ও নিহত হন, এবং তার উত্তরাধিকারী তাড়াহুড়া করে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। মিশরসহ পারস্যের সমগ্র বিজিত স্থান সুরক্ষিত থাকে। সত্যিকারের ক্রুশটিও ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস নিজেই এটা যেরুজালেমে ফিরিয়ে আনেন। বল্কান এলাকায় আভার-জোয়ার স্তিমিত হতে থাকে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হয় জাস্টিনিয়ানের সময়ের সবকিছুই পুনরুদ্ধার হয়ে যায় (শুধু ইতালি ও স্পেন ছাড়া)।

জাস্টিনিয়ান অনুভব করেন সাম্রাজ্যে একটি ভয়ানক ত্রুটি রয়েছে, আর তা হল অবিরাম ধর্মীয় বিরোধ। সিরিয়া ও মিশরের এত সহজে পতন হয় এই ধর্মীয় বিরোধের কারণে আর হেরাক্লিয়াস জানতেন এটা বারবার ঘটতেই থাকবে যদিনা একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।

তাই তিনি একটি সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কনস্টান্টিনোপল বিশ্বাস করত যিশুর দুইটি রূপ আছে, একটি স্বর্গীয় এবং একটি মানবিক। অথচ মিশর ও সিরিয়া শুধু একটি রূপকেই ধারণ করত। তাহলে এমনটি কি করা যায় না যে যিশুর দুটি রূপ থাকলেও তার একটি ইচ্ছা– অন্য কথায় দুটি রূপের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না? এই ধারণাকে বলা হয় মনোথেলিটিজম (এক ইচ্ছা)। মনে হয়েছিল এই সুন্দর সমঝোতায় সবাই সম্মত হবে।

হয়তো সেটাই হতো যদি সেটা কেবল ধর্মীয় বিরোধ হতো। সমস্যা ছিল সিরিয়া ও মিশরের জাতীয়তাবাদী মনোভাব এই সমঝোতার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এটাও হতে পারে যে কনস্টান্টিনোপল যদি মনোফাইসাইটিজমকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণও করত তাহলেও সিরিয়া ও মিশর বিবাদের আর একটি বিষয় খুঁজে বের করত। কাজেই অসন্তোষ রয়েই গেল, তাই কোনো কথা বা কোনো কাজের দ্বারা তার উপর প্রলেপ দেওয়া যাবে না।

আরবীয়গণ

যতদিন হেরাক্লিয়াস সিংহাসনে ছিলেন মনোফাইসাইটীয় বিরোধ এবং ধর্মীয় অসন্তোষ সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক ব্যাপার ছিল। তবে একটি সংকটের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্যের মধ্যে চার শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ বিশেষ করে শেষ বিশ বছরের কঠিন সংগ্রাম উভয় পক্ষেরই শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। তাদের যুদ্ধ একটি স্থিতাবস্থার মধ্যে আসে এবং উভয়ই হাপাতে থাকে আর এই সুযোগে একটি নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেজ এবং ধর্মোন্মাদ শক্তি ময়দানে ঢুকে পড়ে। সবার বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে নতুন উপসর্গটি একটি অপ্রত্যাশিত দিক– আরব উপদ্বীপ থেকে সামনে চলে আসে।

আরব উপদ্বীপ মূলত মরুঅঞ্চল হলেও এর উর্বর প্রান্তে একটি চকমপ্রদ সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং মাঝে মাঝেই তা সভ্যজগতের উপরে চড়াও হয়। মিশরীয় রাজারাও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল দক্ষিণ আরবের সাথে যেখানে বাইবেলের *শেবা ও অফির* রাজ্য অবস্থিত ছিল।

তবে আরবরা কোনো সময়ই নেহায়েত উৎপাতের চাইতে বেশি কিছু ছিল না, আর যখনই উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের সাম্রাজ্য শক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসত তারা চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু উত্তরের উভয় সাম্রাজ্য লড়াই করতে করতে যখন ক্লান্ত তখন আরবীয়রা একজন নতুন এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের সন্ধান পেল।

এটি ছিল একটি ধর্মীয় পূনর্জীবনের ফসল। প্রাচীন আরবীয় বহুদেবত্ববাদ আধুনিক শালীন ইহুদি ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দ্বারা অপসৃত হয়েছিল। জাতীয়তার কারণে একেশ্বরবাদের অগ্রগতি ছিল শ্লথ। যেহেতু ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টধর্ম বহিরাগত বলে মনে হয়েছিল, তাই একটি স্থানীয় বিশ্বাসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

মিশর থেকে লোহিত সাগরের ওপারে আরব উপজাতির পবিত্র নগরী মক্কায় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (সঃ) নামে এক বালক শিশুর জন্ম হয়। যিনি তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে একেশ্বরবাদী একটি ধর্মের প্রচার শুরু করলেন। তার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ "কোরান" নামে এক পবিত্র গ্রন্থে সংকলিত করা হয়।

মুহাম্মদ (সঃ) প্রচারিত নতুন ধর্মের নাম ইসলাম (আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পণ)। যারা এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তাদের বলে মুসলমান। যিশুর মতো প্রথম দিকে তিনিও স্বদেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করতে পারেননি। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (সঃ) তার অনুগত কয়েকজন সমর্থকসহ মক্কা থেকে চলে যেতে বাধ্য হন (হিজরত)। তিনশত পঞ্চাশ মাইল উত্তরে মদিনা নগরে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। মুহাম্মদ (সঃ) ধীরে ধীরে মদিনায় তার অনুসারীদের সংগঠিত করতে থাকেন এবং তাদেরকে একটি যোদ্ধার দলে পরিণত করেন যারা নূতন বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত ছিল।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি মক্কায় যুদ্ধযাত্রা করেন, আট বছর পূর্বে যেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ বছরই হেরাক্লিয়াস বিজয়ীর বেশে যেরুজালেমে প্রবেশ করেন। বহির্বিশ্বের খুব কম জাতিই সে সময় মুহাম্মদ-এর (সঃ) মক্কা বিজয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল।

এই সময় থেকে মুহাম্মদ-এর (সঃ) অগ্রগতি দ্রুততর হল। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর সময় সমগ্র আরব জাতি ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র নামে তারা তাদের বিশ্বাসকে বিস্তৃত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। আল্লাহ্ তাদের পক্ষে থাকলে তাদের হারার সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটলেও অনন্ত স্বর্গে তাদের বাসস্থান নিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদের উত্তরাধিকার লাভ করেন হযরত আবু বকর (রা:), যিনি ছিলেন তার সর্বপ্রথম অনুসারী। তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা (উত্তরাধিকারী)। তার অধীনে আরব বাহিনী উত্তর-পূর্ব দিকে পারস্য সাম্রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে সিরিয়া আক্রমণ করে।

হেরাক্লিয়াস আরব শক্তির অবমূল্যায়ন করেছিলেন। পারস্যের যুদ্ধে অসম্ভব শক্তি-ক্ষয়ের মাধ্যমে তিনি যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তাতে তুষ্টি লাভ করে তার শেষ জীবনে তিনি শুধু শান্তির প্রত্যাশা করেছিলেন আর স্বয়ং কোনো যুদ্ধে জড়াবেন না বলে স্থির করেছিলেন। অপর্যাপ্ত সৈন্য নিয়ে তিনি তার ভাইকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আরবরা তাকে পরাজিত করে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হল। প্রবাদ আছে যে, ঐ একই দিন হযরত আবু বকরের (রা:) মৃত্যু হয় এবং মুহাম্মদ-এর (স:) আরেকজন সঙ্গী হযরত ওমর (রা:) তার উত্তরাধিকারী হন।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে প্রাথমিক পরাজয়ের পর কনস্টান্টিনোপলের রোমান সাম্রাজ্য নড়েচড়ে বসে এবং একটি শক্তিশালী রাজকীয় বাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান করার জন্য। সাময়িকভাবে আরবরা দামেস্ক থেকে পিছু হটে যায়।

যা হোক, রাজকীয় বাহিনী আপাতদৃষ্টিতেই শুধু শক্তিশালী বলে বোধ হয়েছিল। এই বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ছিল ভাড়াটিয়া আর তারা নিশ্চিত ছিল না তাদের পাওনা চুকানো হবে কি না এবং সিরিয়ার মনোফাইসাইট জনগণ যুদ্ধের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ ছিল। তারা নতুন এই আরব শক্তি ইসলাম সম্বন্ধে তেমন কিছু জানত না তবে তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে তারা কনস্টান্টিনোপলের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ পছন্দ করত না।

তাই ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগষ্ট পৃথিবীর ইতিহাসের এক চূড়ান্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ইয়ারমুক নদীর তীরে। নদীটি জর্ডানের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে লোহিত সাগরে পড়েছে। এটি ছিল একটি কঠিন যুদ্ধ। রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণে আরব সৈন্যরা বার বার পিছু হটছিল। তাদের অশ্ব ও উষ্ট্রবহর নিয়ে অক্লান্ত আরব সৈনিকরা বার বার দিক পরিবর্তন করছিল এবং ফিরে আসছিল আর রাজকীয় বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের প্রত্যেকটি সৈন্যকে হত্যা করেছিল। এটি আরবদের জন্য ছিল একটি চূড়ান্ত বিজয়। পরবর্তী আট শতাব্দীব্যাপী রোমানরা শুধু আত্মরক্ষার সংগ্রামই করেছে।

আরবদের কথা বলতে গেলে তারা ইচ্ছামতো বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে চলেছে, যারা তাদের সাথে সহানুভূতিশীল তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে এবং যারা তাদের বিরোধী তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে।

চার মাস অবরোধের পর ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবরা যেরুজালেম দখল করে নেয়। মাত্র আট বছর আগে হেরাক্লিয়াস এখানে প্রকৃত ক্রুশ বহন করে আনেন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টানরা এ নিয়ে উল্লসিত ছিল কিন্তু আবার নগরীটি হাতছাড়া হল, এবার চিরতরে।

দ্বিধাগ্রস্ত পারস্য সম্রাটদের হাত থেকে সিরিয়ার অবশিষ্টাংশ দখল হয়ে যায় যেমনটা হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। বাস্তবিক পক্ষে পারসিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে যেমন শক্তিমত্তা ও জেদের সাথে লড়াই করেছিল তারা এই নতুন শক্তির কাছে অসহায় বোধ করল। পারসিকরা একের পর এক যুদ্ধে পরাস্ত হতে লাগল এবং ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তাদের আর কোনো প্রতিরোধের শক্তি রইল না।

শুধু বিশ বছর আগে যে পারস্য ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল এখন তারা আর কেউ রইল না। আরবদের সামনে এখন শুধু দেশ দখলের মহোৎসব।

ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে আরব বাহিনীর একাংশ আমর ইব্‌ন্ আল-আসের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পেলুসিয়ামে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় একদা তেরোশ বছর পূর্বে যেখানে সেনাকেরিবের সৈন্যের অবস্থান ছিল।

একমাস অবরোধের পর আমর শহরটি দখল করে নেন। প্রথম যুদ্ধটি ছিল শেষ যুদ্ধ এবং বিনা যুদ্ধেই মিশর দখল করা হয়, যেমনটা ঘটেছিল হিক্সসদের সময়।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে হেরাক্লিয়াসের মৃত্যু হয় এবং পরের বছর ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে আমর আলেক্সান্দ্রিয়া দখল করে নেন। একটি প্রতিআক্রমণে রাজকীয় বাহিনী নগরটি পুর্নদখল করে তবে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। হাজার বছরের গ্রিক ও রোমান গৌরবের এখানেই সমাপ্তি।

প্রবাদ আছে যে, আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি এই সময়ে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করা হয়। লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহ আমরের সামনে নিয়ে আসা হয়। কথিত আছে তিনি বলেছিলেন "এই বইগুলি যদি পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে এগুলি অপ্রয়োজনীয় আর যদি পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে এগুলি ক্ষতিকর। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি ধ্বংস করা প্রয়োজন।" তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এটা নেহায়েত গল্প, সত্য নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে মিশরের খ্রিস্টান শাসকদের পৌত্তলিক বিরোধী শক্ত অবস্থানের ফলে ধ্বংস করার মতো খুব কম গ্রন্থই টিকে ছিল।

মুসলিম মিশর

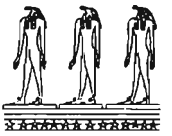

মিশরের মনোফাইসাইটরা ভেবে থাকতে পারে যে, কনস্টান্টিনোপলীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে আর প্রকৃতপক্ষে আরবরা খ্রিস্টানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরবদের মিশর বিজয়ের বিশ বছরের মধ্যেই মুসলিম সৈন্যরা দক্ষিণে নুবিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে আফ্রিকার অবশিষ্ট রোমান প্রদেশগুলি দখল করে নেয়। কার্থেজ অধিকার করা হয় ৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে এবং আফ্রিকার সমগ্র উত্তর উপকূল মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আসে ৭১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই। মিশরীয় খ্রিস্টানরা কখনোই ইউরোপীয়দের আত্মীয় ভাবতে পারেনি। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে ষষ্ঠ ধর্মীয় সম্মেলন আহবান করা হয়েছিল, তবে দুইটি বিবদমান বিশ্বাসের মধ্যে আপোস মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি।

মিশরীয় খ্রিস্টানরা নিঃসন্দেহে নিজেদেরকে পরিত্যক্ত ভেবেছিল, প্রথমত মুসলিম বিজয়ের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় অনমনীয়তার দ্বারা। তাই মিশর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। তিন হাজার পাঁচশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মেম্ফিস অবশেষে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর কাছেই আল-ফুস্তাতে মুসলমানদের একটি নতুন রাজধানী নির্মাণ করা হয়।

৭০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে গণ্য করা হয়। ধীরে ধীরে খ্রিস্টানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, কারণ এতে করে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পথ খুলে যায়। তবে মিশরের সমৃদ্ধি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে, কারণ আরবরা মরুসন্তান হওয়ায় কৃষির ব্যাপারে অনুৎসাহী ছিল। কাজেই তারা খালগুলির যত্ন নিতে আগ্রহ দেখায়নি এবং এগুলি ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে যেতে শুরু করে। সারাদেশে অনাহার দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করে যাতে করে দেশ দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে পড়ে যা বর্তমানকাল পর্যন্ত বহাল আছে।

স্থানীয় মিশরীয়রা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে। ৮৩১ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে দমন করা হয় যার পরে আর কখনো বিদ্রোহ দেখা দেয়নি (তবে মিশর থেকে খ্রিস্টধর্ম পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এখনও মিশরের পাঁচ শতাংশ লোক কপ্টিক মতবাদে বিশ্বাসী খ্রিস্টান)। মিশরীয় খ্রিস্টানরা নুবিয়ায় (বর্তমানে যা ইথিওপিয়া) সেখানে খ্রিস্টান মিশনারী প্রেরণ করে এবং বর্তমানে সে দেশটিতে খ্রিস্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রাচীন মিশরের সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে– নগর, ভাষা, ধর্ম, সমৃদ্ধি– তবে ভূখণ্ড ও জনগণ এখনও সেখানে টিকে আছে আর আমি এবার মিশরের বর্তমান ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে চাই। অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্য এত বিস্তার লাভ করেছিল যে তার অখণ্ডতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। নবম শতাব্দীতে তাদের মধ্যে বিবদমান গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়।

৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য *তোলনীয়* নামে একটি দুর্বল রাজবংশের অধীনে মিশর একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে অধিকতর শক্তিশালী ফাতেমীয়রা মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে। প্রথম ফাতেমীয় শাসক আল-ফুসাতকে রাজধানী হিসাবে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা তিন শতাব্দী ধরে মিশরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজধানী ছিল। ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে তিন মাইল উত্তরে *আল-কাহিরা* (বিজয়ী) নামে এক নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করে। আমরা একে বলি *কায়রো* আর প্রায় এক হাজার বছর ধরে এটাই মিশরের রাজধানী।

আল-হাকিম ছিলেন ফাতেমীয় শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর। একজন গোড়া মুসলমান হিসেবে তিনি খ্রিস্টানদের উপর কঠিন নির্যাতন চালান। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যেরুজালেমের *হলি সেপালকার গির্জা* ধ্বংস করে ফেলেন। এতে করে ইউরোপে কঠিন ক্ষোভের সঞ্চার হয় আর এটাই ছিল ক্রুসেডের সূত্রপাত।

ক্রুসেডের মাধ্যমেই ইউরোপীয় ইতিহাসে মিশরের পুনরাবর্তন ঘটেছিল। চার শতাব্দী ধরে ইউরোপ একটি অন্ধকার যুগ অতিক্রম করছিল। মিশর ছিল সেই দিগন্তের বাইরে। ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্বলভাবে সংগঠিত খ্রিস্টান বাহিনী পূর্বে প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হয় এবং অসংগঠিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে তারা যেরুজালেম দখল করে নেয়।

ইতিমধ্যে ফাতেমীয় বংশ অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়। সালাদিন ইউসুফ বিন্ আইয়ুব একজন উজির (আমরা যাকে বলি প্রধানমন্ত্রী) ক্ষমতা দখল করে নেয়। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি সালাদিন নামে পরিচিত। নয় শতাব্দী পূর্বে তৃতীয় টলেমীর পরে তিনি মিশরের সবচেয়ে যোগ্য শাসক। তিনি সিরিয়া ও মিশর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দিয়ে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে যেরুজালেম দখল করেন।

তবে তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে ক্রুসেডাররা আবার ফিরে আসে এবং এমনকি মিশর দখলেরও চেষ্টা করে। ইউরোপের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা ছিল ফ্রান্সের নবম লুইয়ের (সেন্ট লুই) অধীনে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নীল নদের ব-দ্বীপে অবতরণ করেন। তবে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে লুই পরাজিত ও বন্দী হন। মিশরীয় শাসকরা মামলুক বাহিনীর (আরবীতে মামলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস) সহায়তায় দেশ শাসন করে। ক্রমান্বয়ে মামলুকদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি যখন ঝড়ের বেগে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছে মিশরে তখন একজন মামলুক সেনাপতি বাবর সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। মঙ্গলরা চীন এবং পারস্য অধিকার করে নেয় আর ক্রুসেডাররা যখন সিরিয়া ও মিশরে নিষ্ফল সংগ্রামে রত তখন মঙ্গলরা সমগ্র রাশিয়া অধিকার করে নেয়। এবার তারা অভিযান চালায় দক্ষিণ এশিয়ায়। চল্লিশ বছর ধরে মঙ্গলরা কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হয়নি।

তবে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তারা উত্তর প্যালেস্টাইনে বাবরের (ভারতের বাবর নয়) মুখোমুখি হয়। সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে এই যুদ্ধে বাবরের মামলুক বাহিনী বিজয় লাভ করে। মঙ্গলরা পিছু হটে যায়। তাদের অপরাজেয়তার কাহিনী কল্পকথা হয়ে রইল। সমগ্র মিশর বাবরের অধিকারে চলে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মামলুক শাসন চলতে থাকে। অবশেষে অটোমান তুর্কিরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সামনে এগিয়ে এল। তারা ধীরে ধীরে এশিয়া মাইনর দখল করে নিল এবং ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে অভিযান চালিয়ে কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। তাদের শক্তি যে শুধু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয় তাই নয় তারা এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে।

অটোমান সুলতান প্রথম সেলিম ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মামলুক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে কায়রো পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিছুদিনের জন্য মিশরকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে অটোমান শক্তি দুর্বল হতে থাকে এবং ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো ভিয়েনার প্রাচীরে তারা আঘাত হানে। তবে অষ্ট্রীয় ও রুশ বাহিনীর আক্রমণে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অটোমান শক্তি এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, মামলুকরা আবার মিশর দখল করে নেয়।

পশ্চিম ইউরোপ এবার অটোমান শক্তিকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হল। সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে নবম লুইয়ের পর ফরাসী বাহিনী ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে আরেকবার মিশর আক্রমণ করে বসল। এবার ফরাসী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। মামলুকরা আরও একবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের পুরনো যুগের তলোয়ার জাতীয় ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র এবং অনিয়ন্ত্রিত বাহিনী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। পিরামিডের যুদ্ধে মামলুক বাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নেপোলিয়ন মিশর থেকে চলে যেতে বাধ্য হন শুধু ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কারণে। ব্রিটিশরা তার সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয় যা মিশরীয় বা তুর্কি বাহিনী পারেনি।

১৮০৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোহাম্মদ আলীর দৃঢ় শাসনে মিশর সত্যিকারের স্বাধীনতা ভোগ করে। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মামলুক নেতাদের বিজয়োৎসব পালনের জন্য একটি দুর্গে আমন্ত্রণ জানান এবং তারা সেখানে এলে সবাইকে হত্যা করেন। এখানেই মামলুক বংশের ছয় শতাব্দীর রাজত্বের অবসান ঘটল।

ভূ-মধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে একটি সংযোগ খাল খননের গুজব আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিশরীয় শাসক প্রথম আব্বাস (মোহম্মদ আলীর নাতি) ফরাসী উদ্যোক্তা ফার্ডিন্যান্ড দ্য লেসেপস্‌কে সুয়েজ যোজকের উপর দিয়ে খাল খননের অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মোহম্মদ আলীর আর এক নাতি ইসমাইল দাপ্তরিকভাবে সুয়েজ খাল খুলে দেন।

অবশ্য ইসমাইলের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন মিশরকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেয়। যার ফলে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মিশর বাধ্য হয় ব্রিটেনের কাছে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ বিক্রি করে দিতে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেন মিশর অধিকার করে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অটোমান সাম্রাজ্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং বিভিন্ন আরবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার আশ্বাস দেওয়া হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন মিশরকে নামমাত্র স্বাধীনতা দিতে রাজি হয় এবং মিশরীয় শাসক ইসমাইলের কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম ফুয়াদ নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন। তবে গ্রেট ব্রিটেন মিশরে সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

১৯৩৬ সালে ফুয়াদের পুত্র প্রথম ফারুক শাসনভার লাভ করেন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মিশর লীগ অব্ নেশন্স-এ যোগ দেয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং মিশরীয়দের বাধ্য করে ব্রিটিশের পক্ষে থাকতে। তারপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইতালি যোগ দেয় জার্মানীর সাথে। যেহেতু মিশরের পশ্চিমের দেশ লিবিয়া ছিল ইতালির নিয়ন্ত্রণে কাজেই উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

ইতালি কর্তৃক মিশর আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করা হয় আর ব্রিটেন লিবিয়া পর্যন্ত যুদ্ধকে এগিয়ে নেয়। মিত্রকে সাহায্য করার জন্য জার্মানী এগিয়ে আসে এবং ব্রিটেনকে আবার মিশরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। মিশর আলেক্সান্দ্রিয়ার ৬৫ মাইল পশ্চিমে আল-আমিন পর্যন্ত সরে আসতে বাধ্য হয়।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী আল-আমিন থেকে প্রতিআক্রমণ শুরু করে এবং বিজয় লাভ করে। জার্মান বাহিনী এক হাজার মাইল পিছিয়ে যায়। মিশর রক্ষা পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা মিশর ছেড়ে চলে যায় শুধু সুয়েজ খালের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রেখে দেয়।

ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব দিকে মিশরের এক নতুন শত্রুর আবির্ভাব ঘটে। বহু শতাব্দী ধরে ইহুদিরা তাদের স্বদেশভূমি জুডিয়াতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখে আসছিল। অবশেষে তাদের জন্য সুযোগ এসে গেল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরব ভাষাভাষী পৃথিবীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল নামে এক স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। মিশর চেয়েছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা রোধ করতে। তবে ইসরায়েলের কাছে তাদের অপমানজনক পরাজয় ঘটে।

মিশরে সাধারণ লোকের মধ্যে একটি ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। অনেক বিদেশিকে হত্যা করা হয়। রাজা ফারুককে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করা হয় আর মিশরের সাথে পশ্চিমের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে একজন মিশরীয় সেনাধ্যক্ষ গামাল আব্দেল নাসের ক্ষমতা দখল করে নেন এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।

মিশর পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রথম প্রপাত আসোয়ানের কাছে একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণের, যাতে করে মনুষ্যনির্মিত একটি বিরাট হ্রদের সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে হাজার হাজার একর উর্বর ফসলীভূমির উৎপত্তি ঘটবে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যের প্রত্যাশা করা হয়েছিল। তবে মিশর চেষ্টা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার এবং আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট *ফস্টার ডালেস* এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য প্রদানে ইচ্ছুক নয়।

ক্ষুব্ধ মিশর বাধ্য হয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়ে। নাসের সুয়েজ খালের জাতীয়করণ করেন, যাতে করে বিদেশি নিয়ন্ত্রণের শেষ চিহ্ন মুছে যায় এবং এতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান।

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইসরায়েল ডালেসের বোঝা বহন করতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে মিশর যাতে যোগ দিতে না পারে সে জন্য মিশরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মিশর হয়তো সেটা প্রতিরোধ করতে পারতনা কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায়। আর ডালেস তার বোকামির ফাঁদে ধরা পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আপোস করতে বাধ্য হন। আমেরিকা আরব দেশসমূহের সাথে তার বন্ধুত্ব বিলিয়ে দিতে চায়নি। কাজেই আক্রামক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এরপর পরিস্থিতি যা দাঁড়ায় তাকে শান্তি বলা যায় না। মিশর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় এবং তাকে সুয়েজ খাল ব্যবহার করতে দিতে চায়না এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরব দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখল মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারের এটি একটি বড় সুযোগ (পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার দোদুল্যমানতাকে ধন্যবাদ)। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশর ও অন্যান্য আরব দেশে অঢেল অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। ইতিমধ্যে ইসরায়েল ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ত্র লাভ করে এবং তার বিশ লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে।

নাসের চেষ্টা করেন তার ইসরায়েলবিরোধী নীতির দ্বারা সমস্ত আরব ভূখণ্ডে তার প্রভাব বজায় রাখতে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ছয় বছর মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পুণর্নির্বাচিত হন। তিনি সিরিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং যেসব আরব দেশ ইসরায়েল ও পশ্চিমের সাথে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেন। এমনকি তিনি ইয়েমেন ও দক্ষিণ পশ্চিম আরবে একটি অসফল যুদ্ধেরও সূত্রপাত করেন।

অবশেষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সঠিক অবস্থানে চলে আসেন। তিনি ইসরায়েল সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং দক্ষিণ লোহিত সাগরে ইসরায়েলী জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করে দেন, ইসরায়েলের পূর্ব সীমান্তের প্রতিবেশী জর্ডানের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। তার আশা ছিল ইসরায়েলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে ইসরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করা। পাঁচ জুন তিনি ইসরায়েলকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়বারের মতো ইসরায়েল মিশরকে অপমানজনক পরাজয় এনে দেয়। সেই সাথে জর্ডান ও সিরিয়াও পরাজিত হয়। কায়রো শহরের জনসংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। এটি আফ্রিকা মহাদেশের সর্ববৃহৎ শহর। যদি অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসন করতে পারে তাহলে মিশর এখনও বিশ্ব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে ইসরায়েলের সাথে তাকে এক ধরনের সমঝোতায় আসতে হবে। যে যুদ্ধ জয় করা যাবেনা, তা অনন্তকাল চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তাতে করে তার জনগণের আরও দুর্দশা বাড়তে পারে।

কিন্তু তবু যতদিন মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের মধ্যে ঘুটি হিসাবে ব্যবহৃত হবে ততদিন শান্তির প্রত্যাশা দুরূহ। আধুনিক বিশ্বে কোনো একটি দেশে কি শান্তি বিরাজ করতে পারে, যদি সর্বত্র অশান্তির বাতাবরণ চলতে থাকে?

-০-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

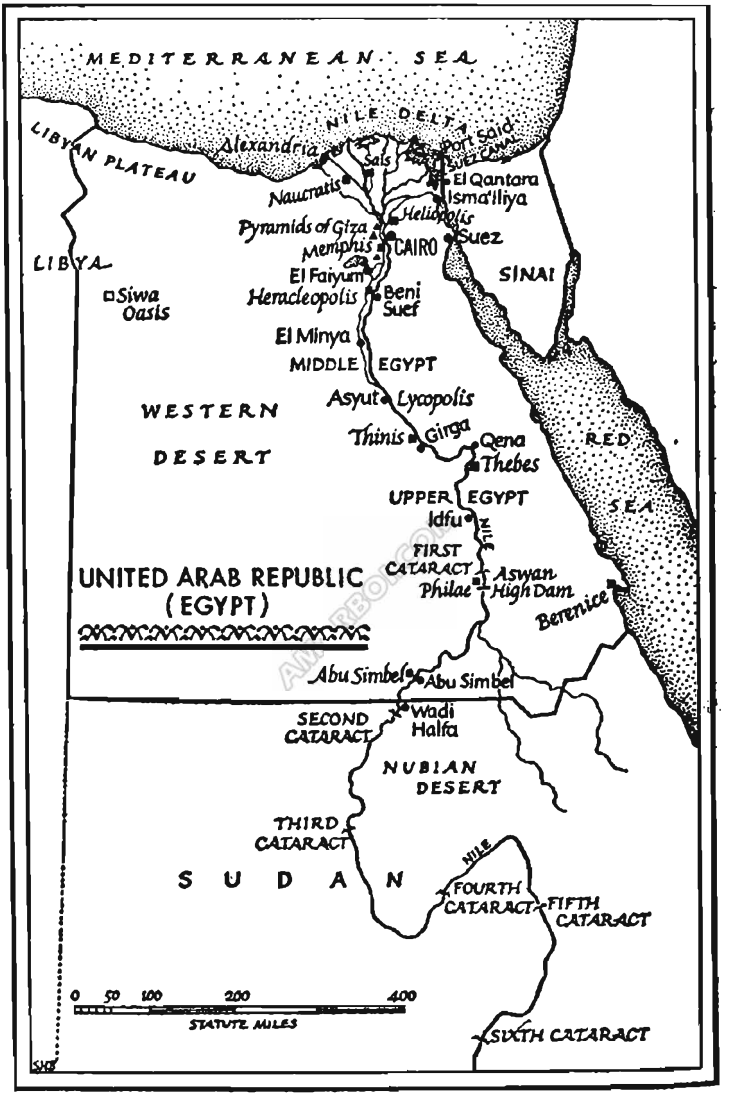

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

মূল সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

ফ্রয়েড সাহেব আস্তিক ছিলেন না; তাহার বিবেচনায় ধর্মবিশ্বাস একরূপ মনোবিকলন, মানুষের পরিপক্কতা অর্জন ও জ্ঞান-অন্বেষণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং মুসার নবীত্বে তাহার বিশ্বাস থাকিবার প্রশ্ন উঠে না। তাহার অনুসন্ধিৎসা কিছুটা ভিন্ন হইবারই কথা। মুসা নবী এবং একেশ্বরবাদ নামীয় গ্রন্থটিতে তাহার উদ্দেশ্য ঠিক কী সহসা স্পষ্ট হয় না। তবে শুরুতে তিনি স্বীয় কায়দায় মুসা নবীর ঠিকুজি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে মুসা নবী আদৌ বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নহেন। বরং তিনি মিশরীয় বংশোদ্ভূত, মিশরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ভাগ্যবিড়ম্বিত সন্তান। নিছক পৌরাণিক কাহিনীর বিবর্তনে তিনি ইহুদি পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

ফ্রয়েড সাহেবের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল মুসা নবী আল্লাহর ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই; বরং পূর্বপ্রচলিত ইখনাতনের ধর্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। অতএব, তাহার প্রতি ভক্তিতে আনত হইবার বিশেষ কোনো কারণ ইহুদি সম্প্রদায়ের থাকিতে পারে না।

সাতকাহনে বইয়ের পাতার সংখ্যা বাড়িলেও ফ্রয়েড সাহেব কার্যত এমন কিছুই বলিতে পারেন নাই যে ইহুদিরা মুসা নবীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। বরং মুসা নবী যে একটি ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, কাল্পনিক কোনো চরিত্র নহেন, এই বক্তব্যটি প্রকারান্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছে। অবচেতনের রাজাধিরাজ ফ্রয়েড সাহেবের অবচেতনে লক্ষ্য হয়তো তাহাই ছিল। ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও জন্মসূত্রে তিনি নিজেও ইহুদি; মুসা নবী সম্পর্কে তাহার কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

–ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, *দৈনিক প্রথম আলো*

"একটা জাতি যাকে জাতির শ্রেষ্টতম সন্তান বলে প্রশংসা করে, সেই মানুষকে জাতির কাছে অস্বীকার করা, এটা মোটেই হাল্কাভাবে নেওয়া যায় না– বিশেষ করে সেই জাতিরই আরেকজনের পক্ষে," সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লিখছেন, যখন তিনি মোজেস ও একেশ্বরবাদ বইতে সেই মহান্ অনুশাসন-দাতার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিচ্ছেন– এই বইয়ে, যেটি তাঁর শেষ বই।

বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি অনুবাদ করেছেন সৌরীন নাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~